রহস্যভেদী বাসব

(চতুর্থ খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৫

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : পঞ্চানন জানা : জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০।১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন : কলিকাতা—১২

শ্রীযুক্তা রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

ও শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগলেষু—

: সূচীপত্র :

পূর্ব্বাভাষ

আজ থেকে কত শতাব্দী আগে যে গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তা বলা এখন দুষ্কর। প্রচুর গবেষণা করে—সুদূর অতীত থেকে যে এর মূল সূত্রকে টেনে বার করা যাবে তাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। উপমা স্বরূপ "পঞ্চতন্ত্র," "দশকুমার-চরিত," "কথা সরিৎসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা চলে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাচীন গোয়েন্দা সাহিত্য সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা রয়েছে। তবে পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত সত্য গোয়েন্দা কাহিনী প্রচলিত ছিল তার বিবরণ পাঠ করলে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। প্রসঙ্গক্রমে সেই সমস্ত কাহিনীর একটি এখানে বর্ণনা করা চলে।

কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে কাশীর রাজা ও তাঁর চার মন্ত্রীর মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিল। ক্রুদ্ধ রাজা মন্ত্রীদের পদচ্যুত করে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন। উপায়ন্ত না থাকায় হতভাগ্য মন্ত্রীরা যাত্রা করলেন অনির্দ্দিষ্টের পথে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তাঁরা ধুলার উপর পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। তাঁরা যখন এই পায়ের ছাপের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তখন সেখানে এক বণিক উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, আমার একটা উট হারিয়ে গেছে, আপনারা দেখেছেন কি ?

প্রথম মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, উটের একটা পা খোঁড়া ছিল কি ?

দ্বিতীয় মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, উটের কি ডান চোখ কানা ছিল ?

তৃতীয় মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, উটের কি পেটের অসুখ হয়েছে ?

চতুর্থ মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, উটের লেজ বোধহয় ছোট ছিল ?

বিস্মিত বণিক বলল, আমার উটের সম্বন্ধে আপনারা এত কথা জানলেন কিভাবে ? এখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনারাই উট চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

মন্ত্রীরা আপত্তি করলেন। কিন্তু বণিক শোনার পাত্র নয়—চোর না হলে কখনো এত নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া যায়। ততক্ষণে ওখানে অনেক লোক জড় হয়ে গেছে। শেষে সকলে মন্ত্রীদের ধরে বেঁধে দরবারে নিয়ে এল। বণিক উট চুরির নালিশ জানালো রাজার কাছে।

মন্ত্রীদের বক্তব্য শোনার পর রাজা বললেন, আপনারা বণিকের উট চোখে দেখেননি বলছেন। তাই যদি হবে, তবে কি ভাবে বুঝলেন, ঐ উটের একটা পা খোঁড়া, একটা চোখ কানা, পেটের অসুখ করেছে এবং লেজ ছোট ?

প্রথম মন্ত্রী উত্তর দিলেন, ধুলার উপর মাত্র তিনটি পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম, উটের একটা পা খোঁড়া।

দ্বিতীয় মন্ত্রী উত্তর দিলেন, লক্ষ্য করলাম, বাঁ ধারের গাছ পাতা খেতে খেতে উট এগিয়েছে। বোঝা গেল, ওর ডান চোখ নেই।

তৃতীয় মন্ত্রী উত্তর দিলেন, উটের সামনের দুপা ধুলার উপর চেপে বসেছে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু পিছনের পায়ের ছাপ আলতো ভাবে পড়েছে। বোঝা গেল, পেটের মধ্যে কোন যন্ত্রণা না থাকলে এমন হবার নয়।

চতুর্থ মন্ত্রী উত্তর দিলেন. ধুলার উপর যেখানে পায়ের দাগ সেখানেই রক্তের ছিটে লক্ষ্য করলাম। অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না, উটের পিঠে ঘা আছে। কাক ঠুকরে দেওয়ার জন্য রক্ত পড়ছে। প্রমাণ সহ লেজ থাকলে কাক ঘা ঠোকরাতে পারতো না।

মন্ত্রীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন এবং আবার পূর্ব্ব-পদে চারজনকে বহাল করলেন।

সেকালের মানুষের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি লক্ষ্য করে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা গিয়েছিল তাঁদের উত্তর পুরুষরা আরো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়ে পরবর্তী কালে উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা সাহিত্য সৃজন করবেন। কিন্তু তা হয়নি। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিলেও, ভারতীয় কাহিনীকারগণ গোয়েন্দা কাহিনী রচনায় উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে আশার কথা বাংলার গোয়েন্দা সাহিত্য সূতিকাগৃহ থেকে বেরিয়ে, হামা দেওয়ার পালা শেষ করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে। আর অপাংক্তেও নেই গোয়েন্দা সাহিত্য। বিপুল সংখ্যক পাঠক যে আগ্রহশীল তা আমি ব্যক্তিগত ভাবেই লক্ষ্য করছি। নইলে "রহস্যভেদী বাসব" এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খণ্ডে আমার "বাসব" আপনাদের কতটা বিস্মিত এবং কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পেরেছে সেইটাই এখন লক্ষ্যনীয়।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাউন গুজরাট মেল

মন্দিরমার্গের একটা গাছতলায় এসে দাঁড়াল ওম মেহতা। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। পাইথনের পিঠের মত ছড়িয়ে থাকা প্রখ্যাত রাজপথটি এখন প্রায় নির্জন। মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর বা অটো-রিক্সা চলে যাচ্ছে। মানুষ চলাচল নেই বললেই চলে।

ওম রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাল। ছটা কুড়ি।

গরম কালে এ সময় এই রাস্তায় জনসমাগম দেখবার মত হয়। এবার দিল্লীতে শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। অনেকে বলছে এত ঠাণ্ডা নাকি গত কুড়ি বছরের মধ্যে আর পড়েনি। শিশির ভেজা পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল।

গাছতলা থেকে ওম সরে পড়ল।

একবার ইচ্ছে হল পার্কে গিয়ে বসে। কিন্তু অজানা কারণেই গ্রেটকোটের কলার আরো একটু তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একই ভাবে। ওমের মনের মধ্যে এখন নানা চিন্তা ওঠানামা করছে। হাত খালি হয়ে এলেই রাজ্যের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে।

আরো মিনিট দশেক একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওম পকেট হাতড়ে চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই বার করল। সিগারেট ধরিয়ে নেবার পর ঘন ঘন টান দিল কয়েকবার। তারপর অপর ফুটপাথের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। যেন ছবির মত সাজান রয়েছে আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি। ও-ধারের নিউদিল্লী কালীবাড়ির উপর থেকে ওমের দৃষ্টি পিছলে এল বিড়লা মন্দিরের উপর, তারপর হিন্দুমহাসভার ধর্মশালা—রাইসিনা স্কুল, বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে দেবীদয়াল চোকসির প্রাসাদ এখন কুয়াশার আস্তরণে বন্দী।

ওম ওই বাড়িতেই যাবে।

এই প্রথম নয়, আগেও গেছে কয়েকবার। তখন গুছিয়ে নিতে পেরেছে। ওইসঙ্গে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়েছে সে। চোকসি সাহেব অত্যন্ত খুঁতখুঁতে আর সন্দেহ-প্রবণ মানুষ। এমন একজনকে স্বমতে আনা বাহাদুরীর ব্যাপার বই কি।

তাও আবার একবার নয়, একাধিকবার।

ওম মেহতার পরিচিতি ব্রোকার হিসাবে। সে নাকি পণ্যের দালালি করে এ কথাই সকলে জানে। আসলে ওম কিন্তু বাঁকা পথ দিয়ে কিভাবে

প্রচুর আয় হবে তারই পথ বাতলায় ব্যক্তিবিশেষদের। এই ফাঁকে নিজেও কিছু গুছিয়ে নেয়। অবশ্য এও এক ধরনের দালালি। সেবার যেমন দেবী-দয়াল চোকসিকে টিপস দিল, এলাহাবাদ থেকে সমস্ত চিনি হাওয়া করে দিতে। বিশ্বস্তসূত্রে সে খবর পেয়েছিল, বিহারের চিনির কলগুলিতে আচমকা ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে যাবে, কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। ব্ল্যাকে চিনি বেচে চোকসি সাহেব লাভ করলেন আড়াই লাখ টাকা। ওম পেল দশ হাজার।

এই রকম মোটা টাকা বছরে বারকয়েক পেলে আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে কই? যেমন এখন ওমের বেশ টানা-টানি চলছে। গত পাঁচ মাসের মধ্যে একজনকেও কোন টিপস দিতে পারে-নি। দিতে পারেনি অর্থে তেমন কোন লাভজনক পথ দেখতে পায়নি।

এতদিন পরে মোটা লাভের সন্ধান পেয়েছে। এখন চোকসি সাহেবকে কাজে নামাতে পারলে হয়। সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছিল। ওম শেষ-বারের মত টেনে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল। আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে। লোক চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার যাওয়া যেতে পারে।

ওম সবেমাত্র কয়েক পা এগিয়েছে—

—একি! ওস্তাদ, তুমি—

ওস্তাদ বলে ডাকতে পারে এমন কারুর সঙ্গে তো তার বহুদিন দেখা হয়নি।

ওম ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল। ফুটপাথ ঘেঁসে একটা স্কুটার যে এসে থেমেছে সে সেটা খেয়ালই করেনি। তরুণ আরোহীকে চিনে নিতে কোন অসুবিধা হল না।

প্রায় ভুলে যাওয়া দিনের একজন সহকারী।

—বেদপ্রকাশ যে! কি খবর?

—বিশেষ সুবিধার না।

—আমার তো বেশ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে। ভেস্পা চড়ে বেড়াচ্ছ। পকেট গরম না থাকলে তো এসব হবার নয়।

ম্লাঘার হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বেদপ্রকাশ স্কুটার থেকে নামল।

—এই আর কি। তোমাকে এখানে পাব ভাবতেই পারিনি। বহুদিন পরে দেখা হল।

—বছর কয়েক পরে তো বটেই। দলের আর সকলের খবর কি?

—খবর রাখি না। তুমি জেলে যাবার পরই তো দল ভেঙে গেল। সকলে ছড়িয়ে পড়ল এধার ওধার।

মন তেতো হয়ে উঠেছে ওম মেহতার। শুভকাজে যাবার মুহূর্তেই এই

বাধা এসে পড়ার কোন মানে হয়? এতদিন যখন বেদপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়নি তখন বাকী জীবনে যদি দেখা নাই হত, কি এমন ক্ষতি ছিল তাতে? আসলে অতীতের কোন কিছুই সে আর মনে রাখতে চাইছে না।

বছর সাতেক আগে ভূপালে বেশ জমিয়ে বসেছিল ওম। জন-দশেক চৌকস সহকারীর অধিনায়ক তখন সে। ছিনতাই থেকে রাহাজানি—কিছুতেই তার অরুচি ছিল না। অবশ্য খুনোখুনির মধ্যে কখনও যায়নি। এমন একটি রত্নকে পুলিশ খুঁজে বেড়াবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। অসাবধানতা বলে একটা কথা আছে। এই অসাবধানতার ফাঁদে পড়েই ওম একদিন ধরা পড়ে গেল। তার জীবনে সে এক অতি বিশ্রী দিন।

কয়েক দফা মিলিয়ে তার শাস্তি হল দু'বছর। স্বাভাবিক কারণেই দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে সে আর দল গড়ার চেষ্টা করেনি। ও লাইন দিয়ে আর না হেঁটে সোজা চলে এসেছে দিল্লীতে। নতুন ধরনের ধান্দায় তারপর থেকে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। আবার সমস্ত এলোমেলো হয়ে যাবে নাকি? বেদপ্রকাশের সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল।

—বেদ, তুমি এখন করছো কি?

—পরোপকার বলতে পার।

—যতদূর জানি পরোপকারে পেট ভরে না।

মৃদু হেসে বেদপ্রকাশ বলল, কিঞ্চিৎ মূল্যের বিনিময়ে অবশ্য। অর্থাৎ কেউ কেউ টাকার বিনিময়ে নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল ওস্তাদ। হাতে এখন জটিল একটা কাজ রয়েছে। পাওনাগণ্ডা চমৎকার। তুমি যদি আমাকে—

—আমাকে ও সমস্তর মধ্যে জড়িও না।

—কাজটা কি আগে শোনো। তারপর তো আপত্তি করবে। আগেকার ধরনের অবশ্য কিছু নয়। বেশ উঁচু ধরনের ব্যাপার। এমন মজার কাজ এড একটা পাওয়া যায় না।

—কাজটা কি শুনি?

—দেবীদয়াল চোকসির নাম শুনেছো তো? ওই বিরাট বাড়িখানা যার। তিনপুরুষের ব্যবসাদার—

—বলে যাও—

—ওর ছেলে প্রেমকিশোরের সঙ্গে আমায় ভাব জমাতে হবে।

—বেশ। তারপর—

—ক্রমে প্রেমকিশোরকে বারে-টারে নিয়ে যেতে হবে। তখন দু'একটা ছুঁড়ি ভিড়ে পড়বে তার সঙ্গে। ব্যাপার বেশ জমে উঠবে আর কি।

—বুঝলাম। কিন্তু এতে তোমার মক্কেলের লাভ কি?

ঠোঁট উল্টে বেদপ্রকাশ বলল, মক্কেল কিসের ইন্টারেষ্টে এই কাজ করাতে চাইছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। মোদ্দা কথা হল, কাজটা করে দিতে পারলে মোটা টাকা পাব।

—তোমার মক্কেলটি কে?

—নাম শুনে তোমার কি লাভ হবে ওস্তাদ? আগে মন পরিষ্কার করে বলে ফেল আমায় সাহায্য করবে কিনা?

ওম আবার একটা চারমিনার ধরাল। ঘন ঘন পাঁশুটে রং-এর ধোঁয়া মুখের উপর ছায়া বিস্তার করে উঠে যেতে লাগল উপর দিকে। প্রায় দু'মিনিট কিছুই বলল না ওম মেহতা। এটুকু সে বুঝেছে, প্রেমকিশোরকে বিপথে নিয়ে যেতে পারলে কারুর এমন কোন স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে যা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। ব্যাপার যাই হোক সে অন্য কিছুতে আর মাথা গলাবে না।

শেষে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আমি তো দেবীদয়াল বা প্রেমকিশোর কাউকেই চিনি না।

—আমি কি চিনি? আমরা দুজন এক সঙ্গে মাথা খাটালে মতলব একটা বেরুবেই। তারপর চেনাচিনির কাজটা—

—আর ও কথা নয়। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারলাম না বলে কিছু মনে করো না। ও সমস্ত লাইনে আর নেই। দালালি করে এখন পেট চালাই।

—ওস্তাদ—

—সত্যি দুঃখিত। আমার একটু তাড়া আছে। তুমি কোন দিকে?

—তোমার মত লোকের মুখ থেকে এমন কথা শুনতে পাব ভাবিনি। অনেক বদলে গেছ ওস্তাদ। চলি—

উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বেদপ্রকাশ স্কুটারে স্টার্ট দিল। তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গোলমার্কেটের দিকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওম মেহতা এগুলো ফুটপাত ধরে। দেবীদয়াল চোকসির বাড়ির প্রায় সামনা-সামনি এসে রাস্তা পার হল। এই বাড়িখানা মধ্যপ্রদেশের কোন এষ্টেটের অধিপতি তৈরি করিয়েছিলেন। বছর দুয়েক হল মাত্র হাতবদল হয়েছে। চোকসি সাহেব অবশ্য ঝেড়ে মেরামত করিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন পরে ওম এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিগারেটের টুকরোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ঢুকলো গেট পেরিয়ে ভেতরে। মালিরা বাগানে কাজ করছে। শিশির ভেজা লনের দিকে তাকাতে তাকাতে পৌঁছল পোর্টিকোয়। ওখানে নতুন মডেলের একখানা ফিয়েট দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে তখন একজন সুবেশ ভদ্রলোক নামছিলেন। তিনি ভ্রু-কুঁচকে তাকালেন ওমের দিকে।

ওর অবশ্য তাঁকে প্রাঙ্গের মধ্যে না এনে চার ধাপ সিঁড়ি টপকে ভেতরে প্রবেশ করল। ভদ্রলোকও এলেন পিছু পিছু। দামী সোফাসেট দিয়ে সাজান পার্লারে তখন কেউ ছিল না। অবশ্য বেয়ারা দেখা দিল তখনই। সুবেশ ভদ্রলোককে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

সুবেশ ভদ্রলোক বললেন, মিসিবাবা ঘুম থেকে উঠেছেন?

—অনেকক্ষণ উঠেছেন সাব।

—তাঁকে খবর দাও।

ওর কি প্রয়োজনে এসেছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে বেয়ারা নিষ্ক্রান্ত হল। চোকসি হাউসের বাইরের অবস্থা এখন একটু ভিন্ন ধরনের। বেদপ্রকাশ সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতেই গোলমার্কেটের দিকে এগিয়ে ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওস্তাদ কিছু.যেন চেপে যাচ্ছে, মিথ্যার আশ্রয়ও নিয়েছে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কি?

অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ বেদপ্রকাশ। দ্রুত স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে সে এমন জায়গায় এসে থামল—অবশ্যই একটু আড়াল নিয়ে, যেখান থেকে ওর মেহতাকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। ওর তখন রাস্তা পেরিয়ে চোকসি হাউসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে সে যখন ভেতরে ঢুকে গেল তখন বেদপ্রকাশের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে তার সন্দেহ অমূলক নয়। ওস্তাদের এ বাড়িতে যাতায়াত আছে, প্রেমকিশোর কে সে ভালই চেনে—অথচ সে কথা স্বীকার করল না।

চোকসি হাউসের গায়েই একটা ডাক্তারখানা—চৌধুরী ক্লিনিক।

বেদপ্রকাশ এগিয়ে এসে ক্লিনিকের সামনে স্কুটার থামাল। একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। মনে হচ্ছে আজকাল বড় জলে ঘাই মারতে ওস্তাদ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর তখন লন পেরিয়ে পৌঁছে গেছে পোর্টিকোয়। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ফিয়েটের উপর দৃষ্টি পড়তেই বেদপ্রকাশের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। সাত সকালে রাকেশ চৌহানও এখানে এসে পৌঁছেছে!

—ওদিকে—

বেয়ারার কাছে খবর পেয়েই রিণা পার্লারে এল।

লক্ষপতি বাপের মেয়ে রিণা। কিন্তু সাজ-পোশাকে তেমন একটা চমক নেই। অপূর্ব সুন্দরী বলতে যা বোঝায় অবশ্যই সে তা নয়। তবে এমন একটা আলগা শ্রী আছে যাতে দেখতে ভাল লাগে। এখন পরনে নীল রং-এর ভয়েলের শাড়ি, পিঠের উপর ফেলা রয়েছে আখরোট রং-এর শাল। গয়না বা আর কিছুর নেই কোন বাহুল্যতা।

এক ঝলক হাসি মুখে টেনে এনে রিণা বলল, আপনার তো খুব সকালে ঘুম ভাঙে রাকেশবাবু?

বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে রাকেশ চৌহান বলল, এই সময় এসে পড়ায় আপনাকে কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছি বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব, না এসে উপায় ছিল না।

—খুব জরুরী কাজ বুঝি?

—জরুরী বই কি।

এই সময় রিণার দৃষ্টি পড়ল ওম মেহতার উপর।

—আপনি—

—চোকসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?

—না। ওম মেহতা দেখা করতে চায় একথা শুনলেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

রিণা বেয়ারাকে ডেকে খবর পাঠাল।

তারপর রাকেশের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন, লনে গিয়ে বসা যাক।

দুজনে লনের দিকে চলে যাবার পর ডলি কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। ও ভাবতে লাগল এই ছোকরাকে আগে কোথায় দেখেছে। চেনা চেনা লাগছে কেমন যেন।

কয়েক মিনিট পরে বেয়ারা ওমকে ডেকে নিয়ে গেল। নিজের সুসজ্জিত স্টাডিরুমে ডিভানের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসেছিলেন দেবীদয়াল চোকসি। বয়স সাতান্ন-আঠান্নর বেশি হবে না। লম্বা বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য তিনি নন, তবে বেশ ভরাট দেহের অধিকারী। সুদর্শন তাকে কেউ বলবে না। তবে তাঁর তামাটে রং-এর মুখের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট নেই একথা কেউ বলবে না। তীক্ষ্ণ ফলার মত চোখের দৃষ্টি কাউকে বিঁধবার জন্য যেন তৈরি রয়েছে।

তিন পুরুষের ব্যবসাদার চোকসিরা। দেবীদয়ালের বাবা অবশ্য শেষ বয়সে গোটা কয়েক মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ফলস্বরূপ ব্যবসার উপর যে চাপ পড়েছিল তা সামলাতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন দেবীদয়াল। প্রথম যৌবনের দিনগুলি কেটেছে অভাবকে সঙ্গী করে। শেষে তিনি সব কথা বুঝেছেন, সোজা পথ দিয়ে হেঁটে বড়লোক হওয়ার সাধ ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। সুতরাং—

এরপর থেকেই বাঁকাপথে ব্রুত আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে দেবীদয়ালের। শেষে এমন দিন এসেছে যখন তাকে আর টাকার পিছনে দৌড়াতে হয় না, টাকাই তাঁর পিছনে দৌড়াচ্ছে। এখন অবশ্য ওপথ থেকে সরে আসতে পারেন। সাদা আর কালো মিলিয়ে যা জমিয়েছেন তাতে স্বচ্ছন্দে আরো চার পুরুষের রাজার হালে চলে যাবে। তবু তিনি ক্ষান্ত হননি। বিরামহীন রোজগার করে যাওয়াটাও বোধহয় তাঁর নেশার মত একটা কিছু।

ওমকে দেখেই ভারি গলায় দেবীদয়াল বললেন, কতদিন পরে তুমি আবার এখানে এলে মেহতা ?

—তা স্যার মাস ছয়েক পরে।

—এতদিন ছিলে কোথায় ? তোমার আইডিয়া কেনবার অনেক মহাজন বোধহয় জুটে গিয়েছিল ?

—কি যে বলেন স্যার ? বিনয়ের হাসি হেসে ওম বলল, আপনার কাছেই যা যাওয়া আসা। তেমন কোন লাভজনক প্ল্যান খুঁজে পাইনি বলেই এত দিন আসিনি।

—বেশ, বেশ—সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেবীদয়াল বললেন, এখন নিশ্চয় জব্বর কোন প্ল্যান মাথায় নিয়ে এসেছো। বলে ফেল। শোনাই যাক।

—আমি বসতে পারি স্যার ?

—অবাক কাণ্ড। আমি তোমায় কখন বললাম দাঁড়িয়ে থাকতে ? ওই সোফাটায় জমিয়ে বসে বলতে আরম্ভ করে দাও।

ওম সোফায় বসে পড়ে বলল, আপনি নিশ্চয় সারাদেশব্যাপী বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কথা শুনেছেন ?

—শুনেছি বই কি।

এর কারণও আপনার অজানা নয়। পাওয়ার সর্টেজ। কলকারখানা চালু রাখার জন্য অনেক রাজ্য বিদ্যুৎ রেশনিং-এর কথা ভাবছে। আপনি পাঞ্জাবের গোটা তিনেক বড় শহর থেকে কেরসিন তেল আর মোমবাতি একেবারে উধাও করে দিন। নতুন সাপ্লাই এসে পৌঁছতে পৌঁছতে হেসে খেলে আট দশ লাখ টাকা আয় করে নেবেন।

—হুঁ। এত জায়গা থাকতে পাঞ্জাবে কেন ?

—আমি খবর পেয়েছি, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ষোল ঘন্টা করে বিদ্যুৎ পাবে না। কলকারখানা চালু রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নিভে যাওয়া সিগারেটটায় ব্যর্থভাবে বার ছয়েক টান দিয়ে দেবীদয়াল বললেন, অনেক টাকা ইনভেষ্ট করতে হবে বুঝতেই পারছ। তারপর দেখা গেল তোমার কথামত এতক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ রেশনিং হল না। তখন কি হবে ?

—হবেই। আমি রিলায়েবল সোর্স থেকে খবর পেয়েছি। অতীতে আপনি দেখেছেন আমার কোন সংবাদ ভুল প্রতিপন্ন হয়নি।

—তোমার সোর্সটি কে জানতে পারি ?

—মাপ করবেন স্যার। ওটা আমার বিজনেস সিক্রেট। ছন

দেবীদয়াল ডিভান ছেড়ে উঠে পড়লেন। প

অন্তমনস্ক ভঙ্গিতে বার কয়েক পায়চারি করে, আবার বসতে বসতে বললেন, শোনো মেহতা, ও সমস্ত কাজে আমি আর যেতে চাই না। বড় বেশি ঝামেলা। তুমি এসে পড়ে ভালই হয়েছে। আমি নতুন ধরনের একটা কাজে হাত দিতে চলেছি। তোমার মত একজন সহকারী এখন আমার দরকার।

ওম নড়ে চড়ে বসল।

—কি ধরনের কাজ স্যার! তাছাড়া আমার—

—পরকে প্রাণ বিক্রি করে আর পেট ভরাতে হবে না। চোখ ঝলসানো স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা আমি তোমাদের করে দেব।

এরপর তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হল, এদেশে আমদানী হয় না অথচ যার প্রচুর চাহিদা আছে এমন সমস্ত ওষুধ এক গোয়ানিজ চোরা পথে বোম্বাই-এ এনে জমা করছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে তার দুই প্রধান সহকারীর সঙ্গে ধরা পড়ে গেছে। অবশ্য পুলিশ মালের সন্ধান পায়নি। গোয়ানিজের একজন অনুচরের সঙ্গে দেবীদয়ালের যোগাযোগ হয়েছে। বেকায়দায় পড়ে যাওয়ায় ওদের এখন টাকার টানাটানি চলছে। সমস্ত মাল বেশ কম দামেই ছেড়ে দেবে। কাজেই এ সুযোগ দেবীদয়াল হারাতে পারেন না।

—কত মাল আছে স্যার?

—প্রচুর।

—যতই থাক, একদিন তো ফুরিয়ে যাবে—তারপর?

—প্রয়োজন হলেই আবার আনিয়ে দেবে। ইউরোপের একটা ভাল চেনের সঙ্গে ওরা যুক্ত আছে। ভেবে দেখ মেহতা, কি দারুণ কাণ্ড হবে। পাঁচ টাকার এ্যাম্পুল বিক্রি হবে নব্বই টাকায়! কত পারসেন্ট গিয়ে দাঁড়াল একবার হিসাব করে দেখ।

—সোনার হরিণকে আপনার খাঁচায় ভরে ফেলতে পেরেছেন স্যার। এবার দয়া করে যদি বলেন আমার ব্যবস্থা কি রকম করবেন—

—তুলনাহীন ব্যবস্থা বলতে পার। পনেরো পারসেন্ট পাবে। তোমার কাজ হবে এই ব্যবসাটা দেখাশুনা করা। আগামী পরশুদিন আমি বম্বে যাচ্ছি। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

—মাল কিনতেই যাচ্ছেন বোধহয়?

—শুধু কিনতে নয়। চোখ বাঁচিয়ে মাল এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেও। অবশ্য আরো কিছু করণীয় আছে। একটা ড্রাগ লাইসেন্সের দরকার।

—ড্রাগ লাইসেন্স!

মৃদু হেসে দেবীদয়াল বললেন, হ্যাঁ। নিজের নিরাপত্তার জন্যই এর প্রয়োজন। ওই লাইসেন্সের জোরে একটা জমকাল দোকান করা যাবে। যার দশটা স্থানীয় ওষুধের সঙ্গে ওগুলো বিক্রি হতে থাকবে নির্দোষভাবে।

অবশ্য লাইসেন্সটা আমি নিজের নামে নেব না। নেব একজন ডাক্তারের নামে।

—কোন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন ?

—না। এবার বলব। আমার বাড়ির পাশে একজন তরুণ বাঙ্গালী চিকিৎসক ডিসপেনসারি খুলেছে দেখে থাকবে ? একেবারেই পসার নেই। তাকেই টোপ খাওয়াব। তবে প্রথমে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝতে দেওয়া হবে না। পরে অবশ্য সে সমস্তই বুঝতে পারবে। তখন অবশ্য তার কিছু করার থাকবে না। পুলিশের ভয়ে সে সম্পূর্ণ আমাদের ক্লাচে এসে পড়বে। তুমি এখন এক কাজ করো—

—বলুন ?

—শুভকাজে দেরি করে লাভ নেই। এখনই ছোকরা ডাক্তারকে কল দাও। বলবে গতরাত থেকে আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। এমন জাঁদরেল রুগীকে দেখতে সে ছুটতে ছুটতে আসবে।

—ডেকে আনি তাহলে ?

—নিশ্চয়।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ওম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গেট অতিক্রম করার আগে সে দেখল, মিষ্টি রোদে ছাওয়া লনে বেতের চেয়ারে বসে রিপা আর সেই সুবেশ ছোকরা গল্প করছে। বেদপ্রকাশ কিন্তু তখনও যায়নি। গেটের একটু ওধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ওমকে আসতে দেখে দ্রুত সরে গেল আড়ালে।

'চৌধুরী ক্লিনিক' অনেকক্ষণ খুললেও রাহুল মিনিট দশেকের বেশি হয়নি ক্লিনিকে এসেছে। মেডিকাল জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল। এছাড়া আর ওর কাজ কি ? গত ছ'মাসের মধ্যে দশটা রুগী ওর কাছে এসেছে কিনা সন্দেহ। অথচ ক্লিনিক খোলার আগে কত কি ভেবেছিল। ভেবেছিল, অচিরেই সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে—রুগীর ভিড়ের জন্য হয়তো নাইবার খাবার সময় পাবে না।

কোথায় কি ? সাজিয়ে গুছিয়ে বসে থাকাই সার। রাহুলরা আসলে বেনারসের লোক। ওর বাবা রেবতী চৌধুরী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কোথাও চাকরি না করে দিল্লী অঞ্চলে রোড কনট্রাকটারি করতেন। ক্রমে টাকা পয়সা ভালই জমালেন। বাড়িও করলেন এখানে। একমাত্র ছেলে রাহুলকে ঠিকভাবে মানুষ করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। রাহুল তার সেই আগ্রহকে যথোচিত সম্মান দিয়েছে।

ছেলে ডাক্তারী পাশ করেছে দেখে মাত্র কিছুদিন হল মারা গেছেন রেবতী চৌধুরী। বর্তমানে মাকে নিয়েই রাহুলের সংসার। তিনি অবশ্য

বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি করছেন। ও রাজি হয়নি। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াক তারপর বিয়ে। অবশ্য এখন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে অন্যরকম।

সে কথা পরে আসছে।

মেডিকাল জার্নালগুলো একপাশে ঠেলে রাখল রাহুল। কয়েক দিন ধরেই একটা কথা ভাবছে। প্র্যাকটিস যে জমবে না এ একরকম নিশ্চিত। চাকরির চেষ্টা দেখলে কেমন হয়? কোন কোম্পানীর মেডিকাল অফিসার বা মিলিটারী ডাক্তার—এডুকেশন কেরিয়ার ভাল, স্বাস্থ্য পুষ্ট দীর্ঘ দেহ, স্মার্ট, লোক তাকে সুশ্রীই বলে, এ সমস্ত কোয়ালিফিকেশন কি চাকরির পক্ষে যথেষ্ট নয়?

অবশ্য আজ তাকে বেশিক্ষণ চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে হল না, পুরোদস্তুর গরম পোশাকে সজ্জিত একজন মধ্যবয়স্ক লোক প্রবেশ করল চেম্বারে। রাহুল নড়েচড়ে বসল। সচকিত হল একটু। রুগী নাকি? তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

—আমি চোকসি হাউস থেকে আসছি। লোকটি বলল, কর্তা অসুস্থ। আপনি একবার গেলে ভাল হয়।

নিজের কানকে বিশ্বাস করা রাহুলের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ল। সে ভালই জানে বহুলক্ষ টাকার মালিক দেবীদয়াল চোকসির ওখানে দিল্লীর সেরা সমস্ত চিকিৎসকদের আনাগোনা। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার যে আজ তাকে কল দেওয়া হয়েছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

—অসুখটা কি?

—প্রেসারের ট্রাবল আছে।

—চলুন।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে রাহুল এগুলো।

ওদিকে—

রাকেশ চৌহান বলছিল, আজ বাজে কথা অনেক হল। এবার যা বলতে এসেছি তাই বলি। আগামী রবিবার আমরা একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছি—অবশ্য পার্টি না বলে পিকনিক বলাই ভাল। ফতেপুরের নিরালা পরিবেশে খাওয়া দাওয়া আর গান বাজনা হবে আর কি।

—তাই নাকি!

—আপনি যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

—আমাকে বাদ দিতে হবে রাকেশবাবু। রিণা বলল, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

—সে কি। আপনি না গেলে তো সমস্ত কিছু জোলো জোলো ঠেকবে। না না, ও কোন কাজের কথাই নয়। যেতে আপনাকে হবেই।

মাপ করবেন। হৈচৈ আমার একেবারে ভাল লাগে না, তাছাড়া—

তাকে থামিয়ে রাকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা আর হল না! কখন নিঃশব্দে প্রেমকিশোর এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি। প্রেমকিশোরের বয়স বছর সাতাশের বেশি হবে না। গৌরবর্ণ দেহটি ছিপছিপে। ধারাল মুখের উপর কেন জানা যায় না সব সময় বিরক্তির ছায়া। নিজেদের কাপড়ের ব্যবসা সে দেখাশুনা করে থাকে।

চোখ পড়ে যেতেই কিছুটা উচ্ছসিত ভাবে রাকেশ বলল, প্রেমকিশোরবাবু যে? সব ভাল তো?

—মন্দ নয়। আপনি কিসের একটা ব্যবসা করেন না?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—ব্যবসা কখন দেখেন তাই ভেবেই অবাক হচ্ছি। শুনি, সব সময় নাকি এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার পরামর্শ নিলে বলব, অনর্থক সময় নষ্ট না করে কাজে মন দিন।

রাকেশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। অবশ্য নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্রেমকিশোর এবার বোনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

—তোমাকেও আমি ওই কথাই বলব রিণা। সামনে এম. এ. পরীক্ষা। সময় নষ্ট না করে তোমার পড়ায় মন দেওয়া উচিত।

—আমি সেই কথাই ওঁকে বলতে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে পিকনিকে ইনভাইট করছিলেন। এখন যে আমার পক্ষে যাওয়া—

রিণা কথা শেষ না করেই থেমে গেল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দুজনে দেখতে পেল. লনের পাশ দিয়ে ডাঃ চৌধুরী ব্যস্তভাবে এগুচ্ছেন। তাঁর পিছনে ব্যাগ হাতে আরেকজন। রিণা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল রাহুলের।

—ডাক্তারবাবু, আপনি এখানে?

—রুগী দেখতে চলেছি।

—রুগী। মানে……

—শুনলাম চোকসি সাহেব অসুস্থ।

—কই আমরা তো কিছু জানি না!

রিণাকে পাশ কাটিয়ে রাহুল এগুলো।

কয়েক পা পিছন থেকে বিস্ময় মেশান গলায় প্রেমকিশোর বলল, ব্যাপারটা কি? ডাঃ মেহরা থাকতে এই ছোকরাকে যে বাবা বড় ডেকে পাঠালেন?

—আমি কিন্তু অন্য কথা ভেবে অবাক হচ্ছি দাদা। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অথচ আমরা কিছুই জানি না।

—তাইতো দেখছি!

রিণা আর কিছু বলল না। তবে তার মুখে চিন্তার ছায়া ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে লাগল। প্রেমকিশোর কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রাহুল ও ওদের চলমান দেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। রাকেশ এখন কি করবে ভেবে না পেয়ে কিছুটা বিরক্ত ভাবেই সিগারেট ধরাল।

রিণা ততক্ষণে এগিয়েছে।

—আমি তাহলে—

—আপনি আজ আসুন রাকেশবাবু। পরে আবার দেখা হবে।

কথা শেষ করেই রিণা বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালাল। প্রেমকিশোর তাকে অনুসরণ করেছে। সদ্য ধরান সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মহাতেতো মন নিয়ে রাকেশ গেটের দিকে এগুলো। গেটের বাইরে পা দিতেই দেখতে পেল দূরে দাঁড়িয়ে বেদপ্রকাশ ইশারায় ডাকছে। ওদিকে ড্রাইভার মালিককে পায়ে হেঁটে চলে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি গাড়িতে স্টার্ট নিল।

ব্লাড প্রেসার দেখার যন্ত্রটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে রাহুল বলল, আপনার বয়েসের তুলনায় প্রেসার বেশি নয়। এরকম থাকাটাই স্বাভাবিক। এবার বলুন তো কি ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল?

দেবীদয়াল ডিভানের উপর সোজা হয়ে বসে বললেন, কাল রাত্রে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। ঘাড়ের একটু উপরে টিপটিপ করছিল। ভাবলাম প্রেসার বেড়েছে। আপনি বলছেন—

—প্রেসার নর্মাল। মনের উপর চিন্তার একটু চাপ বেশি পড়লে সময় সময় এরকম হয়। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। খেয়ে দেখুন।

প্রেসকিপশন লিখতে লাগল রাহুল।

দেবীদয়াল ইন্টারকামের নব টিপলেন, বিনোদ, একবার এঘরে এস।

ওম একপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে। দেখে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। দেবীদয়ালের সেক্রেটারি বিনোদ মেহরা ঘরে প্রবেশ করল। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। প্রায় বছর দশেক এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

—এই যে বিনোদ, তুমি নিশ্চয় ডাঃ চৌধুরীকে চেন? আমাদের বাড়ির প্রায় পাশেই এঁর চেম্বার।

বিনীত ভাবে বিনোদ বলল, আমি এঁকে জানি।

—আজ থেকে ডাঃ চৌধুরীকে আমি ফামিলি ফিজিশিয়ান নিযুক্ত করলাম। এঁর ফি আর ওষুধের দামটা পাঠিয়ে দেবে। ভাল কথা, বেয়ারা কে বলো আমাদের এখানে চা দিয়ে যাবে।

—আবার এ সমস্ত হাঙ্গামা করছেন কেন?

দেবীদয়ালের ব্যবহারে মনে মনে দারুণ উৎফুল্ল হলেও, কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে আপত্তি জানাতেই হল। বিনোদ ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

—এমন কিছু সময় আপনার নষ্ট হবে না। দেবীদয়াল বললেন, এক কাপ চা বইতো নয়। বোধহয় জানেন না, রেবতীবাবু—মানে আপনার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল।

—সত্যি আমি জানতাম না।

—খুবই দুঃখের কথা এতদিন আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি। অবশ্য শেষ ভাল যার সব ভাল। কি বলো মেহতা?

—আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। এতক্ষণে ওম মেহতা কথা বলার সুযোগ পেল, ওই ব্যাপারটায় ডাঃ চৌধুরীর সহযোগিতা নিলে হয় না?

—কোন ব্যাপারে বলতো?

বেয়ারা চাকাওয়ালা ট্রে-তে করে চা আর কিছু খাদ্যবস্তু নিয়ে এল। সে অবশ্য একা আসেনি। সঙ্গে রিণাও রয়েছে।

—বাবা, শুনলাম তোমার শরীর খারাপ। কি হয়েছে?

বাৎসল্যের হাসি উথলে উঠল দেবীদয়ালের মুখে, তুমি চিন্তা করো না বেবি।

আমি ঠিক আছি। ডাঃ চৌধুরী, আমার মেয়ে রিণা। ওর মা তো বেঁচে নেই। এখন ওই হল বাড়ির গিন্নী।

নমস্কার বিনিময় হল।

রিণা খাবার প্লেট এগিয়ে দিল তিনজনের দিকে। পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে রিণা বলল, তুমি মোটেই ঠিক নেই বাবা। এই বয়সে এত পরিশ্রম শরীর বইতে চাইবে কেন?

—শুনছেন ডাক্তার—আমার মেয়ের কথা শুনছেন? ঠিক আছে বেবি, এবার থেকে পরিশ্রম কমিয়ে দেব না হয়। তুমি এখন পড়াশুনা করগে যাও। আমাদের কিছু জরুরী কথাবার্তা আছে।

রিণা অনিচ্ছার সঙ্গেই নিষ্ক্রান্ত হল।

দেবীদয়াল আবার বললেন, মেহতা, তুমি যেন কি বলছিলে?

ওম বলল, আমি ওষুধের দোকানের কথাটা বলতে চাইছিলাম স্যার। ও ব্যাপারে ডাঃ চৌধুরীর সহযোগিতা—

—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ডাক্তার, আমি এমন একটা ওষুধের দোকান করতে চাই যার জোড়া দিল্লীতে আর থাকবে না। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কি?

সচকিত রাহুল বলল, কি ধরনের সহযোগিতা চাইছেন?

—ওই দোকানের লাইসেন্স একজন ডাক্তারের নামে নিতে চাই। আপনি

প্রতিবেশি, তাছাড়া আলাপ পরিচয়ও হয়ে গেল—আপনার নামে নিতে ক্ষতি কি ?

একটু থেমে কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে দেবীদয়াল বললেন, তাছাড়া—অবশ্য আপনি কিছু মনে করবেন না—যতদূর জানি একেবারেই পসার জমাতে পারেননি। আপনি যদি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন পসার অচিরেই জমে যাবে। কারণ এতবড একটা ওষুধের দোকানেই আপনার চেম্বার হবে। দোকানের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হবে কর্নট প্লেস।

রাহুল দ্রুত ভাবছিল, আজ ঘুম থেকে ওঠার পর সে প্রথম কার মুখ দেখেছে মনে পড়ছে না। না পড়ুক। তবে সেই পয়মন্ত লোকটি যে তার ভাগ্যকে এক বাঁকের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে তাতে সন্দেহ কি ?

তবু সে ইতঃস্তত করে বলল, দেখুন, আমার বেশ অদ্ভুত লাগছে। প্রথম পরিচয়ে আমার প্রতি আপনার এই—

—পরিচয় প্রথম হলেও আপনার খোঁজ আমি অনেক দিন থেকেই রাখি। আসলে কথাটা কি জানেন—মোলায়েম হাসিতে মুখ ভরিয়ে দেবীদয়াল বললেন, আমি ঝুঁদে ব্যবসাদার। লোক চরানই আমার কাজ! কাকে বিশ্বাস করা যাবে আর কাকে যাবে না, তা আর অনেকের চেয়ে আমি ভাল বুঝি ?

এতক্ষণে পরে ওম আবার বলল, লাভের কথাটা বলুন ?

—পসার জমে যাওয়ার কথা আগেই বলেছি। একজন ডাক্তারের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কাম্য আর হতে পারে না। তবু কিছু বাড়তি লাভের ব্যবস্থা আমি রাখব ; ওষুধ বিক্রির উপর আপনি মোটা কমিশন পাবেন।

রাহুল বলল, আপনি আমার কাছে এক অভাবনীয় প্রস্তাব রেখেছেন. তবু আমাকে যদি একবার—

—নিশ্চয়। ভেবে দেখুন। কাল এই সময় এসে আমায় বলবেন। শুধু মনে রাখবেন, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আপনাকে আর কেউ দেবে না। আর একথাও নিশ্চয় জানেন, ভাল সুযোগ বার বার আসে না।

—আমি তাহলে আজ উঠি ?

—আসুন।

রাহুল আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে অপেক্ষা করছিল বেয়ারা। সে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল পোর্টিকো পর্যন্ত। ডাক্তারী পড়া যে সার্থক হয়েছে, এই কথা ভাবতে ভাবতে রাহুল নিজের চেম্বারে গিয়ে পৌঁছাল। রিভলভিং চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়েছে, কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে প্রশান্ত এসে দাঁড়াল।

—কিছু বলবে ?

পাড়ার ছেলে প্রশান্ত! কম্পাউণ্ডারীতে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বেকার বসে ছিল।

রাহুল ওকে নিজের ডিসপেনসারিতে নিযুক্ত করেছে। ছেলেটি ভাল।

—কাল আমায় ছুটি দিতে হবে দাদা।

—কোথাও যাবে নাকি?

—মথুরাদাস রামনিবাস সেবা সদনে ইণ্টারভিউ আছে।

—বাঃ, আমাদের দুজনের ভাগ্যই মোড় নিচ্ছে চলেছে দেখছি। এক কাজ করো, তুমি বরং এখনই বাড়ি চলে যাও। ইণ্টারভিউ দেবার আগে কিছু প্রস্তুতি দরকার।

প্রশান্ত এখন আর অবাক হয় না। রাহুলের অনেক খামখেয়ালীপনার সঙ্গে সে পরিচিত। মাথা হেলিয়ে ও চলে এল ওখান থেকে। একটা সিগারেট শেষ করতে যেটুকু সময় লাগে—তারপর রাহুলও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

অন্যান্য দিন রুগীর আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, আজ ওই ভাবে বসে থাকা নিরর্থক। মনে এখন দারুণ চাঞ্চল্য। কাল আবার দেবীদয়ালের কাছে গিয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত মন সুস্থির হবে না। দশ মিনিটের মধ্যে ডিসপেন্সারিতে তালা লাগিয়ে রাহুল বাড়ির পথ ধরল।

ট্যাক্সি বা অটো-রিক্সার দরকার হবে না, বাড়ি তার এই পাড়াতেই। বর্তমানে সে একাই আছে। বছরের মধ্যে ছমাস মা বেনারসে থাকেন। কড়া নাড়তেই লাল দরজা খুলে দিল। রান্না করা থেকে ঘর পরিষ্কার—অর্থাৎ বাড়ির যাবতীয় কাজ করে লাল।

রাহুল নিজের ঘরে গিয়ে স্যুট পালটে ড্রেসিং গাউন পরল। তারপর চলে এল উঠানের ধার ঘেঁষা বারান্দায়। এখানে বহুক্ষণ রদ্দুর থাকে। গড়ানে বেতের চেয়ারে বসতে বসতে লালকে বলে দিল, এক কাপ চা করে দিয়ে যেতে। সিগারেট ধরিয়ে আবার বিবেচনা করে দেখতে লাগল দেবীদয়ালের প্রস্তাবটা।

লাল চা দিয়ে গেল।

সেদিকে খেয়াল নেই রাহুলের। সে ভাবছে—ভাবছে, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে মানুষের জীবনে! দেবীদয়ালের প্রস্তাবে যে রাজী হবে এতে দ্বিমত নেই। সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়নি, নিজের মান রক্ষা করার জন্যই। তিনি তাকে হ্যাংলা ভাবতে পারতেন।

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চমকে মুখ ফেরাল রাহুল। তারপরই হতবাক হয়ে গেল। তার কাছ থেকে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে রিণা। হাসছে মৃদু মৃদু। এবার এগিয়ে এল কাছে।

—কাপটা তুলে নাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—এই সময় তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। কেউ দেখে ফেলে থাকলে ব্যাপার কিরকম দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?

রিণা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, কেউ দেখেনি। আমি পিছন দিকের দরজা দিয়ে এসেছি।

মৃদু হেসে রাহুল বলল জানাজানি হতে আর দেরি হবে না। আমাদের লাল এবার লাউডস্পিকারের কাজ করবে।

—না এসে আর থাকতে পারলাম না। তুমি যা কাণ্ড করতে চলেছ—

—আমি' তোমার কথাটা পরে শুনছি। এসে পড়ে ভালই করেছ। তোমাকে দারুণ একটা সুসংবাদ শোনাই। তোমার বাবা—

রিণা রাহুলকে বাধা দিয়ে বলল, বাবার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে আমি শুনেছি। জানো বোধহয় মেয়েদের আড়ি পাতার অভ্যাস থাকে?

—শুনেছ তাহলে। এরকম সুযোগ যে আমি পাব কখনো ভাবিনি। এবার পসার জমতে বাধা।

—বাবার দেওয়া সুযোগ তোমার নেওয়া চলবে না।

রাহুল অবাক হয়ে গেল কেন?

রিণা পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আমার বাবাকে তুমি আমার চেয়ে বেশি চেন না। কোন ঘোরাল স্বার্থ না থাকলে একজন অপরিচিতকে তিনি এত বড় সুযোগ দিতে পারেন না।

—ঘোরাল স্বার্থ।

—হ্যাঁ। বড়রকম কোন বেআইনী ব্যাপার। কত বাঁকা পথ ধরে লাখ লাখ টাকা উনি রোজগার করেছেন তা তো তুমি জানো না!

—তা অবশ্য জানি না। তবে—

—এর মধ্যে তবে বলে কিছু নেই। আমি সাবধান করতে এসেছি। তুমি বাবার ছায়া থেকে সরে আসবে এই হল শেষ কথা।

রিণার মুখের দিকে তাকাল রাহুল। ওর কাছে সমস্ত কেমন দুর্বোধ্য লাগছে।

রিণা রাহুলের একটা হাত চেপে ধরে আবার বলল, প্র্যাকটিস জমছে না বলে তুমি কেন এত মনমরা হয়ে পড়ছো বুঝতে পাচ্ছি না। তোমাকে তো বলেছি, তোমার যা আছে আর মামার বাড়ি থেকে আমি যা পেয়েছি তাতে আমাদের দুজনের চমৎকার ভাবে বাকী জীবনটা কেটে যাবে। আমার এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে যাক না। তারপরই তো—

ওরা দুজন কথা বলতে থাকে, ইতিমধ্যে আমরা ওদের পরিচয়ের সূত্রটা খুঁজে নিই। যদিও একপাড়াতে দুজনের বসবাস তবু রিণা গ্রাজুয়েট হবার

আগে রাহুলকে দেখেনি। রাহুল তখন হাউস সার্জেন। মুখোমুখি দেখেনি! দেখেছিল দূর থেকে। দিল্লীর উঁচু সোসাইটিতে তার যাতায়াত। কত তরুণ তার সঙ্গ পাবার জন্য লালায়িত। তবু রাহুলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগেছিল তীব্র শিহরণ। খেয়ালী মেয়ে রিণা স্থির করে ফেলেছিল যে কোন উপায়ে ওই বাঙ্গালী ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। প্রথম দর্শনেই প্রেম একেই বলে বোধহয়।

সুযোগও এসে গেল।

নেহেরু মিউজিয়ামে দেখা হল দুজনের মুখোমুখি। যে সঙ্কুচিত হবে, যার লজ্জা পাওয়ার কথা, সে যদি ব্যগ্র থাকে তবে আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হয় না। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অবশ্য রিণার পরিচয় পাবার পর একটু কিন্তু ভাব এসেছিল রাহুলের মনে। তাও কেটে গেল ক্রমে।

লোকের চোখ বাঁচিয়ে এখানে ওখানে প্রায়ই দেখা হতে লাগল দুজনের। সময় কেটে চলল দ্রুত। ইতিমধ্যে আবার রাহুল চেম্বার খুলে বসেছে। প্রথমে বেশ উৎসাহ ছিল। কিছুদিন পরে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। সে বেশ বুঝতে পাচ্ছিল এজীবনে তার প্র্যাকটিস জমবে কিনা সন্দেহ।

রিণা কিন্তু নিরুৎসাহ হয়নি।

সে বলেছে, আরো বছর খানেক দেখ। আমারও তখন পড়া শেষ হয়ে যাবে। যদি প্র্যাকটিস জমে ভাল, নইলে আমরা কোন ছোট শহরে চলে যাব। সেখানে তুমি চেম্বার খুলবে।

—সেখানেও যদি জমাতে না পারি?

—না পারলেই বা কি এল গেল! তোমার যা আছে তাতো আছেই, আমিও তো আর খালি হাতে আসবো না। বুঝলেন মশাই, তখন খরচ করেও কূল পাওয়া যাবে না।

দু'জনে একই সঙ্গে হেসে উঠেছে।

রিণার ওই ধরনের উক্তির নেপথ্যের ইতিহাস জেনে নেওয়াটা এখানে অন্যায় হবে না। সে ভাল রকমই জানে তাদের এই অসম বিবাহে দেবীদয়াল কখনই রাজী হবেন না। লাজ-লজ্জা আর চোখ রাঙানীর বেড়া টপকে সে যখন রাহুলের কাছে চিরদিনের মত চলে আসবে তখন তিনি তাকে একটা কানা-কড়িও দেবেন না এটা ঠিক।

ভাগ্যক্রমে কয়েক বছর আগে মামার বাড়ির পক্ষ থেকে রিণা আর প্রেম-কিশোর প্রচুর টাকা পেয়েছে। দেবীদয়াল ছেলে আর মেয়ের নামে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে ওই টাকা সমান ভাগে জমা করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রিণা যদি নিজের ভাগের টাকা নিজের খুশি মত ব্যবহার করতে চায় তাহলে কে বাধা দেবে।

রাহুল চলে যাবার পর আরো ঘন্টা খানেক ওর মেহ্‌তার সঙ্গে আলোচনা হল দেবীদয়ালের। সমস্ত বিষয়টা খুঁটিয়ে বিচার করে নিলেন দু'জনে। সন্ধ্যায় আবার আসবে একথা জানিয়ে মেহ্‌তা বিদায় নেবার পর দেবীদয়াল খাস কামরা থেকে বেরিয়ে, এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে বাগানে এসে নামলেন। বসলেন লনে গিয়ে।

প্রতিদিন এই সময় তিনি রদ্দুরে পিঠ দিয়ে গত-বিকালের আর সকালের আসা ডাক দেখে নেন। বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ মেহরা উপস্থিত হল এসে। তার হাত থেকে চিঠিগুলি নিয়ে সামনের নিচু টেবিলটার উপর রাখলেন। বিভিন্ন ধরনের খামে মোড়া খান কুড়ি চিঠি। একটা তুলে নিয়ে খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে তাকালেন বিনোদের দিকে।

—পরশুদিন আমি বম্বে যাচ্ছি। গুজরাট মেলে দুটো বার্থ বুক করো।

—এখুনি ব্যবস্থা করছি স্যার।

—এয়ার কণ্ডিশানড কুপে হলে ভাল হয়।

—আচ্ছা স্যার।

ট্রেনে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কিন্তু উপায় কি? প্লেনে চড়লে বুক ধড়ফড় করতে থাকে দেবীদয়ালের। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েন। এই জন্যই তো ইচ্ছে থাকলেও আজ পর্যন্ত আমেরিকা যেতে পারেননি। জাহাজে অবশ্য যেতে পারতেন কিন্তু সময় নষ্ট হয়ে যাবে, আসা যাওয়ায় প্রায় কয়েক মাস।

চিঠিগুলি একে একে দেখে যেতে লাগলেন। অধিকাংশই ব্যবসায় গত। অর্থাৎ কাপড় ব্যবসায়ে যে ঠাট বজায় রেখেছেন সেই সম্পর্কে। বেয়ারাকে ডেকে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলেন প্রেমকিশোরের কাছে। কাপড়ের ব্যবসা সেই দেখাশুনা করে থাকে।

কিছু আবেদন নিবেদনও আছে। পুরানো দিল্লীর এক সমাজ কল্যান সমিতি তিনি আর্থিক সাহায্য দিলে তাঁর নামে উদ্ধার আশ্রম বানাতে চায়। তারা দেখা করার অনুমতি চেয়েছে। এই ধরনের আবেদন পেলে মন তেতো হয়ে ওঠে দেবীদয়ালের। শেষ চিঠিখানা এবার হাতে নিলেন।

ভ্রূ-কুঁচকে উঠল তাঁর।

স্ট্যাম্প সাঁটা নেই। ডাক বিভাগের কোন চিহ্ন নেই। এ চিঠি ডাকে আসেনি। তাঁর বাড়ির গেটের পাশে যে ডাক বাক্স লাগানো আছে, তাতেই কেউ নিজের হাতে ফেলে গেছে। খামের উপর ঠিক আগেকার মতই টাইপ করে নাম ঠিকানা লেখা। এই নিয়ে তিনখানা হল।

এ ধরনের প্রথম চিঠিখানা পেয়েছিলেন মাস দুয়েক আগে। এই রকম এক সকালে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে সেখানাও তাঁর হাতে এসেছিল। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়তেই তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—

মাননীয় মহাশয়,

আমি নিজের পরিচয় অপ্রকাশিত রেখেই কিছু নিবেদন করতে চাই। অসৎ উপায়ে আপনি অজস্র টাকা উপায় করেছেন। তবু আপনার লালসা এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। আরো টাকার জন্য আপনি নিত্য নুতন ফন্দি এঁটে চলেছেন।

আমি ভদ্রভাবে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, ওপথ থেকে এবার সরে আসুন। অনেক হয়েছে—আর নয়। বরং পাপের পথ বেয়ে যে অর্থ আপনার হাতে এসেছে তা দু'হাত ভরে ভাল কাজে ব্যয় করুন। ভরসা করি আমার অনুরোধ রাখবেন।

বিনীত—
'জনৈক শুভাকাঙ্খী'

চিঠি পড়া শেষ করে সেদিন দেবীদয়াল আপন মনেই হেসে ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কেউ রসিকতা করেছে। এই ধরনের রসিকতা অবশ্য বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেই কারুর করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই চিঠির কথা তাঁর মন থেকে উবে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু দিন পর আবার যখন জনৈক শুভাকাঙ্খীর চিঠি পেলেন তখন তাঁর মনে হল রসিকতা কি এত-দূর গড়াবে? এবার চিঠিতে আগেকার সেই বিনীত ভাব নেই—কঠোর ভাষায় সে তাঁকে সতর্ক করেছে।

তৃতীয় চিঠিখানা আজ পেলেন দেবীদয়াল।

অদৃশ্য পত্রলেখক এবার কি লিখেছে দেখা যাক। খাম ছিঁড়ে বার করলেন চিঠিখানা। দামী লেটার প্যাডের কাগজে ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠি। ভ্রূ সরল না করেই দেবীদয়াল পড়ে গেলেন।

মহাশয়,

বারংবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও আপনি হঠকারিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে ধরেছেন। এই জেদ আপনার পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনবে একথা বোঝার চেষ্টা করুন। বন্ধে যাওয়া বন্ধ করুন। বিদেশ থেকে স্মাগল্‌ড ওষুধ নাই বা চড়া দামে বেচলেন।

শেষবার আপনাকে সতর্ক করছি। ও পথ থেকে সরে না এলে গুরুতর বিপদে পড়বেন। আপনার মত লোকের দশ বছর ঘানি টানাই হল উপযুক্ত শাস্তি। তবু আমি চাই না আপনি জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিন।

—জনৈক শুভাকাঙ্খী

কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করতে লাগল। কেউ যে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছে এ সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। বিদেশী ওষুধের ব্যাপারটা

একে বারেই দশ কান হয়নি। জেনেছে ওম মেহতা। অবশ্য সেক্রেটারি বিনোদ মেহরাও জানে। ওদের দু'জনের মধ্যে কেউ কি তাঁকে এই সমস্ত চিঠি লিখছে?

কিসের স্বার্থে লিখবে? এবং উল্টোটা ঘটতে থাকলেই তো তাদের লোভ। চিন্তিত মনে সিগারেট ধরালেন দেবীদয়াল। তারপর হেসে উঠলেন নিজের মনেই। এবং বলা চলে এই সঙ্গে কিছুটা লজ্জিতও হলেন। তিনি দেবীদয়াল চোকসি—চিরকাল সাহস আর টাকার জোরে সমস্ত নয় কে হয় করে আসছেন, আর আজ তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছে গোটা কয়েক ছেঁদো চিঠি। নাঃ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

তিনি বম্বে যাবেন! নিশ্চয় যাবেন। তাঁর কাজ এতদিন যেভাবে গড়িয়েছে, ভবিষ্যতেও সেই ভাবে গড়াবে। সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে নিয়ে তিনি নিভে যাওয়া সিগার আবার ধরিয়ে নিলেন। কয়েক টান দেবার পর দেখলেন বাড়ির দিক থেকে বিনোদ আসছে।

—কি হল?

– রিজার্ভেশনে ফোন করেছিলাম স্যার। জায়গা আছে। কুপে করতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আরেকটা কাজ করো। সেনকে জানিয়ে দাও ও যেন লাঞ্চ আওয়ারে আমার সঙ্গে দেখা করে।

রাজীব সেন দিল্লীর একজন বড় কনট্রাকটার। প্রয়োজন পড়লে তাঁকে দিয়েই কাজ করিয়ে থাকেন দেবীদয়াল। বিনোদ চলে যাবার পর তিনি রিষ্ট-ওয়াচের দিকে তাকালেন, দশটা দশ। উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। তাঁর বেরুবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

কনট প্লেসের এফ ব্লকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে 'চোকসি এন্টারপ্রাইজ'। একধারে ঝকঝকে রিটেল সপ, আধুনিক ডিজাইনের কাপড় চোপড়ের এমন বিপুল সমাবেশ দিল্লীর অন্য কোন দোকানে আছে কিনা সন্দেহ। অন্য ধারে হোলসেল। গোটা পাঁচেক কাপড়ের মিলের এজেন্সি নেওয়া আছে। প্রেমকিশোর যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীদয়াল এই ব্যবসা ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, কয়েক বছর ধরে সমস্ত কিছুই যোগ্যতার সঙ্গে সে সামলে আসছে।

আজকের বাজার একটু মন্দা। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে প্রেমকিশোর খেরো বাঁধান একটা খাতার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিল। তার পরনে পুরো দস্তুর সাহেবী পোশাক। রিটেল সপের সঙ্গে যুক্ত একটা ছোট ঘরে বসে সে কাজকর্ম তদারক করে। বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়লেই হোলসেল ডিপার্টমেন্ট

গদিতে এসে বসতে হয়।

একসময় খাতা মুড়ে রেখে গদি থেকে ওঠবার উপক্রম করার মুখেই চোখ পড়ল, মুনিমজী একজন সুবেশ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রেমকিশোর আবার আগেকার ভঙ্গিতে বসল।

মুনিমজী বললেন, ইনি আহমেদাবাদ থেকে আসছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কি যেন বলতে চান।

---বসুন—বসুন—

আগন্তুকের বয়স ত্রিশের আশেপাশে হবে। সে বসল পা মুড়ে গদীতে। আগন্তুক আর কেউ নয়, বেদপ্রকাশ। মুনিমজী নিজের কাজে চলে যাবার পর তার মুখে দেখা দিল উচ্চাঙ্গের হাসি।

—বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি ?

—সেবা তো আমি আপনার করতে এসেছি শেঠজি। আমাদের মিলের ট্রাইলেক্স কাপড় বাজারে এসে পড়ল বলে। আপনি একজন বড় হোলসেলার। আমরা আশা করছি আপনি ট্রাইলেক্সের এজেন্সিও নেবেন।

—নাইলেক্স তো জানি। ট্রাইলেক্স—

—বাজারে এসে পড়বার পর হৈ চৈ পড়ে যাবে।

নড়েচড়ে বসে প্রেমকিশোর বললে, যে-কটা এজেন্সি নেওয়া আছে তাতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। নতুন করে আর—

—আপনার মত ব্যবসাদারের মুখে একথা মানায় না শেঠজি। আগনলাল ভগবানদাস কত্তবড় কনসার্ন আপনি নিশ্চয় জানেন। ওঁদেরই নতুন অবদান হল ট্রাইলেক্স। নর্দান জোনের ভার আমার উপরই রয়েছে। এখন—

এই রিপ্রেজেণ্টেটিভরা কি রকম নাছোড়বান্দা হয় প্রেমকিশোর জানই জানে। কাজের সময়ই যত ঝামেলা এসে জোটে। এখনকার মত সে হাত এড়াবার জন্য সচেষ্ট হল।

—নমুনা দেখি ?

বেদপ্রকাশ সবিনয়ে বলল, আমি 'অ্যামবাসাডার' হোটেলে উঠেছি। ছোটখাট পার্টির আয়োজন করেছি সন্ধ্যায়। পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন ব্যবসাদার উপস্থিত থাকবেন। আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নমুনা দেখাবার ব্যবস্থা ওখানেই হবে। চল্লিশ রকম ভ্যারাইটি আছে।

—এতো এলাহি কাণ্ড করে বসেছেন। আমার পক্ষে—

—অনুগ্রহ করে আপত্তি করবেন না। নিশ্চয় আসুন। সমস্তই পছন্দের ব্যাপার। পছন্দ না হলে বলার কিছু থাকবে না।

কিছু বলতে যাওয়ার মুখেই প্রেমকিশোরকে একটু থামতে হল। দেবী-দয়াল রাজীব সেনকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েছেন। সেনের বয়স এখন ঠিক

কত আন্দাজ করা শক্ত। তবে তিনি যে বেশ ঝানু প্রকৃতির মানুষ মুখ দেখেই আঁচ পাওয়া যায়। অবশ্য ওম মেহতাও সঙ্গে এসেছে। দূর থেকে বেদপ্রকাশকে দেখতে পেয়ে সে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মনে পড়ে গেল সকালের কথা। বেদপ্রকাশ যার হয়ে কাজে লেগেছে সে প্রকৃত পক্ষে কি চায় তার একটা আন্দাজ পেলে অশ্বস্তি কিছুটা দূর হত। বলা বাহুল্য বেদপ্রকাশও এখানে ওমের উপস্থিতিতে বিস্মিত হয়েছে। মুখে কিন্তু নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে বসে রইল।

—প্রেম, ওধারের ঘর দুটো—দেবীদয়াল বললেন, গুদাম হিসাবে এখন আর ব্যবহার হচ্ছে না, তাই না?

—মাস পাঁচেক ধরে খালিই আছে।

—ভাল। ঘর দুটো আমার দরকার হবে।

এই সময় বেদপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখন আমি তাহলে আসি। সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসছেন।

সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেবীদয়াল তাকালেন তার দিকে।

প্রেমকিশোর বেদপ্রকাশের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানাল। অ্যামব্যাসাডার হোটেলে আমন্ত্রণের কথা জানাতেও ভুলল না সে।

—মন্দ কি? ঘুরে এসে মাল যদি পছন্দ হয়ে যায়, আরেকটা এজেন্সি না হয় নেওয়া হবে।

মহাখুশি বেদপ্রকাশ দেবীদয়ালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে ইত্যাদি ধরনের কিছু কথা বলে বিদায় নিল। যাবার আগে ইশারা করে গেল ওমকে।

দেবীদয়াল আবার পুরানো কথায় ফিরে গেলেন, একটা ওষুধের দোকান স্টার্ট করব স্থির করেছি। সেনকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। ঘর দুটো আধুনিক ডিজাইনে সাজাতে হবে।

—ওষুধের দোকান এখানে না করলেই বোধহয় ভাল হয়?

—কেন?

—আবার কবে ঘরগুলো দরকার হয়ে পড়ে বলা তো যায় না। তাই বলছিলাম—

বাপ ছেলের কথাবার্তার মধ্যেই ওখান থেকে সরে এল ওম। রাস্তায় পা দিতেই দেখতে পেল, বেদপ্রকাশ একটা খালি ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুতপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল ওম।

—পুরানো অভ্যাসটা তোমার এখনও রয়ে গেছে ওস্তাদ। জলের মত মিথ্যা কথা বলতে এখনও তোমার আটকায় না।

কিছুই যেন হয়নি এই ভাব নিয়ে ওম বলল, সকালের সেই ব্যাপারটার

কথা বলছো ?

আসলে তোমার কথা আমার বেশ জটপাকানো মনে হচ্ছিল। চোকসি সাহেবের সঙ্গে আলাপ আছে তাই আর বলিনি।

—শুধু আলাপ নয়, আমার তো মনে হচ্ছে চোকসি সাহেবের তুমি পেয়ারের লোক। আসলে কোন মতলবে আছো—ঝেড়ে কাশো তো ?

মতলব ফতলব কিছু নয়।—ওম সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল, আমি ওর একজন সহকারী মাত্র বলতে পার। এবার খোলসা করে বলতো, প্রেমকিশোরের উপর নজর দিয়েছ কেন ?

বেদপ্রকাশ অসহিষ্ণুভাবে বলল, সকালে তো বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি এর বেশি আমি কিছু জানি না। জানার দরকারটাই বা কি ? আমার টাকা নিয়ে দরকার। কে কোন উদ্দেশ্যে কি করাতে চাইছে জেনে লাভ ? কিন্তু ওস্তাদ, তুমি কিছু ফাঁস করে দেবার চেষ্টা করো না। বেকায়দায় পড়ে যাবে।

—আমি নিজের চরকায় তেল দিতেই ভালবাসি। তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তাটি কে জানতে পারি কি ?

—তুমি চিনবে না।

—তবু শুনি ?

ওম ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়েছে।

ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে বেদপ্রকাশ বলল, এখন বলতে বাধা আছে। প্রেমকিশোরকে একেবারে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলার পর বলব। আবার সাবধান করে দিচ্ছি ওস্তাদ, ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়।

ওম কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু চোকসি সাহেবের ড্রাইভারকে এদিকে আসতে দেখে, তাড়াতাড়ি ফিরে চলল দোকানের দিকে। ট্যাক্সির পিছনে স্কুটারটা দাঁড় করানো ছিল। ওমের সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটস্থ করে বেদপ্রকাশ স্কুটারে চেপে বসল।

পথের উপর দিয়ে যানবাহনের যে স্রোত বয়ে চলেছে তার মধ্য দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে পথ করে বেদপ্রকাশ যখন একটি সুদৃশ্য বাড়ির সামনে পৌঁছাল তখন মিনিট পনেরোর বেশি ঘড়ির কাঁটা এগোয়নি। বাড়ির সামনেকার একচিলতে বাগানে যত্নের অভাব রয়েছে এক নজরেই বুঝতে পারা যায়। গাড়ি বারান্দায় নতুন মডেলের ফিয়েট দাঁড় করানো ছিল, বেদপ্রকাশ ওখানে এসেই থামল।

ভেতর থেকে কথাবার্তা আর হাসির শব্দ ভেসে আসছে। একটু ইতস্ততঃ করে বেদপ্রকাশ পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। মোটামুটি সাজান ঘরে গৃহস্বামী রাকেশ চৌহান ছাড়া, যৌন আবেদনে ভরপুর একটি যুবতী ও একজন মধ্য-

বয়স্ক পুরুষ। তিনজনের দৃষ্টি একই সঙ্গে দরজার উপর পড়ল।

ব্যগ্রভাবে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল চৌহান।

—কি হল?

—পরিচয় হয়েছে। মনে তো হল সন্ধ্যার সময় আসবে।

—সুখবর!

চৌহান এবার যুবতীর দিকে ফিরল, আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা করো লিলি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা সেরে পাশের ঘর থেকে আসছি।

লিলি সেই জাতের মেয়ে যারা নিজের মক্কেলের জন্য সমস্ত কিছু করার জন্য প্রস্তুত। এখন অবশ্য মিষ্টি করে হাসল শুধু। পাশের ঘরে গিয়ে বিস্তারিতভাবে সমস্ত কিছু শোনার পর চৌহান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—তুমি কাজের লোক! টোপটা ভালই ফেলেছ।

—দেখুন শেষ পর্যন্ত আসে কি না।*

—আসবে। চোকসি সাহেব বলেছেন যখন, আসবেই। শেষ খেলাটা এবার তুমি সন্ধ্যাবেলা দেখিয়ে দাও!

ঘরের একপাশে ছোট সাইজের একটা স্টিলের আলমারি ছিল। চৌহান আলমারি খুলে, লকারের মধ্য থেকে খুঁজে পেতে একটা খুব ছোট মোড়ক বার করে বেদপ্রকাশের হাতে দিল।

—এর মধ্যে বাদামি রং-এর পাউডার আছে। সামান্য মিশিয়ে দেবে পানীয়ের সঙ্গে। হুইস্কি, রাম বা ওই জাতীয় কিছু বোধহয় খেতে চাইবে না। কোকোকলার অর্ডার দিও। ওতে মিশিয়ে দিলেও চলবে।

বেদপ্রকাশ আঁৎকে উঠল, বিষ নাকি? মরে যাবে না তো?

—আরে না না—। এক ধরনের অজ্ঞান হয়ে যাবার ওষুধ। মক্কেল অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে বেবাক হাওয়া হয়ে যাবে।

—প্রেমকিশোরকে অজ্ঞান করে রেখে আপনার লাভ কি? আপনি তো চাইছিলেন ওকে খারাপ পথে নামিয়ে আনতে?

—এখনও তাই চাইছি। জ্ঞান ফিরে আসার পর একটু ইয়ে ধরনের হয়ে পড়বে। তারপর মদ আর মেয়েমানুষে দারুণ রুচি হয়ে যাবে। বুঝছো না এ হল অতি আধুনিক ধরনের ওষুধ। জার্মানী থেকে আনিয়েছি।

কথা শেষ করেই চৌহান আবার স্টিল আলমারির দিকে ফিরে গেল। এক তাড়া নোট বার করে বলল, দু'হাজার আছে। এখন রাখ। কাজ শেষ করে রাত দশটায় দেখা করবে। বাকীটা দিয়ে দেব।

সামান্য দ্বিধা ছিল, নোটের তাড়া পেয়ে তাও কেটে গেল বেদপ্রকাশের। কয়েক সেকেণ্ড নোটগুলির উত্তাপ সে অনুভব করল। তারপর সযত্নে রাখল কোটের ভেতরের পকেটে।

—এবার তুমি যেতে পার। ভাল কথা, কাজটা সত্যি যদি ভালভাবে সম্পন্ন হয়, বাড়তি লাভের ব্যবস্থা করে দেব। পাশের ঘরের মেয়েটাকে দেখলে তো? ওর সঙ্গসুখ যাতে পাও তার ব্যবস্থাও হবে।

—উনি তো—

চৌহান বিচিত্র হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বলল, সম্মান দিয়ে বলার মত কিছু নয়। যারা চরে খায়—লিলি সেই জাতের মেয়ে। ঘুঁদে একটা দালাল হাতে থাকলেই হল। অমন মেয়ে কত পাওয়া যায়।

—সঙ্গের ওই লোকটা দালাল নাকি?

—ঠিক ধরেছ। তোমায় আর সময় নষ্ট করাব না। এবার বেরিয়ে পড়।

দু'জনেই পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সোনার চামচ মুখে দিয়েই রাকেশ চৌহান দুনিয়ায় এসেছিল। জনক রমেশ চৌহান কৃতি ব্যবসাদার হলেও স্বভাবে ছিল অত্যন্ত কৃপণ। অপরিণত বয়সে যখন দেহ রাখলেন, স্বাভাবিক কারণেই কিশোর পুত্র রাকেশের হাতে তখন প্রচুর বিত্ত এসে পড়ল। বুঝে চলতে পারলে, কিছু না করেও বাকী জীবনটা রাজার হালে সে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তা হল না। মাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের জীবনকে প্রগাঢ়ভাবে রঙীন করে তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলস্বরূপ ত্রিশের কোঠায় পা দেবার পর রাকেশ চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। নামেই ব্যবসা আছে, আর্থিক সঙ্গতি আর নেই। বাজারে দেনা বাড়ছে। ইদানিং ফিয়েটটা কেনার পর চাপ আরো বেড়েছে। অথচ ঠাট বজায় রাখতে গেলে এ সমস্ত না করলেও নয়।

বছর দেড়েক আগে হঠাৎ তার চোকসি সাহেবের কথা মনে পড়ল। রমেশ চৌহান বেঁচে থাকাকালীন তিনি ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা করতেন। দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল। আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে সে চোকসি হাউসে গিয়ে উপস্থিত হল। রিণার কথা জানতে পেরেই অনন্য সে ওখানে যাবার তাগিদ অনুভব করেছিল। তার রমণীরঞ্জন চেহারা আছে—আছে ভাল বংশ পরিচয়। কোনক্রমে যদি মহাধনী চোকসি সাহেবের জামাই হতে পারে তাহলে আর তাকে পায় কে?

দীর্ঘদিন পরে বন্ধুপুত্রকে দেখে খুশি হলেন দেবীদয়াল। স্মৃতিচারণ করলেন। ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। ব্যবসা কিছুটা মন্দা যাচ্ছে শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেও কার্পণ্য করলেন না। রিণার সঙ্গেও পরিচয় হল।

বেশ কিছুদিন ওখানে যাওয়া আসা করার পর কিন্তু রাকেশ বুঝতে পারল চোকসি সাহেব তাকে পাত্তা দেবেন না। তিনি আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তো বটেই, ওই সঙ্গে আছে আকাশ-ছোঁয়া অহমিকা। তাছাড়া আশঙ্কার বিষয় হল, রিণার জন্য তিনি কোটিপতি ঘরের ছেলে খুঁজছেন এবং তাঁর মত

মানুষের পক্ষে মনোমত জামাই সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না।

রাকেশ অবশ্য হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে অন্য পথ ধরেছে। ধীরে ধীরে এগুচ্ছে রিণার দিকে। এ আত্মবিশ্বাস আছে যে, একদিন ওই মেয়েটির মন জয় করে নিতে পারবে। অবশ্য ওই পরিকল্পনার উপরই শুধু সে নির্ভর করে নই। ঘোরাল এক পরিকল্পনাও খাড়া করেছে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রধান সহায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছে বেদপ্রকাশকে।

সন্ধ্যার সময় অ্যামব্যাসাডার হোটেলে যেতে পারল না প্রেমকিশোর। দুপুরেই তার মন খিঁচড়ে গিয়েছিল। দোকানের লাগোয়া ঘর দুটো সে হাতছাড়া করতে চায় না। বিশেষ করে' ওতে ওষুধের দোকান করার'কোন মানে হয় না। কিন্তু চোকসি সাহেবের মুখের উপর কিছু বলার সাহস তার কোথায়? তারপর বিকেলে আরেকটা ঘটনা ঘটল। প্রতিদিন নটার আগে দোকান থেকে বেরোয় না প্রেমকিশোর। আজ সাড়ে চারটের সময় তাকে যেতে হয়েছিল দিল্লী ক্লথ মিলের প্রোডাক্সন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

কাজ মিটিয়ে নিজের গাড়িতেই আবার ফিরে আসছিল দোকানে। ইচ্ছে করেই ফিরছিল একটু ঘুরপথে। রাজঘাটের পাশ দিয়ে যাবার সময় এমন একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ল যা অকল্পনীয় ছাড়া আর কিছু নয়। ঘাসের উপর বসে মুখোমুখি কথা বলছে রিণা আর ডাঃ রাহুল চৌধুরী।

তাদের ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, দু'জনের পরিচয় সম্প্রতি নয়। একটা অদ্ভুত অনুভূতি প্রেমকিশোরের মনের মধ্যে পাঁক খেতে আরম্ভ করল। আসল ব্যাপারটা তাহলে এই। বংশমর্যাদা যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবার সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছে রিণা।

ওদের গজ পঁচিশেক দূরে গাড়ি থামাল প্রেমকিশোর। গম্ভীর মেজাজে পা ফেলে এগুলো তারপর। রিণার চোখই আগে পড়ল তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে ভয় সাপটে ধরল তাকে। রাহুলও দেখতে পেয়েছে ততক্ষণে। তার নার্ভাস হয়ে যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। অবশ্য রিণা নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়েছে। একদিন না একদিন জানাজানি হতই। আজই না হয় হল।

কাছে আসার পর কোন ভূমিকা না করেই প্রেমকিশোর প্রশ্ন করল, এখানে কি করছো?

উত্তর দিতে গিয়ে রিণার গলা কেঁপে গেল, আমরা গল্প করছিলাম, তোমার তো বুঝতে পারার কথা?

—কাজটা ভাল করনি। তুমি কোন্ পরিবারের মেয়ে তোমার মনে রাখা উচিত ছিল। বাবা এ সমস্ত শুনলে অত্যন্ত রাগ করবেন।

প্রেমকিশোর এবার রাহুলের দিকে ফিরল।

—আপনাকে আমি ভাল লোক বলেই জানতাম। এখন দেখছি আপনার মত লোকেরাই বড়লোকের মেয়েদের ভুলিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়।

—দাদা—তীক্ষ্ণ গলায় রিণা বলল, ওঁকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই। আমি ছেলেমানুষ নই। মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছি। আমাকে কারুর পক্ষে ভুলানো এত সহজ নয়। তুমি জেনে রাখ, অনেক চিন্তা ভাবনা করার পরই আমি ওঁর দিকে এগিয়েছি।

—চমৎকার! পারিবারিক মর্যাদার কথাটা একবারও মনে পড়ল না?

—মর্যাদা! আমাদের পরিবার মর্যাদা দাবী করতে পারে না দাদা। আমাদের চেয়ে বড় জোচ্চর দিল্লীতে আর কেউ আছে? বাবা যে টাকার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, বলতে পার, তার মধ্যে এমন একটা টাকা আছে যা লোক ঠকিয়ে রোজগার করা নয়?

প্রেমকিশোর থতিয়ে গেল। রিণা রূঢ় বাস্তবকেই চোখের সামনে নতুন করে টেনে এনেছে। তার মর্ম-বেদনাও তো ওখানেই। যা হবার হয়ে গেছে, আর কেন দেবীদয়াল অসৎ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন? প্রায় এক মিনিট চুপ করে রইল প্রেমকিশোর। কি সমস্ত ভাবল।

—ডাঃ চৌধুরী—

—বলুন?

—রিণাকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ করা আমার ঠিক হয়নি। উত্তেজনা সময় সময় মানুষকে বিপাকে ফেলে দেয়। ও বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ দেখার স্বাধীনতা ওর নিশ্চয় আছে। তবে—

একটু থেমে প্রেমকিশোর বলল, আমি জানি আপনি বাবার গুড-বুকে গিয়ে পড়েছেন। তবু তিনি যদি এই ব্যাপারটা শোনেন, দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। ভয়ঙ্কর কিছু করাও অস্বাভাবিক নয়। একটা অনুরোধ রাখবেন?

—বলুন?

—আপনি সরে দাঁড়ান। কত টাকা পেলে অন্য শহরে গিয়ে আপনার পক্ষে বসবাস করা সম্ভব হবে জানালেই তার ব্যবস্থা আমি করব।

রাহুল আকাশ থেকে পড়ল।

—এ সমস্ত কি বলছেন? আপনাদের মত টাকা আর ক্ষমতা আমার নেই এটা খুব সত্যি—তবু আমার পক্ষে সরে দাঁড়ান সম্ভব নয়। যত বড়ই বিপদ আসুক, আমায় সহজভাবে নিতে হবে।

অভিমান-ক্ষুব্ধ গলায় রিণা বলল, দাদা, আমি তোমায় সৎ আর উচ্চ মনোভাবাপন্ন বলেই মনে করতাম। এই ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এখন দেখছি আমার এতদিনের ধারণার

দাম এক কানাকড়িও নয়।

প্রেমকিশোর আর কিছু বলল না। থমথমে মুখ নিয়ে সরে এল ওখান থেকে। দোকানে যাওয়া আর হল না। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে গা এলিয়ে দিল বিছানায়। চিন্তার কীট তার মনের মধ্যেটা কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। স্বজাতিতে আর উঁচু ঘরে রিণার বিয়ে হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ঝোড়ো হাওয়া যেন সেই নিশ্চিত সম্ভাবনাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সন্ধ্যা গাঢ় হবার পর দেবীদয়াল বাড়ি ফিরেছেন। বলি বলি করেও রিণা যে কাণ্ড বাধিয়েছে তার কথা প্রেমকিশোর বলতে পারেনি তাঁকে। বিবেক বাধা দিয়েছে। তার পরিশীলিত মন বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, দিনকাল অনেক বদলে গেছে। এখন আর কারুর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় ঘা দেওয়া মানবিকতা নয়।

এছাড়া রিণার সেই কথাটাও তো হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। বাবা তো যে-কোনও উপায়ে অবিরাম লোক ঠকিয়েই চলেছেন। রিণাকেও তিনি নিশ্চিতভাবে সেই রকম ঘরেই পাঠাবেন লোক ঠকিয়ে যারা বড়লোক। তার চেয়ে এই বোধহয় ভাল। সে নিজেই নিজের আগামী জীবন নির্দিষ্ট করে নিক।

খাবার টেবিলে দেবীদয়ালের সঙ্গে দেখা হল প্রেমকিশোরের।

কোলের উপর ন্যাপকিন মেলে ধরতে ধরতে তিনি বললেন, ট্রাইলেক্স নাকি—ওদের কাছে গিয়েছিলে নাকি?

—যেতে পারিনি।

—যাওয়া উচিত ছিল।

—একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম। গরজ ওদের। আবার নিশ্চয় আমার কাছে আসবে।

দেবীদয়াল আর কিছু বললেন না। খাওয়ার দিকে মন দিলেন।

ঘন ঘন নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছিলেন দেবীদয়াল। আর মাত্র দু'ঘণ্টা দেরি আছে ট্রেন ছাড়তে অথচ এখনও দেখা নেই ওম মেহতার। গতকালও দেখা করেনি। শেষ পর্যন্ত সে যাবে কি না এই সন্দেহই তাঁকে উতলা করে তুলেছে।

আরো মিনিট দশেক পরে অবশ্য পরিসমাপ্তি ঘটল সন্দেহের। ওম দেখা দিল। তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য একপ্রস্থ বকুনি দিলেন দেবীদয়াল। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, বিনোদ ছাড়া আর কেউ জানে না তুমি আমার

দ যাচ্ছ। যে-কোন কারণেই হোক আমি জানতে দিতে চাইও না।

উচিত নৈ স্টেশনে রওনা হয়ে যাও। এয়ার কণ্ডিশন কম্পার্টমেন্টের করিডরে

দাঁড়িয়ে থাকবে। স্টেশন থেকে তাহলে আর কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না।

ওম বিদায় নিল।

দেবীদয়াল কিছু খেয়ে নিলেন।

উনি স্টেশন পৌঁছালেন ট্রেন ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে। বিনোদকে ডেকে কিছু কাজের কথা বললেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালেন। সময় হয়ে আসছে। তাঁর মালপত্র গাড়িতে চাপাবার নির্দেশ দিলেন। ড্রইং রুম পেরিয়ে আসার মুখেই টেলিফোন বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত হয়েই রিসিভার তুলে নিলেন দেবীদয়াল, হ্যালো—

ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলা ভেসে এল, বেরে যাচ্ছেন তাহলে। আমার অনুরোধ রাখলেই কিন্তু ভাল করতেন।

—কে আপনি?

—আমার নাম জেনে আপনার লাভ নেই। এখনও সংযত না হলে বিপদে পড়বেন। একপাল পুলিশ যদি আপনার পেছনে লেগে যায় কেমন মজার ব্যাপার হয় বলুন তো?

—ননসেন্স।

—আপনার নোংরামি যে শুধু আমি অপছন্দ করি তাই নয়, আপনার মেয়ে আপনার ছেলে এরাও পছন্দ করে না।

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন দেবীদয়াল। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল। লোকটা কে? তিনি আর কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য ইম্পালা গতি নিল। সিগার ধরিয়ে নেবার পর একটা কথা মনের মধ্যে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। লোকটা যেই হোক, তাঁর অনেক গোপন কথা জানে। সত্যি যদি সে তাঁর পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয়?

চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। তবে এখন আর সময় নেই পেছিয়ে পড়ার। যা হবার হবে। এক সময় দেবীদয়ালের মনে হল, লোকটার এইভাবে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য হল বোধহয় টাকা আদায় করা। ব্লাক মেলিং। তিনি মনে মনে বললেন, তাই যদি হয়, সে কথা বললেই তো পারে।

ইম্পালা স্টেশন পৌঁছাল।

অজস্র আলোয় ঝলমল করা প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলেন দেবীদয়াল মোটেই লক্ষ্য করলেন না, রাকেশ চৌহান আর বেদপ্রকাশের মাত্র কয়েক হাত দূর দিয়ে তিনি চলে গেলেন। চৌহান অবশ্য দ্রুত নিজেকে পিছন ফিরিয়ে নিয়েছে। বেদপ্রকাশের ও সমস্ত করার কিছু দরকার ছিল না। কারণ সে দেবীদয়ালের প্রায় অপরিচিত।

—সংবাদ তাহলে মিথ্যে নয়। বুড়ো সত্যিই যাচ্ছে। আর দেরি করে লাভ নেই।

তুমি এগিয়ে যাও।

দ্রুত গলায় বেদপ্রকাশ বলল, এদিকে দেখুন—

ঝটিতে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চৌহান যা দেখল তাতে তার পক্ষে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। মাত্র হাত দশেক দূর দিয়ে রিণা চলে যাচ্ছে। সঙ্গে রাহুল। দু'জনেই কথা বলছে—হাসছে। ওরা ক্রমে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভেতরে চলে গেল।

—ব্যাপারটা কি ?

—আপনি একটু বে-কায়দায় পড়েছেন মনে হচ্ছে। দেখে তো মনে হল দু'জনের অনেক দিনের পরিচয়।

চৌহান বেশ চিন্তিতভাবে বলল, তাই কি ? সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যাক এ নিয়ে পরে যা হয় ভাবা যাবে। সময় হয়ে এসেছে তুমি এগোও।

আরেকটা ছোট্ট ব্যাপার ইতিমধ্যে আবার ঘটে গেছে। বিনোদ মেহরা দেবীদয়ালের মালপত্র গাড়ির কেরিয়ার থেকে বার করে কুলির মাথায় চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগুতে স্বাভাবিক কারণেই কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুদূর এগিয়ে রাকেশ চৌহানকে দেখতে পেল একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে—তারপরই হতবাক্ হয়ে গেল রিণা আর রাহুলকে পাশাপাশি এগিয়ে যেতে দেখে।

একটানা তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে ডাউন গুজরাট মেল দ্রুতবেগে গড়িয়ে চলেছে। এয়ার-কণ্ডিশন বগির দীর্ঘ করিডরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাপুর অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল। বাইরের তীব্র কনকনানি বিন্দুমাত্র অনুভূত হয় না এই কামরার মধ্যে। চমৎকার উষ্ণপরিবেশ।

সিগারেটে টান দিয়ে কয়েক পা পেছিয়ে নিজের সিটে কাপুর বসল। গত দু'মাস ধরে গুজরাট মেলের এই বগিতে তার ডিউটি পড়েছে। কাজ অবশ্য এমন কঠিন নয়। কয়েকজন উচ্চবিত্তের যাত্রীর সুখ-সুবিধা দেখা। নর্দান রেলের সে একজন নামকরা কণ্ডাক্টার।

খানকয়েক কোচ বার্থ আর খানকয়েক কুপে, এই মিলিয়েই এয়ার-কণ্ডিশন বগি। টানা করিডরের এক প্রান্তে কণ্ডাক্টারের বসবার জায়গা। নিজের জায়গায় বসেই কাপুর সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করল। আজ যাত্রীর সংখ্যা বেশি নয়। সব মিলিয়ে মাত্র সাতজন। এ রকম খালি অবস্থা মাঝে মাঝে থাকে। কাপুর রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিল, এক ঘণ্টা পিছনে ফেলে এসেছে নিউ দিল্লীকে।

এখন আর কোন কাজ নেই। যাত্রীরা নিজের নিজের কামরায় ঘুমিয়ে

পড়েছেন বা ঘুমোবার তোড়জোড় করছেন। এখন স্বচ্ছন্দে সে কিছুক্ষণ বই পড়তে পারে। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ সময় পাওয়া যাবে ঘুমোবার। স্টল থেকেই বইটা সংগ্রহ করে এনেছে। কাপুর আবার রহস্য-কাহিনী পড়তে ভীষণ ভালবাসে।

পাতা দশেক পড়েছে বোধহয়—ওর একাগ্রতায় বাধা পড়ল। খুট করে একটা শব্দ হল, তারপরই একটা কামরা থেকে একজন শিখ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। যাত্রীর নামের লিষ্ট কাপুরের দেখা ছিল। ইনি যে পৃথ্বীপাল সিং তা সে জানে। পৃথ্বীপাল কাপুরের দিকেই এগিয়ে এলেন। মধ্যবয়স্ক। ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে পুরো-দস্তুর স্যুট। কাপুর ভেবেছিল, বোধহয় বাথরুমে যাবার জন্য বেরিয়েছেন। ধারণা যে ঠিক নয় তখনই বুঝতে পারা গেল।

তিনি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কাঠি ফুরিয়ে গেছে। আপনার কাছে দেশলাই হবে? সিগারেট ধরাতে পাচ্ছি না।

কাপুর একটু অবাক হল। সে নিজে পাঞ্জাবের অধিবাসী। ভালবাবেই জানে ধর্মীয় বাধা থাকায় শিখরা সিগারেট খায় না। অন্ততঃ প্রকাশ্যে খেতে বড় একটা দেখা যায় না।

—আছে।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিল। যাত্রী একটা ইণ্ডিয়া কিং ধরালেন। তারপর দেশলাই ফেরত দিয়ে ফিরে চললেন। কয়েক পা এগুবার পর তাঁকে থামতে দেখা গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এলেন।

—এক কাপ কফি খাবেন নাকি?

—আমার আপত্তি নেই স্যার।

এ ধরনের অনুরোধে কাপুর অভ্যস্ত।

—ফ্লাস্কভর্তি কফি সঙ্গে করেই এনেছি। ঘুমোতে যাবার আগে এক কাপ মন্দ হবে না, কি বলেন?

—ভালই হবে স্যার।

পৃথ্বীপাল এগুলেন। অনেক সহৃদয় যাত্রী কণ্ডাক্টারের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। খাওয়ান-দাওয়ান, গল্প-গুজব করেন, সময় সময় মোটা টিপসও দেন। কাপুর পিছু পিছু তাঁর কামরায় ঢুকলো। কফি খেতে খেতে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হল দু'জনের মধ্যে। ওখান থেকে বেরিয়ে এল মিনিট কুড়িক পরে। কাপুর ভাবল এখন আর কিছুই করবার নেই। মন্থর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসল নিজের সিটে। কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আর বই পড়া নয়। পা ছড়িয়ে একটু হেলে বসল কাপুর। হাই তুলল তারপর।

ট্রেনের দুরন্ত গতি যথানিয়মে বজায় আছে।

কাপুরের ঘুম ভেঙে গেল।

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। আড়মোড়া ভেঙে রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাতেই তার চক্ষুস্থির, সাড়ে সাতটা। সত্যি এত বেলা হয়েছে, না তার ঘড়ি কয়েক ঘণ্টা ফাষ্ট হয়ে গেছে? উঠে দাঁড়িয়ে পুরু কাচে মোড়া জানলার সামনেকার পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখল, সারা আকাশ রদ্দুরে ছেয়ে রয়েছে।

অবাক কাণ্ড। বসে বসে আট ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। ট্রেনে এমন গাঢ় ঘুম তার আগে কখনও হয়নি। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলল। একজন যাত্রী বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলেন। মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল কাপুর। এতক্ষণে নিশ্চয় প্রত্যেক যাত্রীর প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়ে গেছে। তাকে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দেখে তাঁরা নিশ্চয় নিদারুণ বিরক্ত হয়েছেন।

মেল-এর গতি মন্থর হয়ে আসছে।

কাপুর তৎপর হল। টাইটা ঠিক করে নিয়ে, এগিয়ে গিয়ে একটা দরজায় টোকা মারল। যদিও এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, কণ্ডাক্টার যাত্রীদের ডেকে ডেকে জেনে নেবে তার ব্রেকফাষ্টের প্রয়োজন আছে কি না। প্রয়োজন থাকলে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

তবু ইচ্ছে করেই এই উপকারটুকু যাত্রীদের করে দেয় কাপুর। রেষ্টুরেন্ট কার থেকে সমস্ত কিছু আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। কয়েকবার টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। মাথা বাড়ালেন একজন গুজরাটি ভদ্রলোক। যাত্রী কম বলেই নাম মনে পড়ে গেল, রতিলাল পারেখ।

তিনি জানালেন তাঁর কিছুর দরকার নেই। পরের দরজা নক করতে গিয়েই খুলে গেল। কেউ নেই। কাপুরের মনে পড়ে গেল এখানে পৃথ্বীপাল সিং ছিলেন। তাঁর জয়পুর পর্যন্ত রিজার্ভেশন ছিল। ভোর পাঁচটা নাগাদ তিনি নেমে গেছেন। জিজ্ঞেস করতে করতেই কাপুর এগোল। কয়েকটা কুপে আর ফোর বার্থ খালি। সব শেষের কুপেতে আছেন দেবীদয়াল চোকসি আর তাঁর সঙ্গী। কাপুর শুনেছে ভদ্রলোক দিল্লীর একজন ধনী ব্যক্তি।

টোকা দিতেই বুঝল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ নেই।

একটু চাপ দিতেই পাল্লা সরে গেল।

একি! কাপুর টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট কুপে কম্পার্টমেন্ট। একজন স্থূলাঙ্গ বয়স্ক ব্যক্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। দেহে স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। পড়ে থাকা ব্যক্তি যে দেবীদয়াল চোকসি কাপুরের বুঝতে অসুবিধা হল না। সহযাত্রীটি বেবাক উধাও হয়ে গেছে।

—কি ভয়ানক—খুন—খুন—

তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে উঠল কাপুর। রতিলাল পারেখ বোধহয় বাথরুমে যাচ্ছিলেন। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে করতে আবার মুক্তকচ্ছ অবস্থায় নিজের কামরার দিকে ফিরে চললেন। কাপুরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। সে ভেবে পাচ্ছে না এখন কি করবে। পারেখের চিৎকারে বাকী যাত্রীরা করিডরে এসে পড়েছিলেন। তাঁরা প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পেরে মুষড়ে পড়লেন।

মেল ফুলেরার সুবিস্তীর্ণ প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁসে এসে থামল।

নিজের কর্তব্য সম্পর্কে এবার সচেতন হল কাপুর। ঝটিতে কুপের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। এয়ার কণ্ডিশন বগির চারজন যাত্রী ফ্যাকাশে মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যাত্রার মধ্যে এরকম ঝামেলা সত্যি আতঙ্কজনক।

—আপনারা নিজের নিজের জায়গায় চলে যান।—কাপুর বলল, এই কুপের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না। আমি স্টেশন মাস্টারকে খবর দিয়ে আসছি।

সে দৌড়ে কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে মহা বিচলিত ভাবে স্টেশন মাস্টার এসে উপস্থিত হলেন। তারপর এল রেল পুলিশ। কি ভাবে যেন এই মর্মান্তিক সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য কামরার যাত্রীরা দলে দলে এসে জড়ো হতে লাগল এয়ার কণ্ডিশন বগির সামনে। নানা ধরনের গুজবে ছেয়ে গেল চারিধার।

স্বাভাবিক কারণে মেল বহুক্ষণ আটকে পড়ল ওখানে। চোকসি সাহেবের সহযাত্রীর নাম পাওয়া গেল না চার্টে। কারণ পুরো কুপ তাঁর নামেই রিজার্ভ করা ছিল। কাপুর অবশ্য তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। রেল পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিন্ত হল, সেই সহযাত্রী চোকসিকে খুন করে নেমে গেছে কোন স্টেশনে। কণ্ডাক্টর জেগে থাকলে তাকে নামবার সময় দেখতে পেত। দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ট্রেন থেকে ওই কম্পার্টমেন্ট আলাদা করে নেওয়া হল। চারজন যাত্রীকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় জায়গা করে দেওয়া হল। অবশ্য তাঁদের ঠিকানা রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে ডাকা হবে। মেল একেই লেট রান করছিল। জয়পুরে দেড় ঘণ্টা আটক থাকার পর ছাড়ল। ততক্ষণে ওই অভিশপ্ত কম্পার্টমেন্টকে টেনে সাইডিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রেল পুলিশের সুখ্যাত অফিসার সুলতানিয়া এবার ভালভাবে কাজে নামলেন। অর্থাৎ কুপে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে তিনি হদিস করতে চান এমন কোন সূত্রের যাতে অন্ততঃ আঁচ পাওয়া যায়, চোকসির সহযাত্রী কোথায় নেমে গেছে। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে একই ভাবে

পড়ে আছেন চোকসি সাহেব। সুলতানিয়া তাঁর মৃতদেহ সোজা করে শুইয়ে দিলেন। পরনে ফ্ল্যানেলের ছাই রং-এর স্লিপিং স্যুট। বুকের ডান পাশে গভীর ক্ষত। মুখ অল্প হাঁ করে রয়েছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। মনে হয় মৃত্যু অতর্কিতেই এসেছে।

ছোরাটা পাওয়া গেল লোয়ার বার্থের তলা থেকে। হাত থেকে পড়ে গিয়ে বোধহয় তলায় চলে গেছে। সুলতানিয়া বুঝে উঠতে পারলেন না, হত্যাকারী যন্ত্র ফেলে রেখে পালাল কেন। রুমাল দিয়ে শুকনো রক্তলাগা ব্লেড চেপে ধরে তিনি ছোরাটা তুলে নিলেন। গঠন দেখে বুঝতে পারা যায় এই ধরনের অস্ত্র হিমাচল প্রদেশের লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে। পেতলের মুঠোয় চমৎকারভাবে লতাপাতা খোদাই করা রয়েছে লম্বায় নয় ইঞ্চি হবে।

নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় সূত্র। মুঠোর উপর থেকে হত্যাকারীর হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। একজন সহকারীর হাতে ছোরাটা দিয়ে আবার তিনি খোঁজাখুঁজির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে অনেক চেষ্টা করেও কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া গেল না। অবশ্য এটুকু জানা গেল হত্যাকারী টাকার লোভে নিজের হাত রক্তে রাঙ্গায়নি! কারণ চোকসি সাহেবের আঙুলে হীরের আংটি রয়েছে, সোনার ওমেগা ঘড়ি ও গলার ভারি সোনার চেনের হার খোয়া যায়নি। এছাড়া বালিশের তলা থেকে পাওয়া গেল একরাশ একশ টাকার নোট। গুনে দেখা গেল কুড়ি হাজার। ড্রাফ্ট না কাটিয়ে সঙ্গে করে এতগুলি কাঁচা টাকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হল, এসমস্তই কালো টাকা।

এরপর এক সমস্যা দেখা দিল। রেল কর্তৃপক্ষ এই জটিল তদন্ত নিজেদের হাতে রাখা বিবেচনার কাজ মনে করলেন না। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত গ্রহণ করবে না দিল্লীর হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথা জানানো হল দিল্লী পুলিশকে। ওখান থেকে বলা হল, তদন্ত ভার তারাই নেবেন। সময় নষ্ট না করে ওই এয়ার কণ্ডিশন বগি আর মৃতদেহ ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

প্রেমকিশোর অন্যমনস্কভাবে বসেছিল ডিভানের এক কোণে। তাকে বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। রিণা বসে আছে কায়ার প্রেমের ধার ঘেঁসে। তার ফোলা ফোলা চোখ বলে দিচ্ছে, কান্নাকে সঙ্গী করে রেখেছে সে। চৌহান তার কাছাকাছি আরেকটা কোচে বসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বিনোদ মেহরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে একধারে। রাজীব সেন কি করবেন স্থির করতে না পেরে প্রেমকিশোরের পাশে গিয়ে বসলেন। চোকসি সাহেবের হত্যাকাণ্ড এখন চারদিনের পুরানো ঘটনা।

স্থানীয় গোয়েন্দা-দপ্তরের প্রধান অশোক মিরাণী মাত্র কয়েক মিনিট হল এখান থেকে গেছেন। এই প্রথমবার নয়—এই নিয়ে বার পাঁচেক এখানে আসা হল তাঁর। সন্দেহভাজন সম্পর্কে কিছু তথ্য তিনি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। বিনোদ মেহরার কাছ থেকে জানা গেছে লোকটির নাম ওম মেহতা। সে চোকসি সাহেবের কোন কাজে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। বম্বে যাচ্ছিল তাঁর সঙ্গে।

পুলিশ রিপোর্ট ঘেঁটে জানা গেছে ওম মেহতা হচ্ছে একজন ক্রিমিনাল। ভূপাল, আম্বালা, দিল্লী ও আশেপাশে অনেক অপকর্ম করেছে। ধরা পড়ে গিয়ে জেল হয়েছিল তার। তবে ইদানিং সে শান্তশিষ্টভাবেই ছিল। তার পুরানো দিল্লীর আস্তানার হদিস পুলিশ সহজেই করতে পেরেছিল। ছোট একটা ঘরে নেয়ারের খাটে শুয়ে সে রাত কাটাত। আর কোন আসবাব সে ঘরে ছিল না। খোঁজাখুঁজি করে পুলিশ সেখান থেকে এমন কিছু পায়নি যা কাজে লাগে। এই বিরাট দেশের জনারণ্যে যদি কেউ গা ঢাকা দিতে চায় তবে তাকে খুঁজে বার করা সত্যি কঠিন।

মিরাণীর কাছে প্রধান সমস্যার বিষয় হল, খুনের মোটিভ। ওম মেহতা নিঃসন্দেহে অভাবী আর লোভী লোক। অথচ খুন করার পর সে কিছু না নিয়েই সরে পড়েছে। কেন? ওই ধরনের মানুষের পক্ষে এরকম ব্যবহার একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। ওই ছোরাটা কিভাবে ওর হাতে গিয়েছিল এও এক সমস্যা। কারণ প্রেমকিশোর আর রিণা ছোরা দেখে স্বীকার করেছে ওটা তাদের বাবার। কুলু উপত্যকায় বেড়াতে গিয়ে তিনি অস্ত্রটা কিনে নিয়ে এসেছিলেন। তারা অবশ্য বলতে পারেনি ছোরা সঙ্গে নিয়ে চোকসি সাহেব কেন বম্বে যাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য ওর থেকে কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। সমস্ত লেপা-পোঁছা। হত্যাকারী দস্তানা পরে ছোরা চালিয়েছিল বা পরে রেল পুলিশের দয়ায় সমস্ত একাকার হয়ে গেছে।

নড়ে চড়ে বসে রাজীব সেন বললেন, ব্যাপারটায় শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। সকলে অপেক্ষা করছে পুলিশের তৎপরতা দেখার জন্য। কি মনে হয়, হত্যাকারীকে ওরা ধরতে পারবে?

প্রশ্নটা করা হয়েছিল চৌহানকে লক্ষ্য করে। সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ওদের উপর আপনি কি ভরসা রাখেন? হত্যাকারীকে ধরতে গেলে অনেক ছোটাছুটি করতে হবে। এত পরিশ্রম আজকালকার পুলিশ করে না।

কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি মিঃ মিরাণী খুব কাজের লোক।

—কাজের নমুনা তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হত্যাকারীর পিছনে ধাওয়া না করে ভিক্টিমের বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে খোস গল্প করে যাচ্ছেন!

এই সময় অকল্পনীয় এক ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল রাহুল ড্রইংরুমে প্রবেশ

করছে। তাকে বিলক্ষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে। চৌহানের ভ্রূ-কুঁচকে উঠল। প্রবল ঈর্ষা সাপটে ধরল তাকে। রাজীব সেন একটু অবাক হলেন। মুখ চেনা-চিনি ছিল। রাহুলের এ বাড়িতে যাতায়াত আছে তিনি আশা করেন নি। রিণা আর প্রেমকিশোর একই সঙ্গে মুখ তুলে তাকাল।

কুণ্ঠিতভাবে রাহুল বলল, এখানে ছিলাম না। ফিরে এসেই শুনলাম—সত্যি খুবই মর্মান্তিক—

ক্লান্ত গলায় প্রেমকিশোর বলল, বসুন ডাঃ চৌধুরী।

—আপনার সঙ্গে এদের পরিচয় আছে আগে জানতাম না।

রাজীব সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রাহুল বলল, সম্প্রতি চোকসি সাহেব আমাকে তাঁর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

—তাই নাকি! আশ্চর্য—

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে মিঃ সেন?

—নেই বলছেন?—রাজীব সেন আবার সেই পুরানো কথার খেই ধরলেন —একদিক থেকে অবশ্য মিঃ চৌহান ঠিকই বলেছেন। পুলিশের আঠার মাসে বছর। আমার একটা প্রস্তাব আছে প্রেমবাবু।

—বলুন?

—পুলিশ যা করছে করুক। আপনি বরং প্রাইভেটলি চেষ্টা করুন।

বিস্মিত গলায় প্রেমকিশোর বলল, প্রাইভেটলি—

—চোকসি সাহেব আর ফিরে আসবেন না এটা ঠিক। তবে তাঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা বোধহয় আপনার কর্তব্য। প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে যদি—

রিণা উঠে পড়ল।

রাহুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদুগলায় বলল, আমার সঙ্গে এস।

রাহুল ওকে অনুসরণ করল।

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তীক্ষ্ণ গলায় চৌহান প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা কি? ডাক্তার ছোকরাকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?

শান্ত গলায় প্রেমকিশোর বলল, আপনার এই উষ্মার কোন কারণ দেখি না রাকেশবাবু। এটা রিণার ব্যাপার। আমি তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দিতে পারি না।

—এখন আপনি তার গার্জেন।

—না। রিণার ভাল মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে। এখন নিজেই সে নিজের গার্জেন।

ওদিকে—

নিজের পড়ার ঘরে রাহুলকে এনে বসাল রিণা। অনেক কথাবার্তা হল

দু'জনের মধ্যে। চোকসি সাহেবের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা শুনেছিল পুলিশের মুখ থেকে সবই বলল সে। বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে ভরে এল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় রাহুল জানে না। তবুও সে সহানুভূতিসূচক দু'চার কথা বলল।

মিঃ সেনের একটা কথা আমার মনে খুব ধরেছে। রিণা বলল, বাবা আর ফিরে আসবেন না। খুব সত্যি কথা। তবে তাঁর হত্যাকারীকে যে-কোন মূল্যে ধরতেই হবে।

—পুলিশ তো চেষ্টা করছে।

—পুলিশের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে থাকার কোন মানে হয় না। কি করা যায় বলতো?

চিন্তিতভাবে রাহুল বলল, এ হল খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত। ওম মেহতা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে তার হদিস পাওয়া সত্যি কঠিন। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। আমরা এই ব্যাপারটা একজনের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। মনে হয় ইনভেষ্টিগেশনের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আমাদের দেশে আর নেই।

—তিনি কে?

—বাসব ব্যানার্জী। কলকাতায় থাকেন। অসংখ্য জটিল তদন্তে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। দিল্লীতে তিনি একবার এসেছিলেন কেস নিয়ে। তখন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

—তিনি কি কাজটা হাতে নেবেন?

—বলতে পারছি না। তাকে রাজি করবার চেষ্টা করতে পারি। আগে অবশ্য জেনে নাও তোমার দাদার মত আছে কিনা।

—দাদা নিশ্চয় রাজি হবে। তুমিই আজ ট্রাংকে তার সঙ্গে কথা বলো। খরচের জন্য চিন্তা নেই।

—বেশ।

ঠিক এই সময় প্রেমকিশোরকে এইদিকেই আসতে দেখা গেল।

তদন্ত

বেলা তখন দশটা।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস স্টেশনে প্রবেশ করল। কলকাতা ও দিল্লীর মধ্যেকার বিশাল দূরত্ব মাত্র বোল ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে অতিক্রম করে ভারতের এই এক নম্বর যন্ত্রযান গতিরুদ্ধ করে হাঁপাতে লাগল। জানলার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল বাসব।

এই সময় দিল্লীতে আসবার ইচ্ছে তার ছিল না। কাজকর্মে যে জড়িয়ে ছিল তা নয়। বরং উল্টোটাই বলা চলে। মাস তিনেক ধরে হাতে তার কোন তদন্ত নেই। স্বভাবতঃই সে একটু আত্মকেন্দ্রিক। একদল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈহৈ করা তার অভ্যাস নেই। শুয়ে বসে আর বই পড়ে সময় কাটাতে কাটাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই সময় রাহুল এসে উপস্থিত। ট্রাঙ্কে বাসবকে রাজি করানো যাবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় নিজেই চলে এল।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মশাই আমাকে আবার ওখানে নিয়ে যাবেন? আমি আবার ভীষণ শীতকাতুরে লোক।

—ও সমস্ত আমি শুনবো না মিঃ ব্যানার্জী। রাহুল বলল, আপনাকে সব কথাই বললাম। আমি নিজের স্বার্থেই আপনাকে অনুরোধ করছি। রিণার মনে শান্তি ফিরিয়ে আনা এখন বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—আপনাকে খুশি করবার সমস্ত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। আগাম এই দু'-হাজার টাকা রাখুন।

একতাড়া নোট সেণ্টার টপের উপর রাখল রাহুল।

নোটের তাড়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আপনারা আমায় মোটা ফি দেবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু ওই শীত—

—ভীষণ বাজে বকছো তুমি। শৈবাল এতক্ষণ পরে কথা বলল, সেবার ডিসেম্বর মাসে আমরা সিমলায় যায়নি? দিল্লীর চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা সিমলায় পড়ে।

—তা বটে। তুমি আমার যুক্তির উপর এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে। অবশ্য যেতে যে না পারি তা নয়। তবে এই কেস একটু অন্য ধরনের হওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেছি।

—কি রকম?

—কয়েকজন সন্দেহ-ভাজনের মধ্যে থেকে খুনীকে চিহ্নিত করা এক ব্যাপার, আর কোটি কোটি লোকের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বার করা আরেক ব্যাপার। হয়তো ওম মেহতা কেরালায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কিম্বা এই কলকাতাতে এসে জনসমুদ্রে মিশে গেছে। ব্যাপারটা কি রকম ঝামেলায় দাঁড়িয়ে গেছে নিশ্চয় বুঝতে পারছ তুমি।

রাহুল এবার বলল, হত্যাকারী যদি ধরা নাও পড়ে তাতে কিছু যাবে আসবে না। আপনি ওখানে গেলে রিণা সান্ত্বনা পাবে এটাই হল বড় কথা।

—বেশ। আপনার যখন এত ইচ্ছে, আমি যাব। বাসব বলল, ডাক্তার আমাকে তাতিয়ে দিয়ে তুমি যে পিছু হটবে তা কিন্তু হবে না। সঙ্গে যেতে হবে তোমাকেও।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, আগামী সপ্তাহে ওখানে যেতেই হত। মেডিক্যাল কনফারেন্স আছে। কয়েকদিন না হয় আগেই ওখানে যাব।

……ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে পড়ার পর প্ল্যাটফর্মের চাঞ্চল্য অনেক বেড়ে গেছে। ব্যস্ততার কিছু ছিল না। একটু সময় নিয়েই বাসব আর শৈবালকে সঙ্গে করে ট্রেন থেকে নামল রাহুল। স্টেশনের বাইরে এক বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রিণা গাড়ি নিয়ে এসেছে।

বিষণ্ণ হেসে অভ্যর্থনা জানাল অতিথি দু'জনকে। পরিচয়ের পালাও শেষ হল এই সঙ্গে।

ইস্পালায় বসে গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা হল না। বাসব ও শৈবালের থাকার ব্যবস্থা চোকসি হাউসেই হয়েছে। ওরা একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করে নিল। বেলা চারটের সময় ওরা রওয়ানা হল পুলিশ সদরের উদ্দেশে। ভাগ্যক্রমে মিঃ মিরাণী তখন অফিসেই ছিলেন। সজ্জন হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কুশল বিনিময়ের পর জানা গেল, বেসরকারীভাবে তদন্ত করার অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

বাসব বলল, কি রকম বুঝছেন ?

—জোর খোঁজাখুঁজি চলছে। মিরাণী বললেন, তবে ওম মেহ্‌তাকে খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত হবে।

মোটিভ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন ?

—গোলমাল ওখানেই। খুন করার পর মেহ্‌তা মোটা মাল নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারতো। দেখেশুনে মনে হয়েছে সে কিছুই নেয়নি। অথচ তার অবস্থা ভাল ছিল না। এতবড় লোভ সামলাল কিভাবে তাই ভাবছি।

বাসব পাইপ ধরাল।

—ব্যাপারটা সত্যি ভেবে দেখার মত। হত্যাকারী কেন লোভী হয়ে উঠল না আমাদের তা খতিয়ে দেখতেই হবে। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট একবার দেখতে চাই।

মিরাণী রিপোর্ট এগিয়ে ধরলেন। জটিল ব্যাপার কিছু নয়। চওড়া ব্লেডের ধারাল অস্ত্র দিয়ে বুকের ডান পাশে আঘাত করা হয়েছে। মৃত্যু এসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। উনি রাত্রে যা খেয়েছিলেন তা মোটেই হজম হয়নি। সুতরাং মনে হয় তাঁর মৃত্যু হয়েছে রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

কাজে লাগে এমন কিছু আর পাওয়া গেল না। বাসব রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে পাইপ ধরাল। ভ্রূ-কুঁচকে কয়েক মিনিট ভাববার পর বলল, সেই এয়ার কণ্ডিশন কম্পার্টমেণ্টটা আমি একবার দেখতে চাই।

—বেশ তো। এখুনি ব্যবস্থা করছি।

—সেদিন যে কণ্ডাক্টার ছিল তার সঙ্গে দু'চার কথা বলে নিলে ভাল হত।

—দেখছি তাকে পাওয়া যায় কিনা।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে সেই সাইডিং-এ পৌঁছাল যেখানে সেই অভিশপ্ত কামরাটা নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়েছিল। মিত্রাণী আসতে পারেন নি, তাঁর এক পার্শ্বচর—মাথুরকে পাঠিয়েছেন সঙ্গে। কামরার সিল ভাঙার পর সকলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। জানলাগুলো খুলে দেওয়া হল। অর্থাৎ সরিয়ে দেওয়া হল পর্দা, যাতে কিছু আলো আসে।

চোকসি সাহেবের কুপেটা বাসব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া রক্ত এখনও মেঝের এখানে ওখানে লেগে রয়েছে। বলা বাহুল্য এমন কিছু চোখে পড়ল না যাতে কাজের পক্ষে সুরাহা হয়।

—কুপেটা ডাষ্ট করানো হয়েছে?

—হ্যাঁ। মাথুর বলল, চার রকম হাতের ছাপ পাওয়া গেছে এখান থেকে। তাইতো ওম মেহতাকে আমরা এত তাড়াতাড়ি চিনে ফেললাম। ওর ছাপ আমাদের রেকর্ডে আগে থেকে ছিল।

—চারজন বললেন না! মেহতা ছাড়া চোকসি আর কণ্ডাক্টার—চতুর্থ ছাপটা কার বুঝতে পেরেছেন আপনারা?

—সম্ভব হয়নি। আর তার দরকারটাই বা কি? কোন পরিচিত যাত্রী হয়তো চোকসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

—হতে পারে। চলুন যাওয়া যাক। ভাল কথা, নদার্ন রেলওয়ের একটা টাইম টেবিল আমায় দিতে পারেন?

স্টেশনে চলুন। ওখানে পাওয়া যাবে।

সকলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল বেশ বুঝতে পারছে, মাথুর বাসব সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব নিয়ে চলেছে। সে বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না এই পণ্ডশ্রমের অর্থ কি। স্টেশনে পৌঁছাবার পর স্টল থেকে একটা টাইম টেবিল সংগ্রহ করল মাথুর।

—আপনারা প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে বসুন। আমি কণ্ডাক্টারকে ডেকে নিয়ে আসছি।

সে চলে গেল। ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসল দু'জনে। বাসবের চোখ টাইম টেবিলের বিভিন্ন পাতায় আনাগোনা করতে লাগল। ওর মনের গতিবিধি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে না পারায় শৈবাল অস্বস্তি বোধ করছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এল মাথুর। তার সঙ্গে সেই কণ্ডাক্টার।

পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর বাসব বলল, ভাল যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তো ভাবছিলাম—

—অফ ডিউটির সময় আমি বড় একটা স্টেশনে আসি না। কাপুর মৃদু

গলায় বলল, মাইনে নিতে এসেছিলাম। বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

—তেমন কিছু নয়। গোটা কয়েক কথা জানতে চাই। সেদিন ট্রেন ছাড়ার পর থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত যা ঘটেছে অনুগ্রহ করে বলুন ?

—উল্লেখযোগ্য তো কিছু ঘটেনি।

বাসব পাইপ ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনি আমার প্রশ্ন ধরতে পারেন নি। বেশ। আমি একটু সহজ করে বলছি। আপনার ওই ক'ঘণ্টার অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে বলুন। কোন্ কোন্ যাত্রী কথা বলেছিলেন, কখন ঘুমতে গেলেন, ঘুম ভাঙ্গার পর চোকসির কূপেতে গেলেনই বা কেন—এই সমস্ত বিশদ ভাবে জানতে চাইছি আর কি ?

বিরক্তি দমন করে মাথুর বলল, অফিসে চাইলেই ওঁর এজাহারের কপিটা আপনাকে দেখানো যেত। এখানে মিথ্যে সময় নষ্ট করে কি লাভ ?

বাসব ভারি গলায় বলল, আমার কাজ করার পদ্ধতি একটু অন্য ধরনের। ব্যস্ততা থাকলে আপনি যেতে পারেন। আমি ওর মুখ থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি শুনে তবে যাব।

মাথুর অবশ্য গেল না। ভ্রু-কুঁচকে বসে রইল।

একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে কাপুর আরম্ভ করল, আমার উপরওয়ালা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার মিনিট পাঁচেক আগে আমি কামরায় প্রবেশ করি। করিডরের মুখেই চোকসি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি রিজার্ভেশন স্লিপ সমেত দুটো টিকিট বাড়িয়ে ধরে জানতে চান তাঁর কূপে কোনটা. আমি এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট কূপের দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে যেতে সাহায্য করি। সে সময় কিন্তু কূপের মধ্যে একজন লোক বসেছিল। বুঝতে পারি ওই লোকটা চোকসি সাহেবের সহযাত্রী।

—ওদের কোন কথাবার্তা কানে এসেছিল ?

—কূপের মধ্যে পা দিয়েই চোকসি লোকটিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কারুর চোখে পড়ে যাওনি তো ? সে উত্তর দিয়েছিল, কেউ দেখেনি।

—তারপর ?

—ওঁকে পৌঁছাতে এসেছিল একজন। মনে হয় সেক্রেটারি বা ওই জাতীয় কেউ হবে। তাকে তিনি বলেন, সময় হয়ে এসেছে। এবার নেমে পড়। বেদপ্রকাশ লোকটা কে ভাল করে খোঁজখবর নেবে। এই সময় আমি সরে এসেছিলাম। চোকসি সাহেবকে আর জীবিত অবস্থায় দেখিনি !

—বাকি রাতটুকুর কথা এবার বলুন।

নিজের সিটে গিয়ে বসে বই-এ একাগ্র হওয়ার চেষ্টা দেখা থেকে আরম্ভ করে, পৃথ্বীপাল সিং-এর আগমন, কফির আমন্ত্রণ, কফি খেয়ে এসে ঘুমিয়ে

পড়া, ঘুম এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে বেলা সাতটার আগে ভাঙে না, মৃতদেহ আবিষ্কার ইত্যাদি একে একে সমস্ত কিছু বলে গেল কাপুর।

বাসব অন্যমনস্কভাবে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে রইল ভেন্টিলেটারের দিকে, তারপর বলল, অনেক সময় জেগে থাকার জন্যই লোকে রাতে কফি বা চা খায় তাই নয় কি?

—আমিও তাই জানতাম। কিন্তু সেদিন রাজ্যের ঘুম কিভাবে যে চোখে নেমে এল ভগবান জানেন।

—আপনি যখন মৃতদেহ আবিষ্কার করেন তখন অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে পৃথ্বী-পালও নিশ্চয় কামরায় উপস্থিত ছিলেন?

—না। তাঁর জয়পুর পর্যন্ত টিকিট ছিল। তিনি আগেই নেমে গিয়েছিলেন।

—ধন্যবাদ মিঃ কাপুর। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ভাল কথা, রিজার্ভেশন কাউন্টার এখন খোলা পাওয়া যাবে কি?

—যাবে। ছ'টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বাসব মাথুরের দিকে ফিরল।

—মিঃ মিরাণী আমাকে সাহায্য করবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয় একথা আপনার মনে আছে? আমরা এখন স্টেশন সুপারেন্টেণ্ডেন্টের কাছে যাব। আপনি পুলিশি-মেজাজ বজায় রাখবেন, নইলে তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ আদায় করা যাবে না।

স্টেশনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রূপচাঁদ ভার্গব বয়স্ক, আদুরে আদুরে চেহারার ব্যক্তি। চোকসি সাহেবের খুনের ব্যাপারে ওরা এসেছে শুনে ব্যস্তভাবে সকলকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। কোন রকম পুলিশি হম্বিতম্বির প্রয়োজন পড়বে বলে শৈবালের মনে হল না।

মাথুর বলল, আপনার কাছ থেকে গোটা কয়েক কথা জেনে নিতে এলাম। নিশ্চয় উত্তরগুলো সঠিক দেবেন।

ভার্গব বিপন্নভাবে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমি বিশেষ খুশি হব। কিন্তু ও-সম্পর্কে আমার তো কিছু জানা নেই।

—আপনার ব্যক্তিগত কোন উত্তরের অপেক্ষায় আমরা নেই মিঃ ভার্গব।

—বাসব বলল, কিছু রেকর্ডস আমরা দেখতে চাই। সেই ব্যাপারেই আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন। রিজার্ভেশন করার আগে একটা ফর্ম পূরণ করতে হয় যাত্রীদের। তেইশ তারিখে অর্থাৎ চোকসি সাহেবের একজন সহযাত্রী ছিলেন পৃথ্বীপাল সিং। রিজার্ভেশন করার আগে তিনি যে ফর্ম পূরণ করেছিলেন সেটা একবার দেখতে চাই। ওগুলো বোধহয় নষ্ট করা হয় না?

—রেলের কিছুই নষ্ট করা হয় না। তাইতো কাগজপত্র রাখার জায়গা

ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। আমি দেখছি।

ভার্গব ফোন তুলে নিচু গলায় কাকে কি সমস্ত বললেন।

তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে তাকালেন বাসবের দিকে, ফর্ম আসছে।

মিনিট কয়েক খাপছাড়াভাবে কথাবার্তা হবার পর একজন ঘরে এল। তার হাতে দোমড়ান একটা রিজার্ভেশন ফর্ম। বাসব ফর্মটা হাতে নিয়ে সাগ্রহে দেখতে লাগল। তেইশ তারিখ বেলা একটার সময় এটা দাখিল করা হয়েছিল। দিল্লী থেকে জয়পুর। নিয়ম মত ঠিকানাও লেখা আছে নির্দিষ্ট কলমে। হাতের লেখা বেশ গোটা গোটা এবং সুশ্রী। বাসব চিন্তিতভাবে পাইপ ধরাল।

—সেদিন দুপুরবেলা রিজার্ভেশন কাউন্টারে যিনি ছিলেন তাঁকে পাওয়া যাবে কি?

ফর্ম নিয়ে যে এসেছিল তার দিকে তাকিয়ে ভার্গব প্রশ্ন করলেন, সেদিন ওই সময় কে ছিল ডিউটিতে দেখতো?

লোকটি বলল, মুলচান্দ ছিল স্যার।

—ও আছে নাকি এখন? আচ্ছা, আমিই দেখছি—

তিনি আবার রিসিভার তুলে নিলেন। কার সঙ্গে কথা বলে নেবার পর রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, আপনাদের ভাগ্য ভাল। মুলচান্দ কাউন্টারে আছে। ওকে এখানে আসতে বলে দিলাম।

চা এসে পড়ল।

পেয়ালা শেষ করার মুখেই মুলচান্দ দেখা দিল। চটপটে ধরনের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ তরুণ। ভার্গব তাকে বুঝিয়ে দিলেন কেন তাকে ডাকা হয়েছে। সে যেন খুব ভেবে-চিন্তে উত্তর দেয়। মুলচান্দ সচকিত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করল না।

বাসব বলল, সেদিন দুপুরে কি আপনার খুব কাজের চাপ ছিল?

—এমনিতেই তো এয়ার কণ্ডিশন কাউন্টারে কাজের চাপ একটু কম। সেদিন আরো কম ছিল।

—তাহলে তো আপনি কাউন্টারে যারা এসেছিল তাদের ভালভাবে দেখে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেখুন তো এই ফর্মটা—এই ভদ্রলোককে মনে আছে আপনার?

মুলচান্দ ফর্মটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, এই ভদ্রলোককে আমার ভাল-ভাবেই মনে আছে। কারণ ইনি প্রথমে কাউন্টারে এসে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন।

—কি নিয়ে কথা হয়েছিল আপনাদের?

—এসেই বললেন বম্বে যেতে চান। কোন গাড়িতে জায়গা পাওয়া যাবে? আমি বললাম, সব গাড়িতেই জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। একথা শুনে বললেন,

দেখুন তো অনুগ্রহ করে, দেবীদয়াল চোকসি কোন্ ট্রেনে বার্থ বুক করেছেন। আমি চার্ট দেখে ট্রেনের নাম করতেই উনি ওতেই যাবেন বলে জানালেন। তারপর ফর্ম চাইলেন।

—উনি তো বম্বে পর্যন্ত টিকিট করেন নি।

না। বম্বে যাব বলেও জয়পুর পর্যন্ত টিকিট কাটলেন কেন জানি না।

—ভদ্রলোকের বয়স কি রকম?

—বছর ত্রিশেক হবে।

—দেখতে কেমন?

—ভালই। বেশ ফিটফাট। নাম শুনলে শিখ মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হল, ভদ্রলোক পাঞ্জাবী হিন্দু।

—দাড়ি বা পাগড়ী ছিল না?

—না।

—আপনাকে আর কষ্ট দেব না। যথেষ্ট উপকার করলেন। বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভার্গবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। ওই ফর্মটা আলাদা করে রেখে দিন। পরে দরকার হতে পারে। চলি এখন। এস ডাক্তার—

বাসবের পিছু পিছু স্টেশনের বাইরে এসে শৈবাল প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি বলতো?

—কোন্ ব্যাপার?

—তুমি কোথাকার কে পৃথ্বীপাল সিং তার জন্য ভীষণ মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছ?

—দাঁড়াও আগে একটা ট্যাক্সি ধরা যাক। মাথুরের ভরসায় থাকতে চাই না। বলছি সব।

কলকাতায় ট্যাক্সির আশায় অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। এখানে অবশ্য সে রকম অসুবিধা নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ভেতরে বসতে বসতে বাসব নিজেদের ঠিকানা দিল ড্রাইভারকে।

গাড়ি গতি নেবার পর সে বলল, পৃথ্বীপাল সম্পর্কে মাথা না ঘামাবার তো কোন কারণ নেই ডাক্তার। কাপুরের মুখে আমরা শুনেছি লোকটা শিখ আর বয়স্ক। অথচ রিজার্ভেশন ক্লার্ক বলল, সে তরুণ এবং শিখ নয়।

—এমনও তো হতে পারে ওই তরুণ পৃথ্বীপাল সিং নয়। তার হয়ে আর কেউ রিজার্ভেশন করতে এসেছিল।

—হতে যে না পারে তা নয়। তারপর দেখ, তার দেওয়া কফি খাওয়ার পরই কণ্ডাক্টারের চোখে গভীর ঘুম নামে। ঘুম ভাঙে অনেক বেলাতে।

আমার সন্দেহ হচ্ছে কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। তাছাড়া কণ্ডাক্টারকে না জানিয়েই বা সে নেমে যাবে কেন? দরজা খোলা থেকে যাবে, চোর ছ্যাঁচড় ঢুকতে পারে—এমন আহাম্মকের মত কাজ কোন দায়িত্বশীল যাত্রী করতে পারে না।

—তুমি বলতে চাইছ, ওম মেহতাকে সাহায্য করার জন্য পৃথ্বীপাল ওই কামরায় ছিল।

—জোর দিয়ে এখনই আমি কিছু বলতে চাই না।

ওদিকে—

চোকসি হাউসের ড্রইংরুমে, কাম্বার প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমকিশোর তখন বলছে, কাগজপত্র ঘেঁটে আমি দেখেছি বাবার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা আপনি নিয়েছিলেন। ও টাকা আমার পক্ষে আর ফেলে রাখা সম্ভব হবে না সেনবাবু।

রাজীব সেন মুখ কালো করে বললেন, আপনার বাবা কিন্তু আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতেন না।

—বলতেন না বলেই লোকে সুযোগ নিত। এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এর মধ্যেই টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন।

—এত অল্প সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দেওয়া সম্ভব হবে না। আপনি বরং আমাকে দিয়ে কিছু কাজকর্ম করিয়ে নিন।

এই সময় বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কিছু কথা ওদের কানে গিয়েছিল। ওখানে তখন রাজীব সেন আর প্রেমকিশোর ছাড়া বিনোদ মেহরা আর রিণা ছিল।

রিণা বলল, সেই কখন বেরিয়েছেন! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, ভুলে যাবেন না, কাজ নিয়ে এখানে এসেছি। টেলিফোনটা আপনাদের কোথায়?

• মেহরা দ্রুত গলায় বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

বাসব মেহরার পিছু পিছু অফিস রুমে গিয়ে ঢুকল।

—মিরাণীর সঙ্গে কানেকশান করুন তো।

বার কয়েক চেষ্টা করার পর মিরাণীকে পাওয়া গেল, হ্যালো, আমি ব্যানার্জী বলছি—সেদিন পৃথ্বীলাল সিং নামে একজন যাত্রী ওই কম্পার্টমেন্টে ছিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাঁর কুপেটা ডাষ্ট করবার ব্যবস্থা করুন—ঠিক তাই—হ্যালো—যে কটা ফিঙ্গার প্রিণ্ট পান তার কপি আমায় দেবেন দয়া করে—রেলওয়ে রিজার্ভেশন থেকে একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে—মাথুরের কাছ থেকে জেনে নেবেন—খোঁজ করে দেখুন তো ঠিকানাটা জেনুইন কিনা—এখন ছাড়ছি—কাল কোন এক সময় দেখা করার ইচ্ছে রইল—

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল। এতক্ষণ একমনে একতরফা কথা শুনে যাচ্ছিল বিনোদ মেহরা। তার মুখের ভাব ঘন ঘন পাল্টাচ্ছিল। এবার বাসবের সঙ্গে চোখাচোখি হতে থতমত খেল।

আপনি তো চোকসি সাহেবের সেক্রেটারি ছিলেন। বাসব বলল, এখন কি করবেন স্থির করেছেন ?

—প্রেমবাবু আমায় রেখে দিচ্ছেন।

—ভালই হল। আসুন আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলা যাক। দেবীদয়ালের মত একজন ধনীর সঙ্গে জেল ফেরত ওম মেহতার ঘনিষ্টতা হবার কারণটা কি বলতে পারেন ?

একটু চুপ করে থাকার পর মেহরা বলল, বাঁকা পথ দিয়ে কর্তা অনেক টাকা রোজগার করতেন। মাঝে মাঝে মেহতা তাঁকে ওই ব্যাপারে সাহায্য করতো।

—ওকে নিয়ে তিনি বম্বে যাচ্ছিলেন। চোরা পথে টাকা রোজগারের কোন নতুন ধান্দা ছিল কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেদিন তো আপনি স্টেশনে পৌঁছাতে গিয়েছিলেন ওঁকে। বিশেষ কিছু চোখে পড়েছিল কি ?

—বিশেষ কিছু ? চিন্তিত গলায় মেহরা বলল, রাকেশ চৌহানকে আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তার সঙ্গে আরো একটা লোক ছিল। ওম মেহতা কর্তাকে বলেছিল, ওই লোকটা নাকি সাংঘাতিক প্রকৃতির। কাপড়ের মিলের এজেন্ট সেজে প্রেমবাবুকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।

—লোকটার নাম কি ?

—বেদপ্রকাশ।

—আপনি বুঝলেন কি করে ও লোকটাই বেদপ্রকাশ।

—ও যখন প্রেমবাবুর কাছে গিয়েছিল আমরাও ঠিক সেই সময় ওখানে গিয়ে পড়ি। মেহতা পরের দিন ওর সম্পর্কে কর্তাকে সতর্ক করেছিল।

—বেদপ্রকাশ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে দেবীদয়াল তাই আপনাকে বলেছিলেন। যা হোক, তারপর কি দেখলেন ?

বাসবের কথা শুনে মেহরা বিলক্ষণ অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে তাঁর প্রকাশ না করে বলল, ওই সময় আমি রিণাদেবী আর ডাঃ চৌধুরীকে দেখেছিলাম। রাজীব সেনকেও দেখেছিলাম। তিনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছিলেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, রাজীব সেন কে ?

—ড্রইংরুমে যে ভদ্রলোক রয়েছেন। উনি একজন কন্ট্রাক্টার। দরকার পড়লে ওকে দিয়ে কর্তা কাজ করিয়ে নিতেন।

—প্রেমবাবু টাকার কথা কি যেন বলছিলেন ওঁকে—

—কোথায় যেন বড় একটা কাজ ধরেছেন উনি। কুড়ি হাজার টাকা নিয়েছিলেন কর্তার কাছ থেকে। আরো কিছু নেবার চেষ্টায় ছিলেন।

—হুঁ। দেবীদয়ালের সঙ্গে ওম মেহতা যে বম্বে যাচ্ছে একথা কে কে জানতো?

—কেউ না। কর্তা বলতে বারণ করেছিলেন।

—পুলিশের মত আপনারও কি দৃঢ় ধারণা খুন মেহতা করেছে?

থেমে থেমে মেহরা বলল, এমন কাজ সে কেন করতে গেল সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছি না। কর্তা বেঁচে থাকলেই তো তার লাভ।

বাসব আর কোন প্রশ্ন না করে নিভে যাওয়া পাইপ সরাতে ধরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ড্রইংরুমে তখনও রাজীব সেন ছিলেন। বাসব সোফায় বসতে বসতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করছি। তেইশ তারিখের সন্ধ্যায় আপনি স্টেশনে গিয়েছিলেন কেন?

তীক্ষ্ণ গলায় সেন বললেন, কেন গিয়েছিলাম জেনে আপনার কি লাভ?

—খুনের তদন্ত করতে এসেছি। আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে।

—খুনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? এরকম একটা গোলমেলে ব্যাপারে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করছেন কেন?

—আমার একটা সাধারণ প্রশ্নকে এত গুরুত্বই বা আপনি দিচ্ছেন কেন?

সেন নিজের উত্তেজনা চেপে বললেন, একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—সেই একজন চোকসি সাহেব। আরো কিছু টাকার সন্ধানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, নয় কি?

উত্তেজিতভাবে প্রেমকিশোর বলে উঠল, আরো টাকা! কি খাইয়ে আপনি বাবাকে বশ করেছিলেন বলুন তো?

সেন কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালেন।

বাসব বলল, কি হল?

—আমি এখন যেতে পারি কি?

—যাবেন? যান—।

রাজীব সেন ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকিশোর ফেটে পড়ল, লোকটা জোচ্চর। আমি ওকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব। বাবাকে তেলিয়ে তেলিয়ে অনেক টাকা হাতিয়েছে।

বাসব দুচার কথায় ওকে শান্ত করল। তারপর দুই ভাই-বোনের সঙ্গে দেবীদয়াল সম্পর্কে অনেক কথা হল। বিণা আর প্রেমকিশোর মোটেই খুশি ছিল না দেবীদয়াল নানা ধরনের স্মাগলিং-এ জড়িয়ে ছিলেন বলে। কিন্তু

বাবাকে এ সম্পর্কে কিছু বলার সাহস তাদের ছিল না। বিদেশ থেকে চোরা পথে আসা ওষুধ সংগ্রহ করতেই তিনি যাচ্ছিলেন বম্বে। কাজের সুবিধার জন্য রাহুলকে এই ব্যাপারে জড়ানো হচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে ওম মেহতা যে বম্বে যাচ্ছিল দুজনের কেউ জানতো না—ইত্যাদি অনেক কথা জানা গেল।

শেষে রিণা বলল, বাবার পরিচিতদের মধ্যে আরো একজন ছিল যে ওই কাজকর্ম পছন্দ করতো না। আমি বাবার সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের দেরাজ থেকে দুটো চিঠি পেয়েছি। ইংরাজীতে টাইপ করা সেই চিঠি দুটোতে তাঁকে ওই পথ থেকে সরে আসার জন্য বলা হয়েছে।

বাসব বলল, চিঠি দুখানা দেখি।

—আনছি।

রিণা উঠে গেল।

—প্রেমবাবু কাল ভোরে আমার একটা গাড়ির দরকার হবে।

—বেশ তো। তিনখানা গাড়ি আছে। যেটা ইচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। দূরে কোথাও যাবেন নাকি?

হ্যাঁ। দিল্লী থেকে একটু বাইরে যাব। ড্রাইভারের দরকার হবে না।

এই সময় রাকেশ চৌহান কিছু ব্যস্তভাবেই ঘরে প্রবেশ করল। সে শুধু প্রেমকিশোর বা রিণাকে আশা করেছিল বোধহয়। বাসব আর শৈবালকে উপস্থিত থাকতে দেখে তার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

সে দরজার কাছ থেকেই বলল, প্রেমবাবু, একবার বাইরে আসবেন? আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

প্রেমকিশোর সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা না করেই বলল, বলুন। এঁদের সামনে শুনতে আমার অসুবিধা হবে না রাকেশবাবু।

—ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।

—কিছু আসে যায় না। আপনি বলুন।

চৌহানের মুখ লাল হয়ে উঠল। মনে হল, সে বোধহয় এখুনি বিশ্রী ধরনের কিছু করে বসবে। রিণা এসে পড়ল এই সময়। ভ্রূ-কুঁচকে চৌহানের দিকে একবার তাকিয়ে সে চিঠি দুটো দিল বাসবের হাতে। বাসব চিঠি দুটো উল্টে পাল্টে দেখে নিজের পকেটে ভরে রাখল।

—মিঃ চৌহান, আপনি নিশ্চয় আমার পরিচয় পেয়েছেন। বাসব বলল, আমিও আপনার কথা শুনেছি। তদন্তে সুবিধা হয় এমন কিছু জেনে নিতে চাই। এখন সুবিধা হবে কি?

তীক্ষ্ণ গলায় চৌহান বলল, এ সমস্ত প্রশ্ন আমায় কেন? খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

—আপনি জানেন এ কথা তো বলিনি। আমার আগ্রহ অন্যত্র। তেইশ

তারিখে আপনি স্টেশনে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—আপনার অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। আমি যাব না-যাব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—অবশ্য। তবে এক্ষেত্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেই আপনি ভাল করবেন। অবশ্য পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চাইলে স্বতন্ত্র কথা।

রাগে গিস গিস করলেও চৌহান বুঝতে পাচ্ছিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বেসরকারী গোয়েন্দা হলেও, পুলিশের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ থাকাই সম্ভব। কোন ছুতোয় গোলমালের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলা বিচিত্র নয়।

চৌহান সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা অকারণে ভদ্রলোকদের অতিষ্ঠ করে তোলেন। আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম কেন, জেনে যে আপনার কি লাভ ঈশ্বর জানেন। এক বন্ধুকে পৌঁছাতে গিয়েছিলাম।

—বন্ধুটি বোধহয় বেদপ্রকাশ ?

—সে কে ?

একটু হেসে বাসব বলল, আপনার বিস্ময় আমাকে হাসিয়েছে মিঃ চৌহান। এমন ভাব করছেন যেন ও নাম কখনও শোনেননি। অথচ বিনোদ মেহরা আপনাদের দুজনকে স্টেশনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছে।

—ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—প্রকাশের কথা বলছেন। তার সঙ্গে স্টেশনে দেখা হয়েছিল বটে। কয়েক মিনিট কথা বলেছিলাম আমরা।

—লোকটা কে ?

—একজন সেলস্‌ম্যান। সামান্য মুখ চেনাচিনি আছে।

—তার ঠিকানাটা দিতে পারেন ?

—ঠিকানা! ঠিকানা তো আমি জানি না। এখানে ওখানে দেখা হয় এই পর্যন্ত।

চৌহান যে সত্যি কথা বলছে না তার মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। বাসব কিছুটা অস্থিরতা বোধ করলেও তাকে আর কিছু বলল না। পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে মুখ ফেরাল প্রেমকিশোরের দিকে।

—বেদপ্রকাশ আপনার দোকানে কেন গিয়েছিল বলুন তো ?

বেদপ্রকাশ নামে সত্যি প্রেমকিশোর কাউকে চেনে না। দোকানে কত লোকই আসে। বাসব ঠিক কার কথা বলছে সে মোটেই বুঝতে পাচ্ছে না।

—আমি কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারলাম না।

—আমি আপনাকে সাহায্য করছি। কয়েকদিন আগে আপনার বাবা,

মেহরা আর ওম মেহতা এক সঙ্গে দোকানে গিয়েছিলেন। সেই সময় আপনি কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কি ?

—ও, মনে পড়েছে—প্রেমকিশোর বলল, কাপড়ের মিলের একজন সেলস্‌ম্যান সে সময় ছিল। ট্রাইলেক্স নামে এক ধরনের কাপড়ের এজেন্সি নিতে সে আমাকে বলছিল। নমুনা দেখাবার জন্য ইনভাইটও করেছিল অ্যামবাসাডার হোটেলে সন্ধ্যার সময়।

—আপনি গিয়েছিলেন ?

—যাওয়া হয়নি।

—জানা গেছে ওই লোকটার নাম বেদপ্রকাশ। অত্যন্ত বাজে প্রকৃতির লোক নাকি। আমার বিশ্বাস সে আপনার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল। সেই মিলের নাম আপনার মনে আছে ?

—হ্যাঁ।

—আজ আর হবে না। রাত হয়ে গেছে। ছোট হোক বড় হোক, একটা অফিস নিশ্চয় ওই মিলের দিল্লীতে আছে। আপনি ডায়রেক্টরি দেখে কাল ওখানে ফোন করবেন। জানতে চেষ্টা করবেন ওই ধরনের সেলস্‌ম্যান ওদের আছে কিনা।

—আচ্ছা।

বাসব এবার চৌহানের দিকে ফিরল।

—আপনার সহযোগিতা পেলে সত্যি আমি উপকৃত হতাম। বেদপ্রকাশ সম্পর্কে আমার সমস্ত কিছু জানা দরকার। কিন্তু আপনি মোটেই মুখ খুলতে চাইলেন না।

—এ আপনার অন্যায় অভিযোগ। ভারি গলায় চৌহান বলল, তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কালে ভদ্রে দেখা হয় এই পর্যন্ত। এই জিজ্ঞেসাবাদের কারণটা কি আমি তাও বুঝতে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার। চোকসি সাহেবকে কে খুন করেছে জানা গেছে। তাকে খুঁজে বার করলেই তো হয়। আমাদের বিরক্ত করছেন কেন ?

রিণার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চৌহান উঠে দাঁড়াল।

আবার বলল, আমি এখন চললাম। ভবিষ্যতে নিশ্চয় আমাকে আর দরকার পড়বে না।

দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে রিণা বলে উঠল, কিছু মনে করবেন না মিঃ ব্যানার্জী। ওই ধরনের লোক এ বাড়িতে যাতে আর না আসে সে ব্যবস্থা আমরা করব।

মৃদু হেসে বাসব বলল, আমার যা পেশা তাতে অমন কথা দুচারটে শুনতেই হয়। এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। তেইশ তারিখে আপনি আর

ডাঃ চৌধুরী স্টেশনে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—ডাঃ চৌধুরীকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম ও বেনারস যাচ্ছিল যার সঙ্গে দেখা করতে।

—একথা উনি আমায় কিন্তু বলেন নি ?

—গুরুত্বপূর্ণ কথা নয় বলেই বোধহয় বলেনি।

ওদিকে চৌহান নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিজের ফিয়েট গাড়ি চালিয়ে চলেছে। আট-ঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা খাড়া করেছিল। তবু বারংবার তার কেন কেটে যাচ্ছে সে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনিয়েই ওরা জল আরো ঘোলা করে তুলেছে। আটটা বাজার কিছু পরে চৌহান নিজের বাড়িতে পৌঁছাল। বেদপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বারান্দাতেই। বেতের চেয়ারে বসে সে নির্বিকার মুখে সিগারেট ফুঁকছিল।

—তুমিই আমাকে ডোবাবে! এরকম খোলা জায়গায় কেন বসে রয়েছো ?

চৌহানের বলার ভঙ্গিতে একটু আশ্চর্য হয়ে বেদপ্রকাশ বলল, আপনাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলুন তো ?

—হতে আর কিছু বাকি নেই! ভেতরে এস।

দুজনে ঘরে এল।

—বুঝতে পাচ্ছি না কিভাবে ওরা তোমার পরিচয় পেয়েছে। এমন কি তোমাকে আর আমাকে এক সঙ্গে দেখেছেও।

ক্রুদ্ধ গলায় বেদপ্রকাশ বলল, একাজ তাহলে শুয়রের বাচ্চা ওম মেহতার। সে আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে।

—লোকটা কোথায় উবে গেল বলতো ?

—কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছি না। আমি সারাক্ষণ পাহারায় ছিলাম। শিখটার চালচলন সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আমি তার পিছু পিছু নেমে পড়েছিলাম ট্রেন থেকে। পরের কোন স্টেশনে নেমেপড়ে হয়তো, মেহতা গা ঢাকা দিয়েছে।

—হতে পারে। ওই শিখের চালচলন আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। ওকে দিল্লীর রতনলালের বাড়িতে তাকে তুমি ঢুকতে দেখেছিলে। রতনলাল—

—থিয়েটারের সাজপোশাক ভাড়া দেয়।

—সন্দেহটা ওখানেই। ও কথা এখন থাক। এদিকে ডাক্তার ছোকরা আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে। যে কোন দিন সে রিণাকে বিয়ে করে বসতে পারে। শোনো প্রকাশ, ওই বিশাল সাম্রাজ্য আমি কোন মূল্যেই

হারাতে চাই না। চোকসি সাহেব যাওয়ায় একটা বাধা দূর হয়েছে। প্রেমকিশোরের দিকে আর দৃষ্টি দেবার দরকার নেই। এখন ডাক্তারকে সরাতে হবে।

—দুনিয়া থেকে?

—না। প্রথমে ওকে আটকাতে হবে। তারপর পুলিশি ঝামেলায় এমন ভাবে জড়াতে হবে যাতে বাছাধনের কয়েক বছরের শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়। তোমাকে কাল প্ল্যানটা বলব। এখন কেটে পড়ো। দিনের বেলা একেবারে ঘর থেকে বেরুবে না।

—কিছু টাকা এখন পেলে ভাল হত।

চৌহান পকেট থেকে একশ টাকার নোট বার করে বলল, রাখ। এখন আমার নিজেরই টানাটানি। কাজ চুকে গেলে ভাল করে দেব।

অল্প শব্দ তুলে মার্ক-টু মোড় নিল। সামনে টানা ফাঁকা রাস্তা। চার পাশের কাচ তোলা রয়েছে, তবে শৈবালের শরীর কনকনিয়ে যাচ্ছে। দাঁতে পাইপ চেপে, স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে নির্বিকার মুখে বাসব বসে আছে। তার দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

শৈবাল রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল, ছটা দশ মিনিট। হু হু করে মার্ক-টু এগিয়ে চলেছে হাল্কা কুয়াশা কাটতে কাটতে। মাইল মিটারের কাঁটা পঞ্চাশ আর পঞ্চান্নর মধ্যে থির থির করে কাঁপছে। দিল্লীকে অনেক পিছনে ফেলে আসা গেছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বাসব বলল, চমৎকার চলছে কি বলো?

—দেখে মনে হয় গাড়িটা নতুন। আচ্ছা, আমরা চলেছি কোথায়? এই নিয়ে তিনবার প্রশ্নটা করলাম। এবার উত্তর দেবে কি?

—এ তো রাগের কথা ডাক্তার। আমরা রেওয়ারি চলেছি।

—কেন?

—টাইম টেবিলে দেখলাম, মেলের প্রথম স্টপেজ রেওয়ারি। প্রথম সুযোগেই হত্যাকারী গাড়ি থেকে নেমে যাবে এটাই খুব স্বাভাবিক। আমার দৃঢ় ধারণা সে রেওয়ারিতে নেমে গেছে।

—তুমি রেওয়ারি সম্পর্কে এত নিশ্চিত হচ্ছ কি ভাবে? এমনও তো হতে পারে যে খুন আরো পরে হয়েছে। হত্যাকারী হয়তো আগ্রায় নেমেছে।

—পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট তো সে কথা বলছে না। রিপোর্টে বলা হয়েছে চোকসি সাহেব মারা গেছেন রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। মেল রেওয়ারি পৌঁছাচ্ছে বারোটার কিছু পরে। কাজেই বুঝতে পাচ্ছ আমার স্থান

নির্বাচন ভুল হয়নি।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতদিন পরে ওখানে গিয়ে খুনীর টিকি কি দেখতে পাওয়া যাবে ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, তাকি আর যায়! ওখানে যাচ্ছি যদি কিছু খবর-টবর পাওয়া যায়।

—কি রকম ?

—রেওয়ারি বড়সড় জনপদ নয়। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাত বারোটার পর ওখানে বেশি লোক নামবার কথা নয়। কাজেই গেটে যার ডিউটি ছিল সে নিশ্চয় কিছু না কিছু বলতে পারবে। অবশ্য আশা টেন পারসেণ্টের বেশি নয়। তবু আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আর কোন কথা হল না।

আরো ঘণ্টা খানেক পরে ওরা রেওয়ারি পৌঁছাল। গত রাত্রেই বাসব মেহরার কাছ থেকে পথের সন্ধান নিয়ে রেখেছিল। ছোট শহরটি এখনও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেনি। পথে লোকজন একেবারেই নেই। একটা চা-এর দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে স্টেশন কোন দিকে জেনে নেওয়া হল। কুয়াশা বেশ কেটে গেছে। তবে সূর্যের আলো এখনও তেমন স্বচ্ছ নয়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওরা স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশনের আকৃতি মাঝারি ধরনের। সামনে খানতিনেক ট্যাক্সি আর অনেক রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আট-দশটা টাঙ্গাও আছে। বাসব গাড়ি দাঁড় করাল। কাচ তোলাই ছিল, দরজা লক করে দিয়ে ওরা এগুলো। একজন কুলির কাছ থেকে জানা গেল কিছুক্ষণ আগে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাশ করে গেছে। এখন স্টেশনে ব্যস্ততা একেবারেই নেই। বাবুরা সব অফিস ঘরে আছেন।

ওরা প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে এধার ওধার তাকাল। নতুনত্ব কিছু নেই। সেই মার্কামারা চেহারা। স্টেশন মাস্টারকে ঘরেই পাওয়া গেল। ছোটখাট চেহারার মানুষ। মনে হয় রিটায়ার করতে আর বেশি দেরি নেই। বাসব জানাল, সরকারী অনুমতি পেয়ে সে দেবীদয়াল চোকসির খুনের তদন্ত হাতে নিয়েছে। ওই কেসের ব্যাপারেই সে কিছু সাহায্য চায়।

স্টেশন মাস্টার গম্ভীর হয়ে গেলেন। দেবীদয়ালের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড এখন বহু চর্চ্চিত কাহিনী। তাঁরও অজানা ছিল না। তবে খুনের তদন্ত পুলিশ ছাড়া যে আর কেউ করতে পারে একথা তিনি এই প্রথম শুনছেন। তবে এই লোক দুজনকে হাঁকিয়ে দেওয়াও আবার বিবেচনার কাজ মনে করলেন না। বলা যায় না, অসহযোগিতা করলে পরে হয়তো কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে।

উনি বললেন, খুন সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

—স্বাভাবিক। বাসব বলল, ২৩ তারিখ রাত্রে যিনি গেটে ছিলেন তাঁকে আমার দরকার। গোটা কয়েক প্রশ্ন করব। তাঁকে কি এখন পাওয়া যাবে ?

—দেখছি। তেওয়ারি—

চেহারা ছোটখাট হলে কি হবে। গলায় জোর আছে। এক হাঁকেই একজন পোর্টার এসে উপস্থিত হল। নিশ্চয় এরই নাম তেওয়ারি।

—দেখতো সিনহাবাবু এসেছেন কিনা।

তেওয়ারি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে আদুরে-আদুরে চেহারার মধ্যবয়স্ক একজন এলেন। পানের রসে ঠোঁট লাল হয়ে রয়েছে। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

—আমায় ডেকেছেন বড়বাবু ?

—হ্যাঁ। এই দুজন ভদ্রলোক দেবীদয়াল চোকসির হত্যার তদন্তে এসেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আকাশ থেকে পড়লেন সিনহা, সেকি ! আমি তো ও ব্যাপারে কিছু জানি না।

—আপনার অবাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক মিঃ সিনহা।—বাসব বলল, তেইশে রাত্রে আপনি ডিউটিতে ছিলেন। সেই সময়কার যাত্রীদের সম্পর্কে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—কি জানতে চাইছেন আমি বুঝতে পাচ্ছি না। যাহোক, বলুন ?

—সেদিন দিল্লী থেকে আগত গুজরাট মেল থেকে কি অনেকে এখানে নেমেছিল ?

—শর্ট জার্নির প্যাসেঞ্জারদের তো মেল ট্রেনে চড়া বারণ। দিল্লী থেকে রেওয়ারির দূরত্ব মাত্র পঁচাশি কিলোমিটার।

—সেদিন তাহলে এখানে কেউ নামেনি ?

সিনহা একটু থেমে বললেন, প্ল্যাটফর্ম একেবারে ফাঁকা ছিল বলেই দেখতে পেয়েছিলাম দুজন লোককে ট্রেন থেকে নামতে।

—তারপর ?

—অবাক হয়ে গেলাম। আইনতঃ মেল ট্রেন থেকে এখানে কেউ নামতে পারে না। লোকে এখান থেকে চড়বে। ততক্ষণে এক ভদ্রলোক গেটের কাছে এগিয়ে এলেন। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, আমার জয়পুর পর্যন্ত টিকিট আছে। একটা কাজ মনে পড়ায় এখানেই নেমে পড়লাম। আমার কিছু বলার ছিল না। যে কোন প্যাসেঞ্জার দূরের টিকিট কেটে আগাম নেমে পড়তে পারে। আইনে আটকায় না।

—ভদ্রলোককে দেখতে কেমন ?

—মুখ ভাল করে লক্ষ্য করিনি। একজন শিখ।

—উনি বোধহয় আর অপেক্ষা করেন নি। টিকিট দিয়েই স্টেশন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। আমি গেট থেকেই দেখলাম ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠলেন।

—আর দ্বিতীয়জন ? সে আপনার কাছে আসেনি ?

হাসবার চেষ্টা করে সিনহা বললেন, সে বোধহয় ওধারের বেড়-টেড়া টপকে সরে পড়েছিল। স্থানীয় দু-চারজন লোক প্রতিদিন টিকিট ছাড়াই ওই ট্রেনে আসে। আমাদের চোখ বাঁচিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে যায় কোন রকমে।

—ধন্যবাদ। অনেক উপকার করলেন। এবার আমরা উঠি।

—উঠবেন কি রকম! এতক্ষণ পরে কথা বললেন স্টেশন মাস্টার, এককাপ চা অন্তত খান।

—মন্দ নয়। আনান।

চা খেয়ে আরেক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা উঠল। বাসব এতক্ষণ পরে পাইপ ধরিয়েছে। মার্ক-টুতে উঠতে যাবার আগে ও থামল। ট্যাক্সি তিনটে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার তিনজন মাঝের গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের মধ্যে কেউই শিখ নয়। বাসব ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিন জোড়া ব্যগ্র চোখ ওর দিকে ফিরল।

—এখানে কটা ট্যাক্সি আছে ?

এই ধরনের প্রশ্ন তারা আশা করেনি। তবু বাসবের চেহারা, দামী সাজপোশাক আর ঝকঝকে মার্ক-টু তাদের মনে সম্ভ্রম জাগিয়েছে। একজন বলল, ট্যাক্সি এই তিনটেই আছে সাব।

—পুলিশের পক্ষ থেকে একটা কেসের তদন্ত করতে এসেছি। তোমাদের কাছ থেকে গোটা কয়েক কথা জেনে নিতে চাই।

তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বাসব বলল আবার, তেইশ তারিখ রাত্রের ঘটনা। টিকিট কালেক্টরবাবু দেখেছেন গুজরাট মেল থেকে নেমে একজন শিখ ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে চড়েছিলেন। উনি তোমাদের মধ্যে কার প্যাসেঞ্জার হয়েছিলেন ?

কেউ কিছু বলল না।

—তোমাদের কোন ভয় নেই। ঠিক ঠিক উত্তর দিলে বিশেষ উপকার করা হবে। আর যদি অসহযোগিতা করতে চাও নিশ্চিত ভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে।

একজন এবার বলল, পুলিশকে আমরা বড় ভয় পাই সাব। উনিশ-বিশ দেখলেই আমাদের পিছু লেগে যায়। তবে আপনি যখন বলছেন—

—কোন ভয় নেই। আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তরটা দাওতো?

সেই লোকটা আবার বলল, ওসমানের গাড়িতে সেদিন ওই শিখ ভদ্রলোক সওয়ারি হয়েছিল।

ওসমান একটু এগিয়ে বলল, অমন সওয়ারি বহুদিন পাইনি সাব। মন্দার বাজারে ভালই রোজগার হয়েছিল।

—তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

—পুরানো দিল্লী। মিটারে যা উঠেছিল তা ছাড়াও দশটাকা বকশিস করেছিলেন আমায়।

এবার তৃতীয় ড্রাইভার কথা বলল, সে রাতের ব্যাপারই ছিল আলাদা। ওসমান রওনা হবার পর আমার গাড়িতে একজন সওয়ারি এল। লোকটা একটু কেমন ধরনের ছিল। আমাকে বলল, আগের গাড়িটার পিছু পিছু যেতে। আমিও তাকে পুরানো দিল্লীতে নামিয়ে দিয়েছি।

বাসব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শৈবালের দিকে।

—ওসমান, আমি তোমার সওয়ারি হতে চাই।

সবিস্ময়ে ওসমান বলল, আপনার গাড়ি রয়েছে সাব।

—ও গাড়িটা আমার বন্ধু চালিয়ে নিয়ে আসবেন।

বাসব দুটো দশটাকার নোট ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিল! তারা কুন্ঠিত-ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে টাকা নিল। চাবিটা শৈবালের হাতে দিয়ে ও ওসমানের ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল। ওসমানও গিয়ে বসেছে ড্রাইভিং সিটে।

—কোথায় যাব সাব?

—পুরানো দিল্লী। যেখানে সেই শিখ ভদ্রলোককে নামিয়ে দিয়েছিলে।

ট্যাক্সি গতি নিল।

শৈবাল পিছনেই রইল মার্ক-টু নিয়ে।

স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে প্রধান সড়কে পড়ার পর বাসব বলল, ভাল কথা ওসমান, সেদিন সোজা দিল্লী চলে গিয়েছিলে, না মাঝে একআধবার গাড়ি থামাতে বলেছিলেন ভদ্রলোক?

—শহর ছাড়িয়ে একবার আমায় থামতে বলেছিলেন।

—কেন?

—ঠিক বলতে পাচ্ছি না। উনি গাড়ি থেকে নেমে জংলা মত জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। টর্চের আলো ফেলে ফেলে কি যেন দেখলেন। তার-পর আবার ফিরে এলেন।

—হুঁ। তুমি আজও সেই জায়গায় একবার গাড়ি থামাবে।

ভ্রূ-কুঁচকে বাসব চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গেল! দক্ষ হাতে ট্যাক্সি সচল রেখেছে ওসমান। মাইল দুয়েক এগুবার পর সে থামল। নির্জন চওড়া

রাস্তা ছড়িয়ে রয়েছে সামনের দিকে। রাস্তার এক পাশে চাষের জমি। অন্য পাশে বড়সড় একটা জলা। জলার চারিধারে ঘনভাবে গজিয়ে রয়েছে ছোট বড় জানা ও অজানা গাছ। তারপর বেশ উঁচু জমির ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। মনে হয় এখন যেখানে জলা রয়েছে সেখানকার মাটি কেটেই এক কালে রেললাইন উঁচু করা হয়েছে।

বাসব ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রশ্ন করল, উনি রাতে তিনি কোন দিকে গিয়েছিলেন ?

—জঙ্গলের দিকে সার।

ডাক্তার, তুমি গাড়িতেই থাক। আমি জলার কাছ থেকে আসছি।

বাসব এগুলো। ও নিজেকে বাঁচিয়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একেবারে থামল জলার পাড়ে। দুধারের বিস্তার চোখের দৃষ্টি ছাড়িয়ে গেছে। অত্যন্ত নোংরা জল থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। দিনের আলোতেও মশা ভন ভন করছে চারিধারে। ওধারে অন্ততঃ পনেরো ফুট উঁচু জমির ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে।

বাসব সতর্কভাবে চারিধারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এখানে পৃথ্বীপাল সিং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে গভীর রাতে কেন এসেছিল জানা গেলে কিছুটা সুবিধা নিশ্চয় হবে। লাইনের কাছ থেকে নেমে আসা উঁচু জমি ঢালু হয়ে এসে মিশেছে জলার সঙ্গে। হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল ঢালু হয়ে আসা অংশে হলদে মত কি একটা যেন পড়ে রয়েছে। জলার ওপারে, কাজেই যাবার উপায় নেই। ভাল ভাবে তাকিয়ে বুঝল ওটা একটা সিগারেটের প্যাকেট। সম্ভবতঃ চারমিনারের।

ওধারে একবার যেতে পারলে ভাল হত। বাসব ভালভাবেই বুঝতে পারল জলা না সাঁতরে কোন মতেই যাওয়ার উপায় নেই এখান থেকে। অবশ্য অন্য একটা পথ আছে। স্টেশনে গিয়ে, লাইন ধরে এগিয়ে ওখানে গিয়ে নামা। বর্তমানে আর ও সমস্ত ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই।

আরো কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর বাসব ফিরে এল।

আবার সচল হল ট্যাক্সি আর মার্ক-টু।

সারাটা পথ আর একটা কথাও বাসব বলল না ওসমানের সঙ্গে। ঘোরাল চিন্তা ওকে বেশ উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। বেলা বেশ চড়ে যাবার পর ওরা এসে পৌঁছাল পুরানো দিল্লীর এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে। বাজার এলাকা অবশ্য ঠিক বলা চলে না। কিছু দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও নিম্ন মধ্যবিত্তদের আবাসের সংখ্যা বেশি। শ্রীহীন আর রংচটা সমস্ত বাড়ি। পথে লোক চলাচলও প্রচুর।

একধারে ট্যাক্সি থামিয়ে ওসমান বলল, এখানেই আমি সওয়ারীকে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

—ভাড়া পেয়ে যাবার পর তুমি অপেক্ষা করেছিলে ?

—না। একটু এগুতেই যোগেন্দারের সঙ্গে দেখা। রেওয়ারি থেকে তার গাড়িতে যে প্যাসেঞ্জার এসেছিল তাকে নামিয়ে সে গাড়িতে স্টার্ট নিচ্ছিল। আমরা দুজন বাকি রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

বাসব ভাড়া আর বকশিস দিয়ে এবার ওসমানকে বিদায় করল। শৈবাল ততক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনে ব্যগ্রভাবে চারিধারে তাকাতে লাগল। ব্যস্তভাবে লোকজন চলেছে। জোরে জোরে কথাবার্তা বলছে তারা। একজন মাদারী ফুটপাথের একধারে খেলা দেখাবার আয়োজনে ব্যস্ত।

—ডাক্তার ওই সাইনবোর্ডটা দেখছো ?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে একটা একতলা বাড়ি। আগে বোধহয় দেওয়ালে হলদে রং ছিল, জলে ধুয়ে ধুয়ে এখন কালচে আকার নিয়েছে। বিরাট এক সাইন বোর্ড লাগান বাড়ির মাথায়। বাসব ওদিকেই আঙুল নির্দেশ করেছিল। সাইনবোর্ডের জমি গাঢ় সবুজ। তার উপর বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে—রতনলাল অ্যাণ্ড কোং।

থিয়েটার ও নাওটাঙ্কির যাবতীয় সাজপোশাক ভাড়া দেওয়া হয়।

সত্বাধিকারী—রতনলাল জেঠানী।

শৈবাল বললে, নাওটাঙ্কিটা কি বস্তু ?

—শুনেছি যাত্রার মত একটা ব্যাপার। এখানে পৃথ্বীপাল ট্যাক্সি থেকে নেমেছে, আবার এখানেই ওই ধরনের একটা দোকান রয়েছে। তোমার অদ্ভুত লাগছে না ?

—অদ্ভুত লাগার কি আছে ?

—তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছ ডাক্তার। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই অদ্ভুত যোগাযোগটাই আমাকে সমাধানের পিক পয়েন্টে নিয়ে যাবে।

—কি রকম ?

—রিজার্ভেশন ক্লার্ক কি বলেছিল মনে আছে তো ? পৃথ্বীপাল সিং-এর বার্থ যে বুক করতে এসেছিল সে শিখ নয়। তুমি বলেছিলে পৃথ্বীপালের হয়ে অন্য কেউ বার্থ বুক করতে এসেছিল। তোমার যুক্তি তখনকার মত আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা জানতে পাচ্ছি রেওয়াবি থেকে পৃথ্বীপাল এমন এক জায়গায় এসে থেমেছিল যেখানে থিয়েটারের সাজপোশাকের একটা দোকান রয়েছে। অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করবার আদর্শ জায়গা। দুই আর দুই-এ তিন কখনই হতে পারে না, সব সময় চারই হবে।

—কি করবে এখন ?

—সন্দেহ যখন একবার মনে ঢুকেছে, রতনলালের কাছে গিয়ে খোঁজ

খবর না নিয়ে নড়ব না। এস—

ওরা রাস্তা পার হয়ে রতনলাল অ্যাণ্ড কোং-এর ভেতরে ঢুকল। বেশ ছিমছাম পরিবেশ। জন তিনেক লোক বেশ কিছু জরির কাজ করা পোশাক পাট করে রাখছিল টেবিলের উপর। একজন মোটা সোটা লোক কাজের তদারক করছিলেন। পরনে বেশ জেল্লাদার পোশাক। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না। মনে হয় উনিই এই প্রতিষ্ঠানের কর্তা। ওদের দেখেই উনি এগিয়ে এলেন।

বললেন সবিনয়ে, আসুন—আসুন—

বাসব বলল, আমি রতনলাল জেঠানীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলুন ? আমিই রতনলাল—

—কিছু গোপনীয় কথা ছিল। একান্তে বসার কোন জায়গা আছে কি ?

মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল ভদ্রলোক বিলক্ষণ অবাক হয়েছেন। ইতস্ততঃ করে বললেন, আসুন এদিকে—

ওধারে একটা দরজা ছিল। তারপরই খুপরিমত একটা ঘর। ওই ঘরে নিয়ে গিয়ে রতনলাল ওদের বসালেন। টেবিলের উপর প্রচুর কাগজপত্র রাখা রয়েছে। খান কয়েক চেয়ারও রয়েছে। বোধহয় প্রতিষ্ঠানের এটাই হল অফিস ঘর।

—বসুন। বলুন এবার।

বাসব পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপনি কি শুধু ড্রেস ভাড়া দেন না, প্রয়োজন পড়লে মেকআপম্যানও সরবরাহ করেন ?

—দরকার পড়লে ও-কাজটা আমিই করে থাকি। বলতে নেই, ও কাজে আমার একটু সুনাম আছে।

মাঝে মাঝে লোক এখানে এসে কি মেকআপ করিয়ে নিয়ে যায় ?

ফান্সি ড্রেসে যারা যোগ দেয় তারা আসে মাঝে মধ্যে। এত কথা জানতে চাইছেন কেন ? আপনারা কে ?

—সে কথায় পরে আসছি। পৃথ্বীপাল সিংকে চেনেন কিনা আগে বলুন তো ?

এবার রতনলাল সচকিত হলেন।—না।

—আপনি সত্যের অপলাপ করছেন জেঠানীজী।

—ওই নামের কাউকে সত্যি আমি চিনি না।

এবার আন্দাজে মোক্ষম ঢিল ছুঁড়ল বাসব, গত তেইশ তারিখের গভীর রাত্রে পৃথ্বীপালকে আপনার কাছে আসতে দেখা গেছে। শুনুন, আমি একটা খুনের কেসের তদন্তে এখানে এসেছি। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন ভাল, নইলে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা মিরাণী সাহেবকে এখানে ডাকিয়ে আনাতে বাধ্য হব। তখন কিন্তু আপনি গভীর জলে গিয়ে পড়বেন।

রতনলালের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্বভাবতই তিনি বোধহয় ভীতু প্রকৃতির।

হাঁচড়-পাঁচড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু শব্দ করেই আবার বসে পড়লেন। ফ্যাকাসে মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল। ওই সঙ্গে ফুটে উঠল অসহায়ভাব।

—বিশ্বাস করুন আমি কোন খুনের ব্যাপারে জড়িত নই। ···মানে······

—সে কথা একবারও বলিনি। বলতে চাইছি, প্রশ্নর সঠিক উত্তর আমাকে দেবেন, না আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব? আপনাকে আমি বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে করি। ব্যাপারটা যদি আমাদের মধ্যে মিটে যায়, আপনি অনেক ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারবেন। নইলে—।

আবার প্রশ্ন করছি, পৃথ্বীপাল সিংকে চেনেন?

—ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না। ক্লান্ত ভাবে রতনলাল বললেন, ও নামের একটা লোক তেইশ তারিখে আমার কাছে দুবার এসেছিল।

—প্রথমবার কখন—?

—বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাত।

—কেন?

—আমাকে এসে বলল নতুন বিয়ে করেছে। মজা করার জন্য ছদ্মবেশে একবার শ্বশুরবাড়ি যেতে চায়। তাকে মধ্যবয়স্ক শিখ সাজিয়ে দিতে হবে। আমি আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। আজকালকার ছোকরাদের মাথায় কতরকম কি ঘুরছে।

—লোকটা তাহলে শিখ নয়?

—না। হিন্দু বলেই মনে হল।

—আপনি তাকে শিখ সাজালেন?

—হ্যাঁ। ওই সামান্য কাজের জন্য সে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল।

—তার নামটা আপনি জানতে চেয়েছিলেন না, সে নিজেই বলেছিল?

—আমি জানতে চেয়েছিলাম।

—তারপর কি হল?

—বলল, তার পক্ষে মেক আপ তুলে মুখ পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না। রাত্রে কোন সময় আসবে মেক তোলাতে। আমি রাজি হয়েছিলাম। রাত সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময় এসেছিল সে।

—আপনি যদি আবার তাকে দেখেন চিনতে পারবেন?

—কেন পারব না?

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। শৈবালও।

—আশা করি আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। এখন আমরা চললা

দরকার পড়লে পরে আপনাকে খবর পাঠাব।

—আমি এখনও অথৈ জলে। বুঝিয়ে একটু বলবেন কি ?

—বুঝিয়ে বলার এখন কিছু নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, অজান্তেই আপনি একজন হত্যাকারীকে সাহায্য করেছেন।

ওরা বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

গাড়িতে স্টার্ট নেবার পর বাসব বলল, কি বুঝলে ?

—বেশ জটিল ব্যাপার।

—জটিল তো বটেই। তবে এখন আর নয়। আমার কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত সরল হয়ে আসছে। মোটিভ ওয়াকিবহাল হতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—হত্যাকারীকে তুমি ধরে ফেলতে পারবে ?

—মৃদু হেসে বাসব বলল, অবশ্য। আগামীকালই কোন সময় তাকে আমি ধরে ফেলতে পারব আশা রাখি। কিন্তু আর কথা নয় ডাক্তার। দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। এখন জোর গাড়ি ছুটিয়ে চোকসি হাউসে পৌঁছানো দরকার।

নেয়ারের খাটের উপর পাতা মলিন বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় সিগারেট টানছে বেদপ্রকাশ। গতকাল রাত্রে চৌহানের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পর আজ এতটা বেলা গড়িয়ে গেছে—সে নিজের ঘর থেকে বেরোয় নি। ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ধুলো থিক থিক মেঝের উপর ফেলে দিল।

কাঠ চেরা মেশিনের একটানা শব্দ ভেসে আসছে। সময় সময় বড় বিরক্তিকর লাগে। বিরাট মিলটার পিছন দিকে এক সারি কোন রকমে টিকে থাকা ঘর। তারই একখানায় বেদপ্রকাশ আছে। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা কোন উপায়ে নিজের পকেটস্থ না করা পর্যন্ত থাকার পক্ষে জায়গাটা মন্দ নয়।

ভেজানো দরজা ঠেলে গুলশান ঘরে প্রবেশ করল, বেদপ্রকাশের অনেকদিনের সঙ্গী।

আম্বালায় ওম মেহতার ছিনতাই পার্টিতে সেও ছিল। এখন দিল্লীতে পকেট মারের ব্যবসাটা একটু একটু করে জমিয়ে তুলছে। বর্তমানে এই ঘরেরই নেয়ারের খাটের অপর প্রান্তে সে রাত কাটিয়ে থাকে।

—তোমার বস আসছে।

গুলশানের কথা শুনে দ্রুত বিছানায় উঠে বসল বেদপ্রকাশ।

—বস না কচু। তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে তালা লাগিয়ে খোলা জায়গাটায়

গিয়ে দাঁড়াও। ওকে বলবে কাল থেকে আমি ঘরে ফিরিনি।

একরাশ প্রশ্ন ঠোঁটের আগায় এসে পড়লেও গুলশান কিছু বলল না। তাকের উপর থেকে তালাটা তুলে নিয়ে ঝটিতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজায় তালা লাগিয়ে সারি দেওয়া ঘরের সামনে এক চিলতে যে জমি ছিল তার উপর গিয়ে দাঁড়াল। বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ফুকতে লাগল নির্বিকার মুখে।

নাকে রুমাল দিয়ে চৌহান নোংরা গলিটা পার হয়ে এল। গাড়ি রেখে এসেছে বড় রাস্তায়। মাথায় নতুন একটা প্ল্যান এসেছে। বেদপ্রকাশের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। গলি পেরিয়ে চৌহান এক চিলতে ঘাস জমির উপর এসে দাঁড়াল। ঘরগুলোর কাছাকাছি কেউ ছিল না। সকলে কাজে কর্মে বেরিয়েছে।

গুলশান এগিয়ে এল।

—এই গুলশান। প্রকাশ ঘরে আছে তো?

—না। কাল থেকে ঘরে ফেরেনি।

—সেকি! আমি ওকে সব সময় ঘরে থাকতে বলেছিলাম। এই ধরনের লোকই যেচে বিপদ ডেকে আনে।

মহাবিরক্ত চৌহান ফিরে চলল।

—যাচ্ছেন? প্রকাশ ফিরে এলে কিছু বলব কি?

—আমি সন্ধ্যার পর আসব। বলে দিও।

চৌহান দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে গুলশান ঘরের সামনে এসে দরজার তালা খুলল।

ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখল বেদপ্রকাশ আবার সিগারেট ধরিয়েছে। সারা মুখে বেশ খুশি খুশি ভাব।

ভাগিয়েছ দেখছি। শোনো গুলশান দিল্লীতে থাকার মেয়াদ আমাদের ফুরিয়েছে। আমি আর তুমি এখান থেকে সরে পড়ছি।

—কোথায় যাচ্ছি?

—এখনও স্থির করিনি। আগে বুতলই রেস্তটা হাতানো যাক। চৌহান ছিবড়ে হয়ে গেছে। ওকে নিংড়ে আর কিছু পাওয়া যাবে না। এবার আমি অনেক বড় জায়গায় ঘাই মারব। কয়েক বছর আর টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

গুলশান বলল, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্ছি না?

—আমিই কি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম। তক্কে তক্কে থেকে ভেবে বুঝতে পেরেছি। চৌহান প্ল্যান করেছিল ভালই। আমার হাত দিয়ে প্রেমকিশোরকে শেষ করবে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার যে ওষুধটা আমাকে দিয়েছিল সেটা

যে মারাত্মক বিষ আমি জানতে পেরেছি। দেবীদয়াল তারপর যেতেন। তখন রিপাকে বিয়ে করে চৌহান মহাধনী হয়ে উঠবে। দেবীদয়াল আগে গেলেন। পথ একটু পরিষ্কার হয়েছে বটে—তবে চৌহানের জানা ছিল না, ছুঁড়িটা একটা বাঙ্গালী ডাক্তারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বুঝতেই পারছো সব আশার সমাধি হয়ে গেছে।

—বুঝলাম সবই। কিন্তু টাকাটা তোমায় চৌহান দিত? সে যখন নিজে পাচ্ছে না, তোমায় দেবে কোথা থেকে?

—তাইতো বলছি। সে কখনো দিতে পারবে না। এবার আমি প্রেমকিশোরের কাছে যাব। তাকে এমন কিছু সংবাদ দেব, যার দাম একলাখ টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়।

বেদপ্রকাশ বিছানা থেকে নেমে পড়ল। হুক থেকে কোটটা খুলে নিয়ে, গায়ে চাপাবার পর আবার বলল, তুমি ঘরেই থাক। আমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসছি।

হতভম্ব গুলশানের সামনে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় পা দেবার পর পেয়ে গেল একটা অটোরিক্সা। কনটপ্রেসে পৌঁছাতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগল না। চোকসি এণ্টারপ্রাইসের সামনে এসে দাঁড়াল বেদপ্রকাশ। প্রেমকিশোর তখন গদিতে বসে মুন্সির সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। আগন্তুককে দেখে হতবাক হয়ে গেল।

অসংলগ্নভাবে বলল, আপনি……সেদিন তো……

—আপনারা যে আমার মিথ্যা পরিচয় ধরে ফেলেছেন জানি। বেদপ্রকাশ বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, আমি তখন চৌহানের এজেণ্ট হিসাবেই কাজ করছিলাম। সে আপনাকে খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখন এসেছি স্বাধীন ভাবে। আপনার কিছু উপকার করাই আমার উদ্দেশ্য।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—বুঝবেন। বোঝাতেই আমি এসেছি। তবে আমার কথা শেষ না হবার আগে পুলিশে খবর পাঠাবেন না দয়া করে।

—বেশ। বলুন?

—চৌহান আপনার বোনকে বিয়ে করে আপনাদের সম্পত্তির মালিক হতে চায়। প্রথম প্রতিবন্ধক সে আপনাকে মনে করেছিল। অজান্তেই তার ইশারায় আমি আপনাকে খুন করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্য বলে আপনি বেঁচে গেছেন।

এরপরই আপনার বাবা খুন হয়ে গেলেন।

বিস্মিত প্রেমকিশোর বলল, বিচিত্র কথা আপনি শোনাচ্ছেন।

—যা সত্য তাই বলছি।

—আর কিছু বলবার আছে ?

—আসল কথা তো এখনও বলা হয়নি। কথাটা অবশ্য আপনার বাবার খুন হওয়া সম্পর্কে। আমি যা জেনেছি চৌহান তা জানে না। জানতে পারলে আনন্দে আটখানা হয়ে যেত। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, যা জেনেছি তার দাম আমার মতে একলাখ টাকার কম নয়।

—কি জেনেছেন বলুন ?

—একটু নিরিবিলিতে বলতে চাই।

প্রেমকিশোর আর কোন কিছু না বলে গদি ছেড়ে উঠে পড়ল। ইঙ্গিতে বেদপ্রকাশকে অনুসরণ করতে বলে নিজের অফিস ঘরের দিকে এগুলো।

চোকসি হাউসের পার্লারে বসে শৈবাল হিন্দুস্থান টাইমস্-এর পাতা উল্টাচ্ছিল। পড়ার চেষ্টা সে মোটেই করছিল না। সে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবছিল বাসবের অধ্যবসায়ের কথা। বেলা একটার সময় রেওয়ারি আর পুরানো দিল্লী হয়ে ফিরেছে। আবার আড়াইটের সময় বেরিয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে রেওয়ারির উদ্দেশে !

যাবার সময় তাকে বিশ্রাম করার উপদেশ দিয়ে গেছে। শৈবাল অবশ্য বুঝতে পেরেছে বাসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেসটা গুটিয়ে আনতে চাইছে। এখানে ফেরার পর দেড়ঘণ্টা সময়ও বৃথা নষ্ট করেনি।

নিষ্পত্তি

খাবার টেবিলে কথাপ্রসঙ্গে জেনে নিয়েছে, চোকসি সাহেবের সুটকেসটা গুছিয়েছিল কে ? জানা গেছে রিণা। ছোরাটা তিনি সঙ্গে নেননি। বিনোদ মেহরা যে ঘরে বসেন, সেই ঘরের টেবিলের দেরাজের মধ্যেই ওটা থাকত। খাওয়া-দাওয়ার পর বাসব আড়ালে বিনোদ মেহরার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেছে। ফোনে কথা হয়েছে এরপর মিরাণীর সঙ্গে।

তিনি জানিয়েছেন, পৃথ্বীপাল সিংএর কুপেতে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে দেবীদয়ালের কুপেতে পাওয়া একজনের হাতের ছাপ মিলে গেছে। বাসব এবার দারোয়ানের সঙ্গে কি সমস্ত কথা বলেছে। অবশ্য যাবার আগে সে বলে গেছে স্টেশন সুপারেন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তবে রেওয়ারি রওনা হবে।

দৈনিকপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে শৈবাল ঘড়ি দেখল, ছটা কুড়ি। বাসব যদি আজ ফিরতে না পারে, ঠাণ্ডায় বেশ কষ্ট পাবে। চুপচাপ এখানে বসে থেকে ভাবার লাভ নেই। উঠতে যাবে রিণা এল পার্লারে। একা নয়, সঙ্গে

রাহুল আছে। ওরা এতক্ষণ বাড়ির অন্যত্র কোথাও ছিল।

বসতে বসতে রিণা বলল, মিঃ ব্যানার্জী বোধহয় এখনও ফিরে আসেননি? উঠে পড়ে লেগেছেন ভদ্রলোক। ওম মেহতাকে নিশ্চয় উনি ধরে ফেলতে পারবেন, আপনার কি মনে হয়?

—আজ পর্যন্ত কোন তদন্তেই তো অসফল থাকেনি। শৈবাল বলল, আমার নিশ্চিত ধারণা এ ব্যাপারেরও নিষ্পত্তি হবে।

রাহুল বলল, আমিও সেই কথাই বলছিলাম। উনি যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে দু-একদিনের মধ্যেই—

রাহুলের কথা শেষ হবার আগেই প্রেমকিশোরকে আসতে দেখা গেল। কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। সে বেতের গড়ানে চেয়ারে গা এলিয়ে দেবার পরই, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। বাসব রেওয়াড়ি থেকে এসে পড়েছে বুঝতে আর কারুর অসুবিধা হয় না। দাঁতে পাইপ চেপে বাসব মিনিট-দুয়েক পরেই সকলের মধ্যে এসে পড়ল।

বসতে বসতে বলল, ডাক্তার, তোমার কনফারেন্স তো সোমবার থেকে। এখনও দিন-পাঁচেক বাকি। আমি আর থেকে কি করব। কালই কলকাতা ফিরে যাব স্থির করেছি। প্রেমবাবু, দিল্লী মেলে একটা রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে দিন।

সকলে অবাক হয়ে গেল।

প্রেমকিশোর বলল, রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেওয়া হবে। তার মানে…

—আপনি চলে যাচ্ছেন! কেসটার কি হবে মিঃ ব্যানার্জী?

রিণার কথা শুনে বাসব বলল, কেস সল্ভ করে ফেলেছি মিস চোকসি। কোন কিছুই এখন আমার কাছে অজানা নয়।

এবার সকলে হতবাক।

অনেকক্ষণ পরে রাহুল বলল, ওম মেহতা ধরা পড়েছে?

—না। সে কোনদিন ধরা পড়বে না। বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, এখানে বাইরের কেউ নেই, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি। কি বলছিলাম? হ্যাঁ—মেহতা আর ধরা পড়বে না। তাকেও নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে।

অসংলগ্ন গলায় রিণা বলল, খুন—

—হ্যাঁ, মিস চোকসি নির্ভেজাল খুন—

—আপনি বলতে চাইছেন, বাবাকে ওম মেহতা খুন করেনি। তাঁকে আর মেহতাকে মেরেছে অন্য কেউ?

—ঠিক তাই।

—মেহতার মৃতদেহ গেল কোথায়? প্রেমকিশোর বলল, সে খুন হলে তাকে তো ওই কূপের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেখা যেত।

—যায়নি। কারণ হত্যাকারী ওখানেই ধাঁধার সৃষ্টি করে পরিস্থিতির মোড় অন্যধারে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে গেলে আগের কিছু কথা জানা দরকার। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, অবশ্য এই জোড়া খুনের মোটিভ যে কি এখনও আমি জানি না। তবে হত্যাকারী কিভাবে কাজ গুছিয়েছিল তা আমি মোটামুটি মনের মধ্যে সাজিয়ে ফেলতে পেরেছি। চোকসি সাহেব তাকে চিনতেন কাজেই সে প্রথমে নিজের চেহারা পাল্টে ফেলবার ব্যবস্থা করল। রতনলাল জেঠানী একজন ভাল মেকআপ ম্যান। তার সাহায্যে সে নিজেকে মধ্যবয়স্ক শিখে রূপান্তরিত করে ফেলল। সেদিন গুজরাট মেলে একেবারেই ভিড় ছিল না। সে সহজেই এয়ার কন্ডিশন কম্পার্টমেন্টের একটা বার্থ সংগ্রহ করে নিতে পারল। কণ্ডাক্টার জেগে থাকলে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে—তাকে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল।

একটু থেমে বাসব আবার বলল, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এর পরই আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি। কারণ একজনের পক্ষে একই সঙ্গে রয়েছে এমন দুজনকে খুন করা কিভাবে সম্ভব হল বুঝতে পাচ্ছি না। যাহোক, কাজ শেষ করার পর সে চমৎকার একটা চাল চালল। শুধু মেহতার মৃতদেহ ফেলে দিল জঙ্গলাকীর্ণ একটা জলা জায়গায়। ওই জায়গাটার অবস্থান রেওয়াড়ি স্টেশনের একটু আগে। পুলিশ হত্যাকারী হিসাবে মেহতাকে খুঁজে বেড়াবে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সে রেওয়াড়ি স্টেশনে নেমে গেল। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে এল দিল্লীতে। রতনলালের কাছে গিয়ে মেকআপ তুলিয়ে নিজের আস্তানায় পৌঁছাতে আর কোন অসুবিধাই রইল না।

বাসব থামল।

অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল পার্লারে। দুজন বেয়ারা চা পরিবেশন করে গেল। রেখে গেল কেক, স্যানডুইচ ইত্যাদি। পেয়ালা তুলে নিল সকলে।

এক চুমুক দেবার পর, পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাসব সেই চরম প্রশ্ন করে বসল, আপনি একাজ কেন করতে গেলেন প্রেমবাবু?

প্রেমকিশোরের পেয়ালায় চা চলকে উঠল। মুখের রক্ত যেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। সে কাঁপা-গলায় বলল, আমায় বলছেন—

—অভিনয় করে লাভ নেই। আপনি ধরা পড়ে গেছেন।

—দাদা! তুমি—

—রিণা ভেঙ্গে পড়ল।

—একাজ তুমি কেন করলে—কেন করলে—

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, একটা নয়, দু-দুটো খুন করার মত নার্ভ আপনার আছে। বাসব বলল, প্রেমবাবু বলুন, কেন আপনি এইভাবে রক্তে হাত ডোবালেন ?

নিজেকে সামলে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে প্রেমকিশোর বলল, তার আগে জানতে চাই কি প্রমাণ আপনি আমার বিরুদ্ধে সংগ্রহ করেছেন ?

—একটা নয়। একাধিক। রতনলাল আপনাকে সনাক্ত করবে। বিনোদ মেহরার কাছ থেকে আমি আপনার ইংরাজী হাতের লেখা সংগ্রহ করেছিলাম। রিজার্ভেশন স্লিপের লেখার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে মিলিয়ে দেখেছি—দুটো হাতের লেখাই আপনার। দারোয়ান আমায় বলেছে, সেদিন ভোররাত্রে আপনি বাড়ি ফিরেছেন। বাকি রাতটা কোথায় ছিলেন তার সন্তোষজনক উত্তর আপনি দিতে পারবেন না। আপনার বাবার ছোরাটা এই বাড়ি থেকে নিশ্চয় বাইরের কারুর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে জোরাল প্রমাণ কি জানেন, পৃথ্বীপাল সিংএর যে হাতের ছাপ নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে আপনার ছাপ মিলে যাবে।

রিণা কাঁদছে। দুই হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে কাঁদছে সে।

এখন ঠিক কি করা কর্তব্য স্থির করতে না পেরে রাহুল সচকিত ভাবে তাকিয়ে আছে বাসবের দিকে। শৈবাল কম বিস্মিত নয়। রক্তাক্ত নাটকের পরিণতি এই হবে কল্পনাও করতে পারিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল প্রেমকিশোর। নিজের লম্বা চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে আঙুল চালিয়ে নিল কয়েকবার। প্রায় মিনিট-দুয়েক কারুর মুখে কোন কথা নেই।

শেষে ক্লান্ত গলায় প্রেমকিশোর বলল, আপনি বেওয়ারি গেছেন জানতে পারার পরই কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারব না। বলতে গেলে তখন থেকেই মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে আছি। বিশ্বাস আপনি করবেন না তবু বলছি, বাবাকে খুন করতে আমি চাইনি ব্যাপারটা আচম্বিতেই ঘটে গেছে। আপনি শুনেছেন, আমি বা রিণা কেউই পছন্দ করতাম না বাবার বে-আইনিভাবে টাকা রোজগারের প্রয়াসকে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে মুখ খোলার সাহস ছিল না। বেনামীতে দুটো চিঠি দিলাম ওপথ থেকে সরে আসার জন্য। তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বরং বড় ধরনের চোরাকারবারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই সূত্রেই বম্বে যাচ্ছিলেন। স্থির করলাম ছদ্মবেশে মেল ট্রেনের মধ্যেই তাঁকে প্রচণ্ড ভয় দেখাব। বলব ও পথ থেকে সরে না এলে তাঁর মেয়ে আর ছেলেকে খুন করা হবে।

প্রেমকিশোর থামল। কারুর মুখে কথা নেই। রিণা ভেজা চোখে

তাকিয়ে আছে তার দাদার দিকেই। প্রেম আবার এসে বসল নিজের চেয়ারে। ওর ফ্যাকাসে মুখ কিছুটা লোহিত হয়ে এসেছে।

আবার বলতে আরম্ভ করল, সেদিন সন্ধ্যায় আমি ওঁকে টেলিফোন করে সাবধান করেছিলাম। উনি কান দিলেন না। রওনা হলেন স্টেশনে। আমিও ছদ্মবেশে পৌঁছালাম। তখনও জানিনা বাবার সঙ্গে ওম মেহতাও চলেছে। কনডাক্টারকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পর বাবার কুপেতে গেলাম। উনি তখন বার্থের উপর বসে কি একটা পড়ছিলেন। আর কেউ ছিল না। ছোরা হাতে একজনকে প্রবেশ করতে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। যদিও আমাকে চিনে ফেলার কোন উপায় ছিল না। তবু গলার স্বর পাল্টে তাঁকে ধমকালাম। পরের স্টেশনে নেমে বাড়ি ফিরে না। গেলে ভীষণ বিপদে পড়বেন একথাও বললাম। বিশ্বাস করুন মিঃ ব্যানার্জী, তারপরই সেই সঙ্গীন মুহূর্ত দেখা দিল। বাবা কেন যে একাজ করতে গেলেন জানিনা। তিনি লাফিয়ে পড়ে আমাকে জাপটে ধরতে গেলেন—ছোরা আমার হাতে ধরা ছিল, গেঁথে গেল তাঁর বুকে। সে এক অকল্পনীয় পরিস্থিতি। তাঁর ভারি শরীর গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। কয়েকবার ছটফট করলেন। তারপর সমস্ত স্থির।

কান্না আমার গলায় দলা পাকিয়ে এল। তখন অবশ্য আর কিছু করবার ছিল না। ঠিক এই সময় কুপেতে প্রবেশ করল ওম মেহতা। সে নিশ্চয় বাথরুমে গিয়েছিল। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মেহতা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেই ঝটিতে পিছনে ফিরল। করিডরে গিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করাই বোধহয় তার উদ্দেশ্য ছিল। ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে আমি সজাগ করে তুললাম। মেহতা চিৎকার করলে আমার আর বাঁচার উপায় থাকবে না। তখন একমাত্র যা করনীয় ছিল তাই করলাম—তার ঘাড়ের নিচে ছোরাটা বসিয়ে দিলাম নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে। এত বড় লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। ভাবাবেগ কে প্রশ্রয় দিলে চলবে না বুঝতে পেরেছিলাম। দ্রুত প্ল্যান স্থির করে ফেললাম। রেওয়ারি স্টেশানের আগে ওই জলাটা আমার জানা ছিল। ওই জায়গাটার কাছাকাছি ট্রেন পৌঁছাতেই, সংর্কতার সঙ্গে মেহতাকে বয়ে নিয়ে গেলাম একধারের দরজার কাছে। তারপর তাকে ফেলে দিলাম নিচে। আমার যুক্তি ছিল যদি মেহতার বডি জলার মধ্যে তলিয়ে যায়, তবে পুলিশ তাকেই বাবার হত্যাকারী হিসাবে খুঁজবে। এই হল প্রকৃত ঘটনা।

বাসব বলল, রেওয়ারি স্টেশন থেকে আপনাকে ফলো করে কে রতনলালের দোকান পর্যন্ত গিয়েছিল জানেন।

—তখন জানতে পারিনি। আজই দুপুরে জেনেছি। বেদপ্রকাশ।

তাকে নাকি চৌহান নিযুক্ত করেছিল আমাকে খুন করার জন্ত। উদ্দেশ্ত রিণাকে বিয়ে করে বাবার সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব পাওয়া। ওয় মেহতার উপস্থিতি দুজনকে বিচলিত করে তোলে। ওরা মেহতার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রেখে বুঝতে পারে সে বাবার সঙ্গে বন্ধে যাচ্ছে। উদ্দেশ্ত নিশ্চয় মহৎ নয়। টাকার গন্ধ আছে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্ত চৌহান বেদপ্রকাশকে পিছু লাগিয়ে দেয়। আমি একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। মেকআপ নেবার পরও নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম স্টেশনে। উদ্দেশ্ত ছিল, বাবাকে ভরটয় দেখিয়ে ফিরে আসার পর মেকআপ তুলে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যাব। টাকা পেলেই ছোকরা পাওয়া যায় গাড়ি পাহারা দেবার। আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল বেদপ্রকাশ। এই গাড়ি যে আমার তার অজানা ছিল না। আমার জায়গায় একজন শিখকে দেখে সে সন্দেহ-প্রবণ হয়ে পড়ে। তারপর আমি একটা ফ্লাস্ক কিনি, কফি ভরাই। কাছের একটা দোকান থেকে ঘুমের ওষুধ কিনি, সমস্তই সে লক্ষ্য করে। আমার চালচলন এবং সাজপোশাক তাকে আরো সন্দেহাকুল করে তোলে।

অবশ্য সে পরে এসমস্ত কথা ইচ্ছে করেই চৌহানকে জানায়নি। এয়ার-কণ্ডিশন কামরার পাশের কামরাটাতে বেদপ্রকাশ উঠে পড়ে। সজাগ থাকার দরুন আমি যখন মেহতাকে ফেলে দি—কিছু দেখতে না পেলেও শব্দ সে পেয়েছিল। তারপর রেওয়ারিতে আমাকে নামতে দেখে সেও নেমে পড়ে। অনুসরণ করে যায় রতনলালের দোকান পর্যন্ত। আমি যখন মেকআপ তুলে বেরিয়ে আসছি তখন আর তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পরের দিন খুনের কথা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদপ্রকাশ বুঝতে পারে এই রক্তাক্ত ব্যাপারে আমার বিশেষ ভূমিকা আছে।

—আজ এই সমস্ত কথাই শুধু সে বলতে এসেছিল ?

—না। বলার পর আমার কাছে সে এক প্রস্তাব রেখেছে। এক লক্ষ টাকা না দিলে সে সমস্ত কথা পুলিশকে জানাবে।

—আপনি কি বলেছেন ?

টাকার ব্যবস্থা করতে গেলে সময় লাগবে, এ কথাই বলেছি।

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। মন্থর পায়ে এগিয়ে গেল টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে। রিসিভার তুলে নেবার পরই এক নাটকীয় ব্যাপার ঘটে গেল। রিণা দৌড়ে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরল। ভেঙ্গে পড়ল কাকুতিতে।

—না—না—পুলিশকে আপনি কিছু জানাবেন না মিঃ ব্যানার্জী—আপনি জানেন না বাবাকে দাদা কত ভালবাসতো—

—কিন্তু—

—অনিচ্ছাকৃত অপরাধের পরও প্রচণ্ড অনুতাপে ডুবে রয়েছে একজন মানুষ, তাকে কি ক্ষমা করা যায় না। দয়া করে একটা কথা ভাবুন। দাদার কিছু হলে আমার নিজের বলতে আর কেউ থাকবে না।

রাহুলও তৎক্ষণে এসে পড়েছে।

দ্রুত গলায় সে বলল, এত বড় পরিবারের মানসম্মান—সমস্ত কিছু এখন আপনার হাতে। আপনিই পারেন সবদিক সামাল দিতে।

শৈবাল এগিয়ে এল এবার।

বাসব বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাল।

—ডাক্তার তুমিও কিছু বলবে?

—না বলে থাকতে পারছি না ভাই। শৈবাল বলল, মানবিক দিকটা বোধহয় এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। তোমার অবস্থা আমি উপলব্ধি করছি। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কিন্তু আর কোন গোলমাল থাকে না। পুলিশ ওম মেহতাকে হত্যাকারী বলে জানে, তুমি তাকেই ধরতে এসেছিলে—

—আমি তাকে ধরতে পারলাম না। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সে মিশে গেছে, এই বলতে চাইছো তো?

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—বেশ। সকলে যখন চাইছেন তখন তাই হোক। ওম মেহতা পড়ে থাকুক জলার কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে। দিল্লী পুলিশ অবশ্য আমার এই ব্যর্থতায় খুশি হবে। হোক। কি আর করা যাচ্ছে।

রিণা বলল, ধন্যবাদ মিঃ ব্যানার্জী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার এই উপকারের কথা মনে রাখব।

—কিন্তু বেদপ্রকাশ—রাহুল বলল, সে তো···মানে—

—পুলিশের খাতায় তার নাম আছে। দাগী চরিত্র। ভয় দেখিয়ে দিলে সে আর কিছু করতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

পার্লারে পরিপূর্ণ স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হল যেন। প্রেমকিশোর তখনও একইভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মনের ঝড় থিতিয়ে আসছে কিনা কে জানে। বাসবের মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। এতক্ষণ পরে আবার সে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বনময়ূরী মনময়ূরী

পেটা-ঘড়িতে সশব্দে সাতটা বাজল।

সকাল সাতটা।

শব্দের রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন দেবী দত্ত। বেঁটেখাটো, স্বাস্থ্যপুষ্ট দেবী দত্তর পুরো নাম হল দেবপ্রসাদ দত্ত। কিন্তু লোকে তাঁর নাম ছোট করে নিয়েছে। তাঁর ছোট নামেই এখন তিনি সকলের কাছে পরিচিত।

পেশায় চিকিৎসক।

তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন না।

কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরুবার পরই জেল বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর কত বছর কেটে গেছে। তরুণ দেবী দত্ত এখন প্রৌঢ়। প্রদেশের নানা জেলে আনাগোনা করেই নিজের কর্মজীবন কাটাচ্ছেন। বর্তমানে ডিভিশনাল টাউনের সেনট্রাল জেলের সঙ্গে যুক্ত। হয়তো এখান থেকেই কাজে অবসর নেবেন।

জেলের প্রধান কর্মকর্তা সেন সাহেব ঘরেই ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেবী দত্ত বললেন, ভোর বেলাতেই তলব, ব্যাপার কি?

অভিজ্ঞ জেলার সেন সাহেব নিভন্ত সিগারে একবার ব্যর্থ টান দিয়ে বললেন, আপনি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন ডাক্তার। ন'টার সময় এলেও চলত।

কোন কয়েদী আজ খালাস পাবার কথা আছে নাকি?

হ্যাঁ। ৩২৩ আজ খালাস পাবে।

দেবী দত্ত বললেন, অবশ্য নিয়ম মত তাকে পরীক্ষা করব। অত্যন্ত ভাল স্বাস্থ্য তার। আমি এখানে এসেছি প্রায় বছর চারেক, এর মধ্যে কখনও রোগে পড়তে দেখিনি ওকে।

সেন সাহেব নিভন্ত সিগারটা ধরিয়ে নিলেন। বললেন, ৩২৩-এর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি আর অবাক হয়ে যাই। এখন ৩২৩ নম্বরই হল লোকটার একমাত্র পরিচয়। অথচ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিল ও। জেলে আসবার পূর্বে প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছে।

গলা ঝেড়ে নিয়ে দেবী দত্ত বললেন, অর্থশালী ব্যক্তিরাই অনেক ক্ষেত্রে পাপ বেশি করে মিস্টার সেন। শুনেছি, লোকটা নিজের স্ত্রীকে খুন করে

বিশ বছর জেল খাটছে। চলুন, ৩২৩-এর শরীর পরীক্ষার কাজ সেরে নিই গিয়ে।

ব্যস্ততার কিছু নেই। বেওজোরে এখনও দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করা চলতে পারে।

সেন সাহেব মজলিশি লোক; গল্প করতে ভালবাসেন। ভালবাসেন নিজের জীবনে যা কিছু দেখেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা পরকে শোনা'তে। বহুবার বহু গল্প সেন সাহেবের মুখ থেকে শুনেছেন দেবী দত্ত। শোনবার মত রোমাঞ্চকর গল্প সেগুলি। সেন সাহেব নিজের দীর্ঘ চাকরি জীবনে কত বিচিত্র মামলার আসামীকে দেখেছেন। কত পাশব মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন। কত নিরপরাধ ব্যক্তি অন্যের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে বছরের পর বছর ঘানি টেনেছে— তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই সমস্ত তথ্যকে গল্পের মত পরিবেশন করেছেন অন্যের কাছে জেলার সুখময় সেন।

'সেন সাহেব' খেতাবটি তাঁকে দিয়েছিল কোন এক কয়েদী। সেও বহু বছর আগেকার কথা। সেই থেকে তিনি ওই নামেই প্রসিদ্ধ। কয়েদীরা তাঁকে ভয় করে, কিন্তু সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সকলে জানে গম্ভীর, নিরেট অবয়বের আড়ালে আছে একটা স্নেহশীল মন।

সেন সাহেব আবার বললেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না ডাক্তার দত্ত, পাপের পথে নেমে যাওয়া যে-কোন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডাক্তার, মানুষ অনিচ্ছার সঙ্গে, বাধ্য হয়ে বা অনন্যোপায় হয়ে পাপের পথে নেমে এসেছে।

আপনার কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু···

আমি জানি, আপনি কি বলতে চাইছেন। বছরের পর বছর যারা জেলের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই হয়তো অপরাধী নয়। অনেকে ষড়যন্ত্রের দরুন অথবা বিচার বিভ্রাটে পড়ে নিরপরাধ হয়েও জেল খাটতে আসে। আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে এরকম কত দেখলাম। হয়তো আরো কত দেখতে হবে।

দেবী দত্ত বললেন, ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠানো ও বিচার বিভ্রাটের কত গল্পই শুনেছি। আমার ধারণা ৩২৩ও বোধ হয় এই ভাবেই জেলে এসেছে। তার মত শান্ত, ভদ্র, অভিজাত কয়েদী আমি জীবনে দেখিনি।

সেন সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারে দীর্ঘ টান দিলেন।

পীতাভ ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল নাক-মুখ দিয়ে। তিনি বললেন, ৩২৩ শান্ত, ভদ্র এবং অভিজাতও বটে; কিন্তু নিরপরাধ নয়। ষড়যন্ত্র করে কেউ তাকে জেলে পাঠায় নি। সে সত্যিই তার স্ত্রীকে খুন

করেছিল, এবং অন্তত দু'জন লোকের সামনে। তবে আমার ধারণা, আমি বা আপনি যদি ৩২৩এর জায়গায় থাকতাম, আমরাও সেই মহিলাটিকে খুন করতে বাধ্য হতাম।

সবিস্ময়ে দত্ত বললেন, কেন?

আপনার এই কেনর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয় ডাক্তার। প্রকৃতপক্ষে বিরাট এক কাহিনী বর্ণনা করতে হয়। তখন আপনি প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারবেন, কি রকম শোচনীয় মনের অবস্থার আওতায় পড়ে নিজের স্ত্রীকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল ৩২৩।

দত্ত ঘড়ির দিকে তাকালেন, মিনিট পনেরো অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র। বললেন, আপনি জানেন নাকি, পুরো ঘটনাটা?

জানি বইকি! কয়েদীদের জীবনী সংগ্রহ করা আমার একটা হবি দাঁড়িয়েছে বলতে পারেন। কোর্টের নথিপত্র এবং ৩২৩-এর মুখ থেকে সমস্ত কিছু আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিয়েছি।

কোন অসুবিধা না থাকলে বলুন না ঘটনাটা, শুনি। তাছাড়া সময়ও রয়েছে হাতে।

সেন সাহেব তো তাই চান।

লোকে তাঁর কাছে গল্প শুনুক। তিনি চিত্তাকর্ষক ভাষায় গল্প বলে নিজের মনকে তৃপ্ত করে তুলুন।

অসুবিধার আর কি আছে। ৩২৩এর জীবনী উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ। আমার স্মৃতির ভাঁড়ারে এরকম কাহিনী আর একটিও নেই।

সেন সাহেব সিগার টান দিতে গিয়ে দেখলেন নিভে গেছে; ধরিয়ে নিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, ঘন হয়ে বসলেন দত্তর কাছে। বলতে আরম্ভ করলেন। ৩২৩-এর পিতৃদত্ত নাম হল রাজীব মজুমদার…

•

সোনার চামচ মুখে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল রাজীব।

জন্মদাতা রাখাল মজুমদার ছিলেন প্রখ্যাত ধনী। জমিদারী ও পাটের ব্যবসা করে তিন-পুরুষ ধরে বড়লোক তাঁরা। প্রচুর প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হতে লাগল রাজীব। শিবরাত্রির সলতের মত বংশে সেই একমাত্র জলছে এখন। রাখালের পর পর চারটি ছেলে মারা যাবার পর রাজীবের জন্ম। এমন কি অন্যান্য ভাইদেরও কোন ছেলে নেই।

রাখাল মজুমদাররা তিন ভাই। যদিও পৃথক অন্ন—পৃথক বাড়িতে বাস, তবে একই ব্যবসায় তিনজনের মূলধন খাটছে। সকলেই রাজীবকে স্নেহ করেন। তাঁদের তিনজনের ওই একমাত্র ওয়ারিশন।

শশীকলার মত রাজীব বড় হতে লাগল।

প্রশ্রয়ের আওতায় থেকে থেকে তার নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটল না। ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যথাসময় ম্যাট্রিকের দরজা রাজীব অতিক্রম করল। তারপর কলেজের পালা।

কলেজ জীবনে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে দুটি আঘাত রাজীবকে বিভ্রান্ত করে তুলল। প্রথম, মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ছোটকাকা। দ্বিতীয়, ওই ঘটনার তিনমাস পরে অফিসের কাজে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন রাখাল। সেখানেই হার্ট ফেল করে মারা গেলেন হঠাৎ।

এই দুই আঘাতে রাজীবের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবু সে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গেল। যোগ্যতার সঙ্গে গ্র্যাজুয়েট হল।

মেজকাকা বললেন, বিলেত ঘুরে আয়।

কি হবে বিলেত গিয়ে?—নিরাসক্তভাবে উত্তর দিল রাজীব।

জুট টেক্‌নোলজির ডিগ্রীটা নিয়ে আসবি। দাদার খুব ইচ্ছে ছিল তোকে বিলেত পাঠাবার।

বেশ, আমি যাব বিলেত। বাবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই পূর্ণ করব।

তাহলে সমস্ত বিলিব্যবস্থা করি। তবে একটা কথা তোকে দিতে হবে বাবা···, কথা শেষ না করে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন মেজকাকা।

মৃদু হেসে রাজীব বলল, কি হল! থেমে গেলে কেন—বলো?

নিজের ইতস্ততঃ ভাবকে কাটিয়ে মেজকাকা বললেন, আজকাল বিলেতে গিয়ে যেন মেম বিয়ে করে আনার একটা হিড়িক পড়ে গেছে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে। তুই যেন মেম বিয়ে করে আনিস না।

এবার জোরে হেসে উঠল রাজীব।

এত ভয় যখন তোমার, নাই-বা আমাকে পাঠালে বিলেত।

ভয় নয়, আমি জানি আমাদের বাড়ির ছেলে কখনই এমন কাজ করবে না—যা বংশমর্যাদার পক্ষে হানিকর। বিলেত থেকে ফিরে এলেই তোর বিয়ে দেব, মেয়ে ঠিক করাই আছে।

মেয়ে ঠিক করা আছে!—প্রবল আগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও রাজীব আগ্রহ প্রকাশ করল না ও-সম্পর্কে।

মেজকাকা নিজেই বললেন, আমাদের গ্রামের বাচস্পতিকে চিনিস?

না। কে তিনি?

একজন পণ্ডিত মানুষ। মেয়েটি তাঁরই। মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। নিজেদের গ্রামে তো কোনদিন গেলি না—কাকেই বা চিনবি তুই!

রাজীব আর কিছু বলল না।

মেজকাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাবা মায়া যাবার

পর তিনি তাকে পিতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন। সামান্য জর ভাব করলে শহরের সমস্ত সেরা ডাক্তারদের জড়ো করেন। দুর্ভাবনা আর ব্যস্ততার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছোন। শুধু তিনিই যে রাজীবের জন্যে অস্থির হন তা নয়, রাজীবও মেজকাকাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

সুতরাং বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করবার কথা সুদূর কল্পনাতেও সে মনে স্থান দিতে পারে না। এক এক সময় ভেবেছে রাজীব, বাঙালীর ছেলেরা ইংলণ্ডে গিয়ে কিভাবে মেম বিয়ে করে। কি ভাবেই বা বিয়ে করবার আগে তাদের সঙ্গে কোর্টশিপ চালায়, অথবা কোর্টশিপ আরম্ভ করবার আগে ওই সমস্ত শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপের সূত্র খুঁজে নেয়!

মনে মনে তাদের প্রশংসা করে ও।

রাজীব আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী মেয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করে উঠতে পারে নি। সতর্ক ভাবে তাদের এড়িয়ে চলবার জন্যেই সব সময় ব্যস্ত থাকে সে। যদি কখনো ঘটনাচক্রে কারুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় কিংবা আলাপের সূত্রপাত ঘটে—রাজীব ঘেমে নেয়ে ওঠে। কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে। কেন যে এরকম হয়, সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। অথচ স্বপ্নে কত সুকুমারীর সঙ্গেই তো সে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করবার চেষ্টা করে!

কোন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে নি অর্থে, কোন অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে তাও নয়। আসল কথা হল সমস্ত নারী জাতটাকেই এড়িয়ে এসেছে সে সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার পর থেকেই।

রাজীবকে কোন ব্যস্ততার মধ্যে পড়তে হল না। মেজকাকাই সমস্ত ব্যবস্থা করলেন।

পাসপোর্ট, প্যাসেজ—সমস্ত কিছু।

নির্দিষ্ট দিনে রাজীব কলকাতা থেকে বম্বের পথে যাত্রা করল। বম্বে থেকে জাহাজে উঠবে। যাত্রা করবার পূর্বক্ষণে বাবার কথা রাজীবের মনে পড়ল। আজ তিনি বেঁচে থাকলে কত আনন্দিত হতেন। বংশের মধ্যে প্রথম সে জ্ঞান আহরণের জন্য চলেছে বিদেশে।

মেজকাকা ঠিক পথেই চালিত করেছেন তাকে।

বিরাট জুটমিল রাজীবদের। মাইনে দিয়ে যতই এক্সপার্ট রাখা হোক, তবু নিজেদের ও-সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকাটা সমীচীন বৈকি! বিলেত থেকে ফিরে কারখানাটাকে ঢেলে সাজাবে রাজীব। ব্যবসা আরো বাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

যথাসময়ে বম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ল।

আরো অনেক ছাত্রের সঙ্গে রাজীবও কয়েক বছরের জন্য দেশের কাছ

থেকে বিদায় নিল।

বছরখানেক কেটে গেছে।

রাজীব ইংলণ্ডে পড়াশোনা করছে। আরো কিছুদিন তাকে এখানে থাকতে হবে। অধ্যাপক মহলে তার সুনাম হয়েছে। তাঁদের ধারণা এই ভারতীয় ছাত্রটি পরীক্ষার ফলাফলে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেবে। নিজের সম্বন্ধে রাজীবেরও গভীর আস্থা আছে। সাধারণ ভারতীয় ছাত্ররা যে অঞ্চলে এসে বাসা বাঁধে, রাজীব সেখানে ঘর নেয়নি। তার আস্তানা লণ্ডনের অভিজাত পাড়ায়। হাউস লেডিটি ভাল, তার সমস্ত সুখ সুবিধার ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

হাউস লেডি জাতে ইটালিয়ান।

তাঁর ধারণা ছিল, সমস্ত সুখ-সুবিধার ওপর দৃষ্টি রেখে ও নিত্য-নতুন মুখরোচক খাবার খাইয়ে রাজীবকে তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলবেন। তারপর মিলানে অবস্থানকারিণী মেয়েকে ডাকিয়ে আনিয়ে জুড়ে দেবেন এই সুরূপ ধনী ভারতীয়টির সঙ্গে। হাউস লেডি সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলেন, রাজীব ধনী পরিবারের ছেলে।

মা'র চিঠি পেয়ে মিলান থেকে এল লিণ্ডা।

লাস্যময়ী তরুণী।

রাজীব বিব্রত হল। সে মোটেই ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করল না লিণ্ডার সঙ্গে। ইটালিয়ান মেয়েটি হাল ছাড়বার পাত্রী নয়। সহজে সুবিধা করতে না পেরে ছলাকলার বান ডাকিয়ে দিয়েছিল। দৃঢ় মনে সমস্ত প্রলোভনকে জয় করেছিল রাজীব। তার অজানা নয়, একটু দুর্বলতা প্রকাশ করলেই ফাঁদে পড়ে যেতে হবে—লিণ্ডাকে বিয়ে করে দেশে ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তখন।

মেজকাকাকে যে কথা দিয়ে এসেছে, তার মূল্য তখন থাকবে কোথায়?

রাজীব স্থির করে ফেলল বাড়ি বদল করবে।

এখানে বেশিদিন থাকলে দুর্বল হয়ে পড়তে কতক্ষণ? তাছাড়া লেখাপড়াও লাটে উঠবে। জুট-টেক্‌নোলজিস্ট আর হওয়া যাবে না।

হাউস লেডিকে রাজীব পরিষ্কারভাবেই বলল, আমার পরীক্ষা সামনে। মন দিয়ে যদি আমাকে লেখাপড়া আপনারা করতে দেন, তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। নয়তো আমাকে বাড়ি পাল্টাতে হবে।

হাউস লেডি মিসেস ব্রাউন বিশেষ ব্যস্ত হলেন।

না-না, সেকি কথা। মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে বইকি, বাড়ি বদলাতে যাবে কোন দুঃখে। আমি লিণ্ডাকে বলে রাখব না হয়, তোমার পরীক্ষা না হওয়া অবধি তোমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সাধের পরীক্ষা দিয়ে উঠতে পারল না রাজীব।

এক মর্মন্তুদ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায়, সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে তাকে দেশে ফিরে আসতে হল। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই ঘটনাটা ঘটল। উইক এণ্ডের অবকাশে রাজীব লণ্ডনের বাইরে গিয়েছিল—একটা মোটর ভাড়া নিয়ে চলে গিয়েছিল, শহর থেকে মাইল চল্লিশ দূরের এক গ্রামে।

শিক্ষায়তনের এক অধ্যাপকের বাড়ি ওখানেই। অতিথি হয়েছিল তাঁর বাড়িতে।

দিন দুয়েক ওখানে কাটিয়ে রাজীব লণ্ডনে ফিরল।

মিসেস ব্রাউন তার হাতে একটা কেব্‌ল এনে দিলেন। বললেন, কাল সন্ধ্যার দিকে এসেছে।

কেব্‌ল! বিস্মিত হল। কেব্‌ল কেন!! তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে কেব্‌লখানা বার করল। তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিজেই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল রাজীব। কেব্‌ল করেছেন মামা। মেজকাকা আর নেই। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন তিনি। রাজীব অবিলম্বে দেশে ফিরে আসুক, সে-কথাও লিখেছেন।

লণ্ডনে রাজীবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে দেশে ফিরল।

অত্যন্ত নিজের বলতে তার মেজকাকা ছাড়া আর কেউ ছিল না পৃথিবীতে; তিনিও বিদায় নিলেন। প্রথমে বাবা, তারপর ছোটকাকা শেষে মেজকাকা—সকলেই চলে যাবার পর রাজীব এখন বংশের একমাত্র প্রতিনিধি।

ক্রমে অশৌচান্ত হল। শ্রাদ্ধশান্তিও চুকে গেল। শোক তাপকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ-খাইয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হল রাজীব। এখন শোকে ডুবে থাকার সময়ও নয়—একটু অসতর্ক হলেই ব্যবসা ডুবে যাবে। স্বর্গীয় গুরুজনদের রক্ত-জলকরা পরিশ্রমের বিনিময়ে এই বিরাট ব্যবসা গড়ে উঠেছে। তাকে আরও বিরাট করে তোলাই তো এখন রাজীবের পণ হওয়া উচিত। সুতরাং—

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় রাজীব প্রথম দিন অফিসে এল। 'রোজ মেরি' জুটমিলের অফিস। ছোট আকারের 'রোজমেরি' জুটমিলটি কেনা হয়েছিল বছর ত্রিশ আগে এক বিদেশী ফার্মের কাছ থেকে। এখন সেই নামে মিলটি

থাকলেও আকার নিয়েছে বিরাট।

ডিরেক্টর চেম্বার খাঁ খাঁ করছে।

পুশ্ ডোর ঠেলে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাজীব। যেখানকার যা সমস্ত রয়েছে, শুধু কুশানযুক্ত রিভলভিং-চেয়ারে এই সময় নিয়মিত যিনি এসে বসতেন তিনি নেই। আর কোন দিন তিনি এসে বসবেন না। ধীর পায়ে এগিয়ে মেজকাকার চেয়ারে বসল রাজীব।

তার কর্মজীবন আরম্ভ হল। বিরাট রোজমেরি জুটমিলের সে এখন ভাগ্যবিধাতা। রাজীব চেয়ারে বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তারপর কলিংবেলে মৃদু চাপ দিল। বেয়ারা ঘরে প্রবেশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাড়াল সসম্ভ্রমে।

গুপ্ত সাহেবকে খবর দাও।

বেয়ারা দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

নরেন গুপ্ত মিলের প্রধান কর্মকর্তা। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারি। তিনি এলেন কয়েক মিনিটের মধ্যে। কিন্তু গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। নতুন প্রভুর কাছে যে রকম উৎফুল্লভাবে তাঁর আসা স্বাভাবিক ছিল—তাঁর মুখের ভাব সেরকম উজ্জ্বল নয়।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং। বসুন।

নরেন গুপ্ত বসলেন।

রাজীব বলল, এই চেয়ারে বসে মেজকাকা এতদিন মিলের শুভাশুভ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। তাঁর অবর্তমানে যদিও আমি এই চেয়ারে এসে বসেছি, তবু আপনাকে নির্দেশ দেওয়ার মত অর্থাৎ মিল পরিচালনার সম্পর্কে কোন জ্ঞানই আমার নেই। আপনি দীর্ঘদিন যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন। মেজকাকা আপনাকে বিশ্বাস করতেন। আমি আপনাকে শুধু বিশ্বাসই করব না—নির্ভরও করব।

নরেন গুপ্ত বাস্তবতার সঙ্গে বললেন, আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি কোনদিন করব না স্যার। মিল সংক্রান্ত যে-কোন ব্যাপারে আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

দিন কয়েকের মধ্যে আমাকে একটা জেনারেল রিপোর্ট তৈরি করে দিন।

লেবার, প্রোডাকসন ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে বলছেন কি?

হ্যাঁ। আমার পক্ষে তাহলে সুবিধা হবে।

রিপোর্ট আপনাকে দিন চারেকের মধ্যেই দিতে পারব স্যার। তবে—

তবে কি মিস্টার গুপ্ত?

নরেন গুপ্ত নিজের সুচিক্কণ টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, লেবাররা হয়তো আজই একটা নোটিশ দেবে।

নোটিশ। রাজীব বিস্মিত ভাবে বলল, কিসের নোটিশ?

পূজায় একমাসের বোনাস ওয়ার্কারদের দেওয়া হয়। এবার ওরা দু মাসের বোনাসের জন্য দাবি জানাবে। নইলে—

নইলে ধর্মঘট করতে পারে, এই তো? আপনি এক কাজ করুন মিস্টার গুপ্ত, নোটিশ দেবার আগেই ইউনিয়ানের লিডারকে ডেকে জানিয়ে দিন, এবারে দু-মাসের বোনাস দেওয়া হবে।

বিস্মিত নরেন গুপ্ত তরুণ মিল-মালিকের দিকে তাকালেন।

লেবারদের এই ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক এবং কি পরিমাণে ঝুঁকি নেওয়া, তা তরুণ রাজীব মজুমদার বুঝতে না পারলেও তাঁর মেজকাকা বুঝতেন। সমস্ত মিলে তিনি একটা থমথমে ভাব বজায় রেখেছিলেন। তাঁর আমলে ধর্মঘটের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারত না। অথচ—

নরেন গুপ্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে লেবারদের ওপর করুণাপ্রবণ হওয়া যে সমীচীন নয়—তা নতুন ডিরেক্টরকে বোঝাতে অগ্রসর হলেন।

তিনি বললেন, এভাবে বোনাস বাড়িয়ে দিলে ওদের দাবী মেটানো কষ্টকর হয়ে উঠবে স্যার। প্রতি বছরই নিত্যনতুন বায়নায় ওরা অস্থির করে তুলবে।

আমি জানি—আমি জানি মিস্টার গুপ্ত।—রাজীব শান্ত গলায় বলল, চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে ওদের সঙ্গে গোলমালটা পাকিয়ে তুলতে চাই না। ভবিষ্যতে মেজকাকার দৃষ্টান্তই আমি অনুসরণ করব। যা হোক, আপনি ওই কথাই জানিয়ে দিন ওদের, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্টটা কমপ্লিট করে নিয়ে আসুন।

বোনাস প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়েও আর বললেন না গুপ্ত। রাজীবের কথায় সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন। রাজীব ঘণ্টা খানেক আরো রইল অফিসে। কাগজপত্র ওল্টালো-পাল্টালো। ঘরের একপাশে রাখা মিলের ব্রোঞ্জের মডেলটাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বাড়ি ফিরে গেল।

প্রথম দিনকার কাজ মোটামুটি এই ভাবেই শেষ করল রাজীব।

দিনের পর দিন গড়িয়ে চলেছে। গতানুগতিকতার ছকে বাঁধা পড়েছে রাজীবের জীবন। অফিস যায় আর বাড়ি আসে। এছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখে নি। কেন যে রাখে নি

তার উত্তর সে নিজেও জানে না। ওই একই কারণে ক্লাবে বা কোন সমাবেশে তার অনুপস্থিতি তীব্রভাবে প্রকট। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকতে যে রাজীবের ভাল লাগে, তা নয়।

এই বিরাট বাড়িখানা ততোধিক বিরাট হাঁ করে তাকে গিলে খাবার জন্যে সর্বদা যেন ব্যস্ত। মেজকাকার আমলে অনেক লোক ছিল বাড়িতে ; চাকর ও দারোয়ানের বাহিনী বাদ দিয়ে বাড়িতে বাস করতেন তখন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র খুঁজতে গেলে অবশ্য রীতিমত গবেষণা করতে হত।

তবু এ-বাড়িতে সকলে পরম আত্মীয়ের মতই ছিলেন।

রাজীব স্মরণাতীত কাল থেকেই তাঁদের রাজার হালে থাকতে দেখেছে। এক-এক সময় তার মনে হয়েছে, পৃথিবীতে কিছু মানুষ পরের ঘাড়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবার জন্যেই জন্মায়। এরা সেই দলের।

মেজকাকাকে বলেছে কতবার—কেন যে তুমি বছরের পর বছর এদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছ বুঝতে পারি না।

মেজকাকা সহাস্যে বলেছেন, সংসারে প্রবেশ করলে তুমি এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে রাজীব। ওরা আছে বলেই বাড়িটা ভরে রয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনের সময় ওদের সহযোগিতা কাজে লাগছেই।

রাজীব আর কিছু বলে নি।

রাজীব সংসারের হাল নিজের হাতে নেবার পর সমস্ত জঞ্জাল ঝেড়ে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। একপাল বুড়িকে কাশীর পথে রওনা করে দিয়েছে। অন্যান্যরাও অবস্থা বুঝে সরে পড়েছে কালবিলম্ব না করে। চাকর ও দারোয়ানবাহিনীকে কমিয়ে অর্ধেক করে এনেছে।

মাঝ থেকে সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

রাজীব খুশি হয়েছে। নিজের বাড়িতে জনারণ্যের জোয়ার হারিয়ে যাওয়ার ভয় আর নেই। কিন্তু মাস খানেক কাটতে না কাটতেই তার মনে হতে লাগল, এত নিঃসঙ্গতা সে হয়তো চায় নি।

ভীষণ ফাঁকা মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে বাড়িটা গিলতে আসছে তাকে।

এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল নরেন গুপ্তের সঙ্গে রাজীবের এই প্রবীণ অভিজ্ঞ কর্মচারিটিকে রাজীব শ্রদ্ধা করে। তিনি সসঙ্কোচে বলেছেন, আত্মীয়দের আবার ডেকে এনে বাড়ি ভরিয়ে ফেললে আপনার মনের নিঃসঙ্গতা যে দূর হবে, একথা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না স্যার।

আপনি বোধ হয় ঠিকই বলছেন। বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলে আবার হয়তো হাঁপিয়ে উঠব। কখনো কখনো আমার কি মনে হয় জানেন?

অল্প দিনের মধ্যেই মনিবের খেয়ালী স্বভাব সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে

উঠেছেন নরেন গুপ্ত। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

মনে হয়, যে কারণেই হোক আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন নৈনিতাল বা সিমলায় বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না—আপনি কি বলেন?

একটু ইতস্তত: করে গুপ্ত বললেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলতে পারি।

বেশ তো, বলুন না?

আপনার দ্বিগুণ বয়স আমার, স্বাভাবিক ভাবেই অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই বলছি, আপনি এবার বিয়ে করে ফেলুন।

বিয়ে!!

বিয়ে করার পর দেখবেন কোন অসুবিধাই আপনার হচ্ছে না, নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তভাব দুটোই চলে যাবে আপনা থেকে।

কিন্তু বিয়ে মানেই তো নিজের স্বাধীনতাকে অনেকখানি বিসর্জন দেওয়া।

প্রথমে তাই মনে হয়। বাবা যখন আমার বিয়ে স্থির করেছিলেন, আমারও মনে হয়েছিল এই কথা। বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর দেখুন, প্রায় কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়ে দিলাম। বেশ সুখেই কেটেছে বলতে গেলে। আমার স্বাধীনতায় স্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন, একথা কখনই বলতে পারব না। অবশ্য সকলের বিবাহিত জীবন যে সুখের হয় একথা বলছি না। আপনার ক্ষেত্রে সুখের না হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বড় ঘরে বিয়ে করবেন, রুচিশীলা, শিক্ষিতা স্ত্রী হবে। সুতরাং—

গুপ্ত ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাজীব। তারপর বলল, বিয়ে করার কথা তো এখনও চিন্তা করিনি মিস্টার গুপ্ত। তবে বিয়ে যে করব না, তা-ও নয়।

আপনার মেজকাকা আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন আমার সঙ্গে। তাঁর ইচ্ছে ছিল বিলেত থেকে ফিরে আসবার পরই আপনার বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

রাজীব ও-প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না।

আবার ফিরে গেল কাজকর্মের কথায়।

নরেন গুপ্ত যে কথাটা খুব অন্যায় বলেছেন, তা নয়। মনের অবচেতনে প্রথমে বিয়ে করার ইচ্ছেটাই হয়তো অঙ্কুরিত হয়েছিল, বুঝতে পারে নি।—এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয় তাই। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু আছে বলে রাজীব মনে করে না।

বয়স তার চব্বিশ। স্বাস্থ্যবান। রূপবানও বটে। শিক্ষিত। তাছাড়া

বিরাট ধনী।

বিয়ে করার ইচ্ছে মনের মধ্যে ছায়া ফেললেও, এই প্রসঙ্গ নিয়ে কখনও গভীরভাবে চিন্তা করেনি। নরেনবাবু কথাটা বলার পরই ঘুরে-ফিরেই ওই বিষয় নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে ভাল লাগছে রাজীবের।

কিন্তু এর মধ্যে বড় রকম একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হল, বিয়ে করবে কাকে? কিম্বা পাত্রী অনুসন্ধান করে দেবে কে? গুরুজনরা কেউ থাকলে এ প্রশ্ন উঠত না। তাঁরা যখন কেউ নেই, তখন বিষয়টা নিশ্চিতভাবে চিন্তা করবার মত।

রাজীবের মনের অবস্থা যখন এরকম—উৎপলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। উৎপল বাল্যবন্ধু। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছে। তারপর আর উৎপল পড়া চালিয়ে যায়নি। নিজেদের ওষুধের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছে। সৎ উপায়ে বা ব্ল্যাক করে যেভাবেই হোক উৎপলদের এখন অনেক টাকা। দু'জনের দেখা হল লিণ্ডসে স্ট্রীটে।

রাজীব নিউ মার্কেট থেকে কিছু কেনাকাটা করে ফিরছিল। উৎপল গিয়েছিল গ্লোবে টিকিট কাটতে। দু'জনের গাড়ি কার-পার্কের জায়গায় দু-মুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি। রাজীব নিজের গাড়িতে স্টার্ট নিতে যাচ্ছে, উৎপল তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, হ্যালো মজুমদার—

উৎপল, তুমি! উঃ, মনে হচ্ছে এক শতাব্দী পরে দেখা হল!

দুই বন্ধুতে অনেক মনের প্রাণের কথা হল। উৎপল পূর্ণোদ্যমে কোর্টশিপ চালিয়ে যাচ্ছে এক পিঙ্গল নয়নার সঙ্গে। এই বছরই বিয়ের পর্ব শেষ করে ফেলবার ইচ্ছে আছে ওদের। রাজীবের একঘেয়ে জীবন-যাত্রার কথা শুনে ও ক্ষেপে উঠল। বেশ জোর দিয়ে বলল, এইভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে নাকি! না-না, এ ভাল কথা নয়, টাকার ধান্দায় কে ঘোরেনা বলো? এই আমিই টাকা টাকা করে হন্যে হয়ে বেড়াই, কিন্তু মনের রিক্রিয়েশনের দিকে দৃষ্টি ঠিক সজাগ রেখেছি। তোমার বিরাট ব্যবসা অস্বীকার করি না—সেই কারণেই তো মাঝে মাঝে রিলিফের প্রয়োজন রয়েছে।

স্থান কাল ভুলে জোরে হেসে উঠল রাজীব। বলল, তোমার বক্তৃতা দেবার স্বভাব এখনও বদলায় নি দেখছি। কোথায় যাও শুনি রিলিফের উদ্দেশে; কোন বিলিতি ভাটিখানায় বোধ হয়?

না হে না, উৎপল ভটচাজ কোন বারে গিয়ে মাতলামি করেছে, এ-কথা তার কোন শত্রুও বলতে পারবে না।

তবে কোথায় শুনি?

যাই আমাদের সোসাইটি ক্লাবে। বলতে পার, যে ক'ঘন্টা ওখানে গিয়ে

কাটাই—মনে হয় যেন ইন্দ্রলোকে আছি।

বলো কি।

সকৌতুকে রাজীব বলল, তোমাদের সেই ইন্দ্রলোকটি কোথায় ?

লেক টেম্পল রোডে ডাক্তার দস্তচৌধুরী নিজের বাড়ির নিচের তলাটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাবের জন্যে। চলো, তোমাকে আজ সেখানে নিয়ে যাই।

আজই ?

অন্যত্র কোন এনগেজমেণ্ট আছে, সন্ধ্যার সময় ?

না, কোন এনগেজমেণ্ট নেই। বলছিলাম, আরেকদিন বরং—

আরেকদিন কেন, আজই বরং ভাল। আজ ওখানে একটা পারফরমেন্স আছে। নিয়মিত যারা আসে না, আজ তারা আসবে। অনেকের সঙ্গেই তোমার আলাপ হয়ে যাবে।

অনিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে ?

উৎপল আকাশ থেকে পড়ল !

ফানি। কি যা-তা বলছো!! আমি ওখানকার একজন কেউকেটা সদস্য। আমার গেস্টদের ইনভিটেশনের পরোয়া করার দরকার পড়ে না। আমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার অর্থই হল, তুমি সম্মানের সঙ্গে ইনভাইটেড। বাড়িতেই থেক, সন্ধ্যা ছ'টার সময় তোমাকে পিকআপ করে নেব।

রাজীবকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে উৎপল নিজের গাড়িতে স্টার্ট নিল।

ছ'টার কয়েক মিনিট আগেই উৎপল পৌছল রাজীবের বাড়িতে। বলল, দেখলে তো কত পাংচুয়াল আমি।

রাজীব ইভিনিং স্যুটে নিজেকে মুড়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবু গলায় সঙ্কোচের আমেজ মাখিয়ে বলল, ওখানে না গেলে কেমন হয় উৎপল ?

উৎপল পাল্টা প্রশ্ন করল, ওখানে গেলেই বা তোমার এমন কি ক্ষতি হবে রাজীব ?

পাগলামী ছাড়ো। আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য হল, হেসে আনন্দ করে এক সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে দেওয়া। তোমার কথা একেবারেই মনে ছিল না আমার, নইলে কবে টেনে নিয়ে যেতাম। মন-মরা হয়ে বাড়িতে বসে থাকবে দিনের পর দিন, তাও ওখানে যাবে না! এই ভাবে মনের কোণে বড় রকম অসুখ বাধিয়ে তুলতে চাও নাকি ?

রাজীব আর আপত্তি করল না, রওনা হল ওর সঙ্গে। বড় রকম কোন

মনের অসুখ পাছে বাধিয়ে বসে এই ভয়ে অবশ্য নয়। না যেতে চাইলে উৎপল যে তাকে সহজেই ঘন্টা পাঁচেক বক্তৃতার তোড়ে ভাসাতে পারে, এই ভয়ে।

সোসাইটি ক্লাবের নাম 'মিলনী'। অভিজাত তরুণ-তরুণীদের মিলন কেন্দ্র এই মিলনী। এখানে যে বর্ষিয়ানরা একেবারেই আসেন না তা নয়, আসেন। যাঁরা রসজ্ঞ তাঁরাই শুধু আসেন।

রাজীব আর উৎপল যখন ওখানে পৌঁছল, তখন ক্লাব একেবারে জমজমাট। রাজীব খুঁটিয়ে দেখল চতুর্দিকে।

হালকা নীল রঙের ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় বিরাট হলখানা মায়াময় হয়ে রয়েছে। অসংখ্য গদিমোড়া চেয়ার এখানে-ওখানে, অর্থাৎ প্রয়োজনের খাতিরে যে যেখানে পেরেছে নিয়ে গেছে। একপাশে বিরাট একটা পিয়ানো রাখা, অবশ্য মিউজিক টুলের ওপর কেউ বসে নেই।

প্লাইউডের সুদৃশ্য কাউণ্টার রয়েছে একপাশে। কাউণ্টারের এপাশে সারি সারি লম্বা পায়া চেয়ার। চেয়ারে অনেকে বসেছেন কাউণ্টারে হেলান দিয়ে। কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন দ্রুত হাতে গেলাস সার্ভ করে চলেছে। বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, এখানে পানীয় পরিবেশনের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। গরম পানীয়ই হয়তো। মিষ্টি গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কসমেটিকের গন্ধ। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি এখানে।

উৎপল আর রাজীবকে হলে প্রবেশ করতে দেখে একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। তরুণী তাকে বলা চলে না। উত্তরযৌবনা। রুচিকর সাজপোশাক তাঁর। চোখে মুখে চটক আছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই উৎপল বলল, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই মিসেস দত্তচৌধুরী—আমার বন্ধু রাজীব মজুমদার। রাজীব, ইনি হলেন ডাঃ দত্তচৌধুরীর স্ত্রী এবং আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি মিসেস রুমু দত্তচৌধুরী।

নমস্কার বিনিময় হল দু'জনের মধ্যে।

মিসেস দত্তচৌধুরী রুমু চৌধুরী নামেই খ্যাত। তিনি হাসি-মাখানো গোটা পাঁচেক প্রশ্নের মাধ্যমেই রাজীব ও উৎপলের কাছ থেকে জেনে নিলেন রাজীবের আসল পরিচয়। তারপর হলের মাঝখানে রাজীবকে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তরুণীরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে তাকাল। পুরুষদের চোখের তারা ঈর্ষায় কাতর। মনের মধ্যেকার প্রশ্নের ধরনটা একই রকম—এই রূপবান ধনী যুবক তাদের অনেককেই হয়তো অসুবিধায় ফেলবে।

ঘণ্টা দুয়েক রাজীবের ভালই কাটল।

এরপর এল ওখান থেকে বিদায় নেবার পালা।

উৎপলই তাকে নামিয়ে দেবে বাড়িতে। গাড়িতে উঠে বসবার পর সিগারেট ধরাল রাজীব। নেশা নেই; মাঝে মাঝে সিগারেট টানে। সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, এই সমস্ত জায়গায় এলেই বুঝতে পারা যায়, আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে।

তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতাকে পছন্দ করো নাকি?

আমি সে কথা বলিনি; নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তবে স্বাধীনতার নামে বাড়াবাড়ি করাকে সমর্থন করি না।

যাক, কাল আবার আসছ তো?

কাল আবার আসতে হবে?

উৎপল বলল, নিশ্চয়। সভ্যরা সকলেই তোমাকে পছন্দ করেছে। তাছাড়া না আসার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। কারখানা থেকে ফিরে এসে যে কোন রাজকার্য করো, তাও নয়।

ও-কথার কোন উত্তর না দিয়ে রাজীব বলল, আর অপেক্ষা করে লাভ কি? গাড়িতে স্টার্ট নাও।

নিরুর জন্যে অপেক্ষা করছি।

নিরু! সে কে?

আমার বোন নির্মলা। ওই যে পিয়ানোর ধারে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল।

মেয়েটি তোমার বোন নাকি?

উৎপল মৃদু হেসে বলল, ছোটবেলা থেকেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। কিন্তু কোনদিন তো আমাদের বাড়ি গেলে না, নির্মলাকে তাই তোমার অপরিচিতা বলে মনে হচ্ছে।

হিল তোলা জুতোর মৃদু শব্দ তুলে নির্মলা এলো।

জাম রঙের শাড়িতে তাকে মানিয়েছে চমৎকার। মনে হয় বয়স কুড়ির কানায়-কানায়। প্রগতিশীল সমাজের মেয়ে, নইলে এতদিনে তার ছেলের মা হয়ে যাবার কথা।

একটু দেরি হয়ে গেল দাদা। নির্মলা মিষ্টি গলায় বলল, কুমুদির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেরি হল।

সে পিছনের সীটে গিয়ে বসল।

গাড়িতে স্টার্ট নিয়ে উৎপল বলল, রাজীব তোমাকে চিনতেই পারে নি। সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ।

নির্মলা হাসির ঝলক তুলে বলল, তাই নাকি? ওঁকে কিন্তু মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। তুমি ইনট্রোডিউস করিয়ে দিয়েছিলে কি?

উৎপল জোরে হেসে উঠল—অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। এখন নিশ্চয় আর কোন গোলমাল নেই? রাজীব মজুমদারের সঙ্গে নির্মলা ভটচাজের আলাপ হয়ে গেল।

রাজীবও হাসল ওর কথা শুনে।

—এবার আমি একটা প্রস্তাব করব?

—করো না?

কোন হোটেলে গিয়ে তিনজনে ডিনার সেরে নিলে কেমন হয়? আপনি কি বলেন মিস ভাটচারিয়া?

নির্মলা বলল, খুব ভাল প্রস্তাব। তোমার কি মত দাদা?

তোমাদের সঙ্গে আমার একমত। কিন্তু ভাই রাজীব, নিরুকে 'আজ্ঞে' 'আপনি' করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবে, বুঝলে। এখন বলো কোন্ হোটেলে যাওয়া যায়?

গ্রেট ইস্টার্নে চলো!

গাড়ি গ্রেট ইস্টার্নের পথ ধরল।

পরের দিন ছিল শনিবার। মিল বন্ধ হয়ে গেছে দুপুরেই, তবুও রাজীবের বাড়ি ফিরতে সাতটা বেজে গেল। মিলে আরেকটা ব্লক বাড়ানো হবে। সেই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শেষ করে আসতে এত বিলম্ব হয়ে গেল। দশ মাইল পথ অতিক্রম করতেও অবশ্য কিছু সময় গেছে।

পোর্টিকোতে সনাতনের সঙ্গে দেখা হল। বাড়ির বুড়ো চাকর।

সে বলল, একজন দিদিমণি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

দিদিমণি!! রাজীবের আৎকে ওঠার মত অবস্থা হল। তার বাড়িতে দিদিমণি নাম্নী কোন জীবের আবির্ভাব হওয়া তো ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়!

কোথায় তিনি?

ঘরে বসিয়েছি।

রাজীব দ্রুত পায়ে ড্রইংরুমে গিয়ে উপস্থিত হল। সোফায় বসে নির্মলা এক মনে অ্যালবাম দেখছে। আজ ওর পরনে জাম রঙের বদলে মেরুন রঙের শাড়ি। সাজপোশাকে আরো জমজমে ভাব। নির্মলাকে দেখে রাজীব অবাকই হল বলা চলে, কারণ একদিনের আলাপে ও যে একাই এখানে এসে উপস্থিত হবে, ভাবা যায় না।

পায়ের শব্দ করেই ঘরে প্রবেশ করেছিল রাজীব।

নির্মলা মৃদু হেসে, অ্যালবাম মুড়ে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল।

কতক্ষণ এসেছ ?

হাল্কা গলায় নির্মলা বলল, আধ ঘণ্টাখানেক হবে।

আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেল একটু—রাজীব বলল। উৎপল কোথায় ?

দাদা আমাকে নামিয়ে দিয়ে কোথায় যেন গেল। আপনাকে আমি ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।

ধরে নিয়ে যেতে। কোথায় ?

ক্লাবে। এমনিতে যে ওখানে যাবেন না, কাল আপনার ভাব-ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

মৃদু হেসে রাজীব বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার মত মানুষের পক্ষে ক্লাব-লাইফ লিড করা বেশ কষ্টকর।

মোটেই কষ্টকর নয়। আসলে আপনি একটু কুনো লোক—দাদার মুখ থেকেই আমার শোনা।

ও! উৎপল আমার জারিজুরি প্রকাশ করে দিয়েছে বুঝি !···যাক্ ওকথা। চা খাবে তো ?

খেয়েছি ; আপনার চাকররা খুব কর্তব্যপরায়ণ। আপনি আর দেরি করবেন না, তৈরি হয়ে নিন।

মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগবে না আমার ; স্যুটটা বদলেই আসছি।

রাজীব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাটা ক্লাবে মন্দ কাটল না।

ওখান থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে আসার তাগিদ অনুভব করতে লাগল রাজীব। এতদিন জীবনের হাল্কা দিকগুলোকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছে। অথচ তার কোন অর্থ হয় না। তার মনের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে উৎপল উপযুক্ত পথের সন্ধানই দিয়েছে।

পূর্বকথা মত রাজীব পরের দিন সন্ধ্যায় নির্মলাকে তুলে নিল নিজের গাড়িতে ওর বাড়ি থেকে। আজ কিন্তু ক্লাবে যাওয়া হল না—যাওয়া হল না নির্মলার ইচ্ছেতেই। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে লেক টেম্পলের পথই ধরেছিল রাজীব।

নির্মলা বলল, আজ ক্লাবে না গেলে হয় না ?

রাজীব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নির্মলার শরীরের উগ্র কসমেটিকের গন্ধই বোধহয় তাকে বিমনা করে তুলেছিল।

কি বললে ?

বলছিলাম আজ ক্লাবে না গেলে কেমন হয় ?

আমার আপত্তি নেই। কোথায় যেতে চাও বলো ?

কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। কিছুক্ষণ গাড়িতেই ঘুরে বেড়ালে হয় না?

দশ সেকেণ্ডের ওপর নির্মলার রেখাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর রাজীব বলল, কেন হবে না। চলো, আমরা ব্যারাকপুর থেকে ঘুরে আসি। অনেকটা মোটরে ঘোরা হবে আমাদের।

মন্দ নয়—তাই চলুন।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জনারণ্য ছেড়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়তে রাজীবের বিলম্ব হল না। কারুর মুখে কথা নেই। দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটে চলেছে।

এক সময় রাজীব বলল, এত চুপচাপ। কিছু বলো।

এত জোরে গাড়ি চালাবেন না।

হেসে ফেলল রাজীব। গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, আমি গল্প-গুজোবের কথা বলছিলাম।

নির্মলা নিজের শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলল, ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর কলকাতাকে নিশ্চয়ই আপনার খুব পান্‌সে লাগছিল?

পান্‌সে বলতে তুমি যা বোঝাতে চাইছ, সে রকম আমার কিছু মনে হয় নি। তবে ও-দেশটা খুবই সাজানো-গোছানো, ফিরে এসে কলকাতাকে খুব অগোছাল বলে মনে হয়েছিল।

আচ্ছা, ওখানে আপনার কোন গার্ল-ফ্রেণ্ড ছিল না?

ছিল না বললে কেউই বিশ্বাস করবে না, তবে সত্যি আমার কোন গার্ল ফ্রেণ্ড ছিল না। হাউস-লেডির মেয়ে একটু অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করতে এসেছিল, আমি আমল দিই নি।

নির্মলা সহাস্যে বলল, ভীষ্মের সেকেণ্ড এডিশন আপনি।

তা কেন হবে। তোমার সঙ্গে তো মিশছি—অবশ্য তুমিই আমার জীবনের একমাত্র মেয়ে, যার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আমি এত কথা বলছি।

মেয়েদের এত এড়িয়ে গেছেন কেন?

বরং বলতে পারো মেয়েরাই আমাকে এড়িয়ে গেছে।

বুঝতে পারলাম না কথাটা।

মা মারা গিয়েছিলেন আমার বয়স যখন মাত্র দু-বছর। সংসারে স্ত্রী-জাতীয়া আর কেউ ছিল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ারাই শিশুকে মানুষ করে। আমার বেলায় তা হল না। আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল গ্রামের বাড়িতে। দু'জন চাকরের গাইডেন্সে বড় হলাম। তারপর লেখাপড়ায় একাগ্র থেকেছি। এখন কাজে-কর্মে বিলিয়ে দিয়েছি নিজেকে।

এতে কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে না মেয়েরা আপনাকে এড়িয়ে গেছে।

রাজীব সিগারেট ধরাল। —নিজের সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ শ্লাঘা

আছে। আর অনেকের চেয়ে আমার চেহারা ভালো, মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মেছি, আর্থিক অবস্থা চমৎকার—অর্থাৎ মেয়েদের চোখে হিরো হওয়ার মত সমস্ত গুণাবলী আমার মধ্যে বর্তমান, তবুও কোন বাঙালী মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো না—যে এলো, সে স্বার্থসর্বস্ব হাউস-লেডির মেয়ে লিণ্ডা।

খিল খিল করে হেসে উঠল নির্মলা।—আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। এখানকার কোন শিষ্ট সমাজে যাওয়া-আসা করেন নি, সেক্ষেত্রে…

নির্মলার কথা শেষ হবার আগেই রাজীব গাড়ি থামাল।

কি হল?

অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরো বাইরে ফেলে দিয়ে রাজীব বলল, কি রকম অন্ধকার দেখছো?

রাস্তার দু-পাশে বাঁধানো ফুটপাত নেই—মাটি। রাস্তা থেকে নেমে মাটির ওপর এসে থেমেছে গাড়িখানা। অনেক পুরনো ঝাঁকড়া একটা গাছও রয়েছে সেখানে। লাইটপোস্ট দূরে থাকার দরুন জায়গাটা অন্ধকার।

জোনাকিরা জ্বলছে-নিভছে—কানে এসে বাজছে ঝিঁঝিদের একটানা আর্তরব।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে নির্মলা বলল, গাড়ি থামালেন কেন?

তোমার ভয় করছে?

ভয়! কিসের ভয়?

এই পরিবেশে আমাকে ভীতিপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না তোমার!

না…তা আমার মনে হচ্ছে না।

রাজীব নির্মলার কাছ ঘেঁসে বসল।

নির্মলা—

বলুন—

ভব্য-সমাজের অনেক শিষ্টাচার আমার জানা নেই। জানা নেই বলেই সোজাসুজি বলছি, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে।

নির্মলা নিরুত্তর রইল।

রাগ করলে?

উঁহু!

বুঝতে পারছি একদিনের আলাপে যতই ঘনিষ্ঠ হওয়া যাক না কেন, মনের কথা প্রকাশ করা শোভন নয়। শিষ্টাচার সম্বন্ধে যে শুধু আমার অজ্ঞতা রয়েছে তাই নয়, আমি একটু এগ্রেসিভও।

দ্বিধা-জড়িত গলায় নির্মলা বলল, আমি এগ্রেসিভ লোকেদের বেশি পছন্দ করি।

রাজীবেরও আর কোন দ্বিধা রইল না। গাড়ির মেশিন বন্ধ ছিল। সে

ষ্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে হাত সরিয়ে এনে নির্মলার একটা হাত চেপে ধরল।

নিরু—

এবার নির্মলার গলায় সঙ্কোচের কোন ছোঁয়া আছে বলে মনে হল না।

বলো— ?

অনেক কথা বলবার রয়েছে—কিভাবে যে গুছিয়ে সমস্ত কিছু বলব, বুঝতে পারছি না।

থাক, গুছিয়ে আর তোমায় বলতে হবে না। ব্যারাকপুর যাবে বলছিলে না? ওখানেই চলো বরং।

নির্মলার হাত ছেড়ে রাজীব আবার ষ্টিয়ারিং চেপে ধরল। সেল্‌ফস্টার্টারে চাপ দিতেই সচল হল তার দামী মোটরকার।

ব্যারাকপুর থেকে ফিরে ওরা যখন চৌরঙ্গীতে এসে পৌঁছল, তখন পৌনে নটা।

আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও—নির্মলা বলল।

এখানে কেন? বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

উইমেন্স ক্রশ্চান বোর্ডিং-এ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব। তুমি কাল সন্ধ্যায় এসো।

আসব।—ওকে নামিয়ে দিয়ে রাজীব বাড়ির পথ ধরল।

রাজীব চলে যাবার পর উইমেন্স বোর্ডিং-এ যাবার তেমন কোন উৎসাহ দেখা গেল না নির্মলার। ও স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সির আশায়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, লেক টেম্পল রোডে যাবার জন্যে।

সভ্য-সভ্যারা এগারোটা অবধি ক্লাবে থাকেন। নির্মলা যখন পৌঁছল, তখন কলগুঞ্জনকে ছাপিয়ে পিয়ানোর উচ্চ স্বরে চারদিক মুখরিত। নির্মলা হলে প্রবেশ করে দেখল, পিয়ানো বাজাচ্ছে তরুণ ব্যারিস্টার পমি সেন। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেকে—তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

সতর্ক চোখে নির্মলা ঘরের চারদিক একবার দেখে নিল।

রণেশ মিঃ কাঞ্জিলালের সঙ্গে কথা বলছিল। নির্মলা এগিয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে কাঞ্জিলালই আগে দেখতে পেলেন ওকে। দাড়ি নেড়ে হাসলেন এক মুখ; বললেন, আপনি এতক্ষণ ছিলেন না বলে ক্লাব অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

মৃদু হেসে নির্মলা বলল, আপনি সব সময় একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে মত প্রকাশ করেন বলে আমার ধারণা।

কাঞ্জিলালের হাসি এবার বিস্তার লাভ করল।—নিতান্তই যদি আমার বাড়িয়ে-চাড়িয়ে মত প্রকাশ করা স্বভাব থাকে, তাহলে অন্য কারুর সম্পর্কে

নয় কিন্তু।

রণেশ এবার নির্মলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কথা ছিল। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড মিস্টার কান্তিলাল—

ও···নো···আপনারা কথা বলুন।

কান্তিলাল ঘরের আরেক দিকে এগিয়ে গেলেন।

নির্মলা বলল, তোমাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে?

অকারণে নয়। ও-ধারের বারান্দায় চলো।

হলঘরের লাগোয়া বারান্দা ছিল।

নির্জন বারান্দায় ওরা এলো। সেখানকার আলোর তেজ তেমন জোরালো নয়।

কি হয়েছে বলো তো?

রণেশ গম্ভীর গলায় বলল, তোমার দাদার ওই বন্ধুটি, কি যেন নাম—

রাজীব মজুমদার।

রাজীব মজুমদার দু'দিন ক্লাবে এসে অনেক সভ্যারই মন জয় করে নিয়েছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তাদের দলে তুমিও থাকবে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল।

ও, এই কথা! আমি ভাবলাম না জানি কি!

কথাটা কিন্তু মোটেই হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। যে কোন সূত্রেই হোক আমি সংবাদ পেয়েছি, মজুমদারের সঙ্গে তুমি একটু আগে মোটর বিহারে ব্যস্ত ছিলে।

ছিলামই তো!—নির্মলা রণেশের কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমার কথা শুনে আমি না হেসে থাকতে পারছি না। সেবার—দস্তিদারের ব্যাপারটা নিয়েও তুমি আমাকে সন্দেহ করেছিলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই বোধহয় তোমাকে হাজার পঁচিশেক টাকা দস্তিদারের কাছ থেকে পাইয়ে দিয়েছিলাম।

রণেশ কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

নির্মলা বলল আবার, রাজীব মজুমদারের অনেক টাকা আছে। ছেলেটা মেয়ে-কাঙাল। এই সমস্ত কাঙালীদের মাথা কিভাবে ঘোরাতে হয়, তা আমি জানি।

টাকার কথা পেড়েছিলে নাকি?

এত তাড়াতাড়ি! তোমার কি মাথা খারাপ হল? পিছলে বেরিয়ে যাবে না? দু-চার দিন যাক। পিরিত একটু জমুক, তবে তো? ভাল কথা, কত টাকা এখন তোমার দরকার?

আর হাজার তিরিশ পেলে নতুন বইটা কমপ্লিট করতে পারি আর কি। টাকাটা হয়তো তুমি ঠিকই সংগ্রহ করতে পারবে, কিন্তু আমার মন কেমন

খুঁত-খুঁত করছে।

খুঁত-খুঁত করছে কেন?

ছোকরার চেহারায় চটক আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে—তারপর মেয়েদের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। প্রেমের অভিনয় করে, আমার হয়ে টাকা আদায় করতে গিয়ে নিজেই যদি প্রেমে পড়ে যাও, তাহলে কিন্তু—

ভ্রূ-কুঁচকে নির্মলা বলল, আজ তোমার হল কি বুঝতে পারছি না! দস্তিদারের চেহারা রাজীব মজুমদারের চেয়ে অনেক—অনেক ভাল ছিল, টাকাও ছিল ব্যাঙ্ক ভর্তি। কই, তার প্রেমে পড়ে যাই নি তো?—বোকা কোথাকার! এখনো বুঝতে পারলে না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি!

ওদের কথা আর অগ্রসর হল না। আরো দু-জোড়া নিভৃত-বিলাসি সেখানে এসে উপস্থিত হল।

এবার রণেশ গাঙ্গুলীর পরিচয় একটু দিয়ে রাখতে হয়।

রণেশ জন্মেছিল ধনী অভিজাত পরিবারেই। নানা রকম খেয়ালের দোষে লেখাপড়া বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। ম্যাট্রিকের দরজা কোন রকমে পার হবার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করল। বছর আটেক বাড়িতে নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকার পর ওর ইচ্ছে হল ব্যবসা করবার।

তখন সিনেমার হুজুগটা বাংলাদেশে বেশ জমে উঠছে।

রণেশ স্থির করল ও ছবি তুলবে। প্রযোজনা নয়—পরিচালনা। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই বই পরিচালনা করা যায় না, তার জন্যে কিছু শিক্ষা ও কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। অগত্যা সুপারিশের জোরে একজন প্রবীণ পরিচালকের আণ্ডারে শিক্ষানবিশি করার সুযোগ ও সংগ্রহ করল।

বছর দুয়েক সহকারী পরিচালক থাকার পর রণেশ সাহস করে পরিচালক হিসাবে ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াল। ওর প্রথম ছবি গীতপ্রধান, কিন্তু দর্শকের আকর্ষণ করতে পারল না।

এই সময় সোসাইটি ক্লাবে নির্মলার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। আলাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয় না।

এদিকে ছবি করতে গিয়ে রণেশের আর্থিক অবস্থা বেশ ঘা খেয়েছিল। দ্বিতীয় ছবিতে যে হাত দেবে সে-সাহস ওর হচ্ছিল না। নির্মলাই দস্তিদারের ঘাড় ভেঙে টাকা সংগ্রহ করে দিল।

হার্ডওয়ারের ব্যবসায় প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল দস্তিদার। নির্মলার মন পাওয়ার বিনিময়ে কিছু টাকা সহজেই সে খরচ করেছিল। নিজের কাজ মিটে যাবার পর নির্মলা ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি।

দস্তিদার ব্যবসাদার লোক। নিজের অবস্থা ব[illegible]র, অনুনয়-

বিনয়ের ধার না মাড়িয়ে সরে পড়েছে।

এত কাণ্ড করে টাকা সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ছবি তৈরি হল বটে, তবে প্রথমটির মত যথা নিয়মে দ্বিতীয়টিও ফ্লপ করল। তৃতীয় ছবি যাতে ফ্লপ না হয় রণেশ সে জন্যে এবার তৎপর হয়েছে। বক্স অফিস অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে এবার কন্‌ট্রাক্ট করতে হবে। উঠতিদের চান্স দিলে বাজারে ছবি দাঁড়ায় না।

বক্স অফিস-আর্টিস্ট মানেই টাকার খেলা।

রণেশ নিজের পরিকল্পনার কথা বলেছিল নির্মলাকে।

ভাগ্য বলতে হবে—উৎপল সেইদিনই রাজীবকে ক্লাবে নিয়ে এলো। ডিম-ভরা কই। নির্মলা কালবিলম্ব না করে কাজে নেমে পড়েছে। নিজের মোহময় ব্যবহারের যে চার টোপে মাখিয়ে ফেলেছিল, রাজীব তা গিলেছে। এখন খেলিয়ে ঠিক মত তুলতে পারলেই হয়।

নির্মলা জানে তুলতে সে পারবেই।

দিন কয়েক ঘন ঘন ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ হল রাজীব ও নির্মলার।

রাজীব নিজের মনস্থির করে ফেলেছে। নির্মলাকে সে বিয়ে করবে। এরকম সুশ্রী রুচিশীলা স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, এই প্রস্তাবে পাত্রীর নিজের কোন আপত্তি হবে না। উৎপলদের যে আপত্তি হবে তা-ও নয়। এখন সময় মত কথাটা নির্মলার কাছে পাড়তে পারলেই হল।

রোজকার মত সন্ধ্যার সময় দেখা হল দু'জনের।

রাজীব বলল, আজ তোমাকে একটা ভীষণ দরকারী কথা বলতে চাই।

আমিও যে তোমাকে একটা দরকারী কথা বলব বলে স্থির করে রেখেছি।

মৃদু হেসে রাজীব বলল, বলো কি! তাহলে তুমিই প্রথমে আরম্ভ করো। তোমার কথা শোনবার পর আমি নিজের বক্তব্য বলব।

নির্মলা কিন্তু প্রথমে কিছু বলতে পারল না। ইতস্ততঃ করতে লাগল।

কি হল, বলো?

না···মানে···কথাটা শুনলে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হবে।

তোমার কোন কথা শুনে আমি বিরক্ত বোধ করব না নিরু। বলো—

ইয়ে···মানে·· কথাটা ব্যবসা সংক্রান্ত—

ব্যবসা সংক্রান্ত! একটু আশ্চর্য হয়ে রাজীব বলল, তুমি ব্যবসায় নামছ নাকি?

আমি নয়। তোমাকে নতুন একটা ব্যবসায় নামাতে চাই।

আমি তোমার কথা ঠিক ধরতে পারছি না। পরিষ্কার করে বলো

সমস্ত কিছু।

সসঙ্কোচে নির্মলা এবার যা বলল তার সারমর্ম হল, রণেশ গাঙ্গুলী নামে ওদের এক পারিবারিক বন্ধু আছেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক। পেশায় চিত্র পরিচালক। ইতিপূর্বে তাঁর দু'খানি বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে। পয়সা না পেলেও গুণীসমাজের কাছে প্রশংসা পেয়েছে। গুণীসমাজের প্রশংসায় পেট ভরে না। বাধ্য হয়ে তৃতীয় ছবিখানিতে যাতে আর্থিক সাফল্য আসে, সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেন। কিন্তু গাঙ্গুলী অত্যন্ত সাদা মনের লোক হওয়ায়, বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি পেমেণ্ট করে বসে আছে নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় এদিকে বই আর এগোচ্ছে না। সেই কথাই দুঃখ করে তিনি আমাদের কাছে বলছিলেন। হঠাৎ আমি কেন জানি না বলে বসলাম, তোমার কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় করে দিতে পারব। অবশ্য তোমাকে না জানিয়ে কথা দেওয়া আমার উচিত হয়নি। তবে একথা বলব, সিনেমার ব্যবসা খারাপ নয়। তুমি ইচ্ছে করলে, টাকা ইনভেস্ট করতে পারো।

রাজীব বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল, তোমার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। সিনেমার ব্যবসা ভাল হোক বা খারাপ হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যখন কথা দিয়েছ—টাকা আমি দেব।

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল নির্মলা।—তুমি আমার মান বাঁচালে। কথা দিয়ে ফেলেই বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

ভয়কে মিথ্যে প্রশ্রয় দিয়েছ। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতে, তুমি নিজের টাকায় কাউকে সাহায্য দেবে এই কথাই বলেছ।

নিজের টাকায়!

তোমাকে বললাম না, একটা দরকারী কথা বলব? কথাটা আর কিছু নয় নিরু, তোমাকে বিয়ে করতে চাই—এটাই জানাতে চেয়েছিলাম। রাজীব নির্মলার দু-হাত চেপে ধরল—তুমি কি আমার মতে মত দেবে নিরু?

নির্মলা নির্বিকার গলায় বলল, এখনো কি তোমার কিছু বুঝতে বাকি আছে! তোমার মতই তো আমার মত।

পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাজীব নির্মলার মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাস করল। তারপর ওকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার উদ্দেশে গিয়ে উপস্থিত হল ফেরাজিনে।

সব চালেই যে বাজীমাৎ করা যায় না, ভাগ্য সময় সময় বুঝিয়ে দেয় সে-কথা মানুষকে। দস্তিদারকে যে চালে কায়েল করেছিল—সেই চালেই যে রাজীবও কায়েল হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে নির্মলার কোন সন্দেহ ছিল না। এখন

টাকাটা তাড়াতাড়ি বার করে নিতে পারলেই ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু ভাগ্য মন্দ হওয়ায় চাল এবার ফেঁসে গেল।

এক অবিশ্বাস্য ঘটনায় রাজীবের চোখে ধরা পড়ে গেল নির্মলা।

নির্মলাকে বিয়ের প্রস্তাব করার পরের দিন দুপুরে নিজের অফিসঘরে বসে রাজীব মিল-এক্সটেনশন সম্পর্কে নরেন গুপ্তর সঙ্গে কথা বলছিল। কাজের কথা শেষ হবার পর গুপ্ত বললেন, কিছু যদি মনে না করেন স্যার, তবে একটু অনধিকার চর্চা করতে চাই।

রাজীব মৃদু হেসে বলল, কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করবেন বুঝতে পারছি; বলুন?

আমি আপনাদের পুরনো কর্মচারি। আপনার শুভাশুভর প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আহা-হা, আপনি তো ভণিতা আরম্ভ করলেন; আসল কথাটা কি বলুন না?

কথাটা আপনার সোসাইটি ক্লাবে যাওয়া নিয়েই; জায়গাটা ভাল নয়। ওখানে আপনার যাওয়া-আসা না করাই ভাল।

ভ্রূ-কুঁচকে রাজীব বলল, আমি কোন সোসাইটি ক্লাবে যাই, আপনাকে কে বলল?

কয়েকদিন আগে আপনিই কথায় কথায় বলেছিলেন।

ও, হ্যাঁ। জায়গাটা ভাল নয়, বুঝলেন কি ভাবে?

আমাদের নতুন ব্লকের জন্যে হার্ডওয়্যার সাপ্লাই দিচ্ছেন সুনীল দস্তিদার, তিনি বলছিলেন। আগে নিয়মিত যাওয়া আসা ছিল এই ক্লাবে তাঁর; বড় ভাল লোক মিস্টার দস্তিদার। লাখ টাকার মালিক কিন্তু সামান্য দু'হাজার টাকার মাল কোথাও সাপ্লাই হলে নিজে গিয়ে তদারক করেন। ওই ক্লাবের একটি মেয়ে পঁচিশ হাজার টাকা তাঁকে ঠকিয়ে নিয়েছে।

রাজীবের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল!

সুনীল দস্তিদারকে ফোনে এখন পাওয়া যাবে?

তিনি এখন আমাদের মিলে আছেন।

এখানে আছেন!

হ্যাঁ, ঘণ্টা খানেক হল হাজার কুড়ি টাকার মাল নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফেরার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

কথাটা যখন তুললেন, তখন এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করে নেওয়া ভাল। তাঁকে ডেকে আনুন এখানে।

নরেন গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক পরে ফিরে এলেন দস্তিদারকে নিয়ে।

দস্তিদার রাজীবের চেয়ে বছর ছয়েকের বড় হবেন। সুপুরুষ। রাজীব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। তাঁকে পৌঁছে দিয়েই গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বসতে বসতে বললেন, আপনার সব মালই তো এসে গেল, চেকটা একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

রাজীব বলল, কালই যাবে। ও কথা থাক, আপনার সঙ্গে অন্য বিষয়ে আলোচনা আছে। আপনার মিলনীতে যাওয়া আসা ছিল শুনলাম।

ছিল বইকি! ও এক সাংঘাতিক জায়গা মশাই। পঁচিশটি হাজার টাকা নগদ আক্কেল সেলামী দিয়ে তবে ওখান থেকে রেহাই পেয়েছি। আপনিও তো ওখানে যাচ্ছেন। আমার অনুরোধ যদি শোনেন, তবে আজ থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিন।

কি ভাবে পঁচিশ হাজার টাকা আপনার গেল? সকলে মিলে কেড়ে নিল নাকি?

দস্তিদার বললেন, কেড়ে নেয়নি। কেড়ে নেবেই বা কি ভাবে। পঁচিশ হাজার টাকা পকেটে নিয়ে তো বেড়াতাম না। একটি মেয়ে আমাকে একরকম ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল বলতে পারেন! মৃদু হাসলেন তিনি।

সে সমস্ত দিনের কথা ভাবলে এখন আমি অবাক হয়ে যাই, আমার মত ঘুঁদে ব্যবসাদারের কাছ থেকে টাকা বার করে নেওয়া সহজ নয়। গ্রহের ফের আর কি! নির্মলা বলে কোন মেয়ের দেখা পেয়েছেন ওখানে? আমার নাকে দড়ি দিয়ে নাচিয়েছিল সে।

রাজীবের পাঁজরে পাঁজরে ঠোকাঠুকি লাগল।—নির্মলা!

চেনেন তাহলে। সাবধান মশাই, ওখানে যদি নিতান্তই যাওয়া-আসা করা না ছাড়তে পারেন—ওই মেয়েটিকে নিশ্চয় এড়িয়ে চলবেন।

আপনি ঠিক জানেন, নির্মলা মেয়েটি ভাল নয়?

ঠিক মানে! মাস খানেক ধরে চূড়ান্ত প্রেমের অভিনয় করেছিল আমার সঙ্গে। বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর—ওদের এক পারিবারিক বন্ধু রণেশ গাঙ্গুলী, তার সিনেমার ব্যবসার জন্যে আমার কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বাগিয়ে নিলে। পরে শুনলাম সমস্তই নির্মলার অভিনয়। আসলে ওই রণেশ গাঙ্গুলীকে ও ভালবাসে।

নিচের দিক থেকে লাভা-প্রবাহ রাজীবের মাথায় উঠে চলেছে। নির্মলার এই হল স্বরূপ! দস্তিদার যে মিথ্যে কথা বলছেন না, তার প্রধান সাক্ষী তো সে নিজে। তার সঙ্গে নির্মলা প্রেম করেছে, বিয়ের প্রস্তাবে সাগ্রহে মত দিয়েছে। রণেশ গাঙ্গুলী নামে ওদের এক পারিবারিক বন্ধুর সিনেমার ব্যবসায় টাকা ফেলতেও বলেছে। কোথাও গরমিল নেই।

দস্তিদার যে ঘটনার কথা বললেন, নির্মলা তারই পুনরাবৃত্তি করে গেছে তার কাছে ; চমৎকার ! সাদা চোখে দুনিয়া দেখার দিন যে ক্রমেই চলে যাচ্ছে, রাজীব বুঝতে পারছে। তবু দস্তিদারকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না, একবার নির্মলাকে বাজিয়ে দেখবে।

আরও দু-চার কথা বলার পর দস্তিদার বিদায় নিলেন, যাবার আগে আরেক দফা উপদেশ বর্ষণ করতে ভুললেন না।

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা ছ'টার সময় রাজীব ক্লাবে পৌঁছল। নির্মলা ওখানেই ছিল ; এগিয়ে এসে বলল, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

রাজীব হাসিমুখে বলল, তাই বোধহয় আমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তোমার এখন কোন কাজ নেই তো ?

আমার আবার কাজ কি !

এই বদ্ধ হাওয়ায় থেকে লাভ নেই। চলো একটা লম্বা মোটর ট্রিপ দিয়ে আসি।

ও—লাভলি ! চলো।

রাজীবকে আজ চূড়ান্ত অভিনয়ের পর স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে। নিজেকে সে যথাসম্ভব প্রস্তুত করেই এনেছে।

গাড়িতে এসে বসল দু'জনে।

আমরা কোন দিকে যাব ?—নির্মলা প্রশ্ন করল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কিছু দূর যাব। এখন ছ'টা পনের ; দশটার মধ্যে ফিরে আসতে পারব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো ?

কোন অসুবিধা হবে না। ক্লাব থেকে দশটার সময়ই বাড়ি ফিরি।

গাড়ি ছেড়ে দিল রাজীব।

নানা রকম হালকা ও চটুল কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ওরা কালীঘাট ও ভবানীপুর অতিক্রম করল। চৌরঙ্গী ; ডালহৌসী পার হয়ে হাওড়া স্টেশনকে একপাশে ফেলে গাড়ি এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর পড়ল।

রাজীব বলল, আমাদের বিয়ের কথা বাড়ির কেউ জানতে পেরেছে নাকি ?

দাদাকে আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম, দাদা বাড়ির সকলকে বলেছে। শুনে সকলেই খুশি হয়েছেন।

গুড নিউজ ! এবার উৎপলের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত পাকাপাকি করে ফেলি, কি বলো ?

রাজীবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নির্মলা বলল, আমি কি বলব।

কিছু বলবে না বুঝি ?

উঁহু !

কাজ নেই তোমার কিছু বলে। মোট কথা বউ হয়ে ঘরে এস, তাহলেই হবে। যাক সেই সিনেমার ব্যাপারটা কি হল ?

কাল মিস্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, কথাবার্তা বলে বুঝে নিও। টাকাটা দু-এক দিনের মধ্যেই দিতে পারলে ভাল হয়।

কোন কথাবার্তা শুনে আমার দরকার নেই ; তুমি যখন রয়েছ, তখন আমি আর শুনে কি করব। চেক কালই দিতে পারব—এমাউন্ট কত ?

নির্মলা নিজের রূপের গর্বে গর্বিত হয়ে উঠল। রাজীব-রূপী পতঙ্গটিকে ও কেমন চমৎকার ভাবে নিজের মোহের মায়ায় আচ্ছন্ন করে তুলেছে। মাত্র কয়েক দিনের অন্তরঙ্গতায় এতটা সত্ত্বা দস্তিদারও বিকিয়ে দেয় নি, তার বেলায় বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

নির্মলা বলল, কত এমাউন্ট বলতে পারব না, রণেশবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তোমাকে জানাব।

চওড়া অ্যাসফল্টে মোড়া রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত ল্যাম্পপোষ্টগুলির কাছটা আলোকিত—অপরদিক থেকে ছুটে আসা গাড়ির হেডলাইট ঝিলিক মারছে মাঝে মাঝে, নয়তো অন্ধকার। একটু শীত শীত করছে।

নির্মলা রাজীবের কাছ ঘেঁসে বসল।

রাজীব বলল, ধরো, এই ভাবে যদি আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা এগিয়ে যেতে থাকি, তাহলে কেমন হয় ?

খুব ভাল হয় ; বিয়ের পর আমরা তাই যাব।

আর কোন কথা হল না। দু'জনে চুপচাপ। গাড়ির একটানা হালকা যন্ত্রের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। দশ মিনিট কাটল এই ভাবে।

নির্মলা অসহিষ্ণু ভাবে বলল, এত চুপচাপ ভাল লাগে বুঝি ?

হুঁ, এবার তাহলে কাজের কথা আরম্ভ করি।

কোন্ কাজের কথা ?

রাজীব রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছে নিয়ে বলল, সুনীল দস্তিদারকে চেনো ?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এভারেস্টের চূড়া থেকে অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল নির্মলা।

চুপ করে রয়েছ যে ? চেনো তাকে ?

না।

সে ভদ্রলোক কিন্তু তোমায় চেনেন। মামুলি আলাপ নয়—গভীর অন্তরঙ্গতাই এক সময় ছিল তোমার সঙ্গে তাঁর।

কি বলছ আজেবাজে! অন্তরঙ্গতা দূরে থাক, সুনীল দস্তিদার নামে কাউকে চোখে দেখিনি কখনও।

বলো কি! তোমার চোখের বাহাদুরী আছে তো? আমি কিন্তু জানি, আজকের মত সেদিনও যখন দস্তিদারের সঙ্গে মোটর-বিহারে যেতে, তখন এই ভাবেই ঘনিষ্ট হয়ে বসতে তাঁর সঙ্গে।

নির্মলার আর বুঝতে বাকি থাকে না, রাজীব অনেক কথাই জেনে ফেলেছে। একটু আগে মোহময় পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছিল রাজীবকে। অবান্তর কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। এখন বুঝে নিতে বিলম্ব হচ্ছে না, অভিনয় দক্ষতা ওর চেয়ে রাজীবের অনেক বেশি।

অজ্ঞতা ও প্রতিবাদের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনল না নির্মলা।

তোমার মুখ থেকে এরকম কথা শুনব, কোনদিন ভাবিনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে করে কেউ কিছু বলেছে—তাতেই তুমি নেচে উঠলে!

শোনো নির্মলা, একটা মিথ্যেকে ঢাকতে গিয়ে অজস্র মিথ্যের অবতারণা করতে হয়, আমি জানি। তবু আমি তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু আমি যা শুনেছি, তা যে মিথ্যে সে কথা তোমায় প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, দস্তিদারের সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় করো নি। তোমাদের পারিবারিক বন্ধু রমেশ গাঙ্গুলীর সিনেমার ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, একথা আমায় যেমন বলেছ—দস্তিদারকে বলো নি! পারবে প্রমাণ করতে?

প্রমাণের কোন প্রশ্নই ওঠে না; ওই নামের কোন লোককে আমি চিনি না, তোমাকে আগেই বলেছি।

গাড়ির মুখ ঘোরাচ্ছি। দস্তিদারের বাড়ির ঠিকানা আমার জানা আছে; আশা করা যায়, তিনি এখন বাড়িতেই আছেন। তিনি যদি তোমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে আমি তোমার কথার সত্যতা মেনে নেব।

নির্মলা ভয়ে ভাবনায় একেবারে মিইয়ে পড়েছে। কাঁপা গলায় বলল, আমি তাঁর বাড়ি যেতে যাব কেন? আমার কথায় তুমি আস্থা রাখতে পারছ না; মরমে মরে যাচ্ছি আমি।

রাজীব নির্বিকার গলায় বলল, মরমে নয়, পাঁকের ডোবায় ডুবে মরা উচিত। তুমি ভাবতেও পারো নি, আমার সঙ্গে দস্তিদারের দেখা হয়ে যাবে। ভেবেছিলে, একটা বোকা বড়লোককে হাতের কাছে পেয়েছ, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বেশ কিছু আদায় করে নিতে পারবে?

নিজের হারিয়ে ফেলা ভাবকে নির্মলা কিছুটা ফিরে পেল এবার। আর অভিনয় করে লাভ কি? রাজীবকে নিঙড়ে একটা দোয়ানিও আর বেরুবে না পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আমি আর কোন রকম অপমান-সূচক কথা শুনতে চাই না, আমাকে

ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে এস।

রাজীব হাসল সশব্দে।—আমিও তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না।

রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামল।

নেমে যাও এখানে।

নেমে যাব! এখানে কোথায় নামব?

কোথায় আবার, এই অন্ধকারের রাজ্যে—ঝোপঝাড় আর মাঠের মধ্যে। তোমাকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে আসবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

আবার একরাশ ভয় নির্মলাকে গ্রাস করল। রাস্তার দু-পাশের সীমাহীন অন্ধকার ওকে উৎকণ্ঠার শেষপ্রান্তে নিয়ে গেল।

আমাকে এখানে নামিয়ে দিও না রাজীব! জায়গাটা ভাল নয়।

ভাল নয় বলেই তোমাকে নামতে হবে?

আমার ওপর তোমার দয়া হচ্ছে না?

তোমার দয়া হয়েছিল, আমার ওপর? মেয়েদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমাকে খেলার পুতুলের মত উঠিয়েছ, বসিয়েছ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে। তখন তো তোমার মনে হয়নি, আমার ওপর কতটা অকরুণ হচ্ছো? নেমে যাও।

এখানে নামলে আমি ফিরব কি ভাবে! তাছাড়া…

কিভাবে বাড়ি ফিরবে সে দায়িত্ব আমার নয়; বরং আমি তোমায় বলতে পারি, এখানে নামলে তোমার নিশ্চয়ই বিপদের সম্ভাবনা আছে। গায়ে গয়না যখন রয়েছে, তখন সেগুলো কেড়ে নেবার লোকের অভাব হবে না এখানে। ওটুকুতেই অবশ্য রেহাই পাবে না। যৌবনের ভার রয়েছে শরীরে, দৈহিক অত্যাচার কিছু সহ্য করতে হবেই। ভবিষ্যতে যাতে আর কারুর অনিষ্ট করতে না পারো, তাই এই শিক্ষা তোমাকে দিয়ে রাখছি।

আমি নামব না গাড়ি থেকে! কি করবে? জোর করে নামিয়ে দেবে?

তোমাকে গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মত শক্তি আমার আছে। তা আমি করব না। সামনেই কোন্নগর, আমার কারখানা ওখানেই। গাড়ি সমেত ওখানে গিয়ে দুটো দারোয়ানকে এখানে নিয়ে আসব, তারা তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দেবে। কোনটা তোমার পক্ষে সম্মানের হবে চিন্তা করে দেখ। নিজে নেমে যাবে, না—

রাজীবের কথা শেষ হবার আগেই মরিয়া হয়ে নির্মলা নেমে পড়ল। এরকম শক্ত পাল্লায় পড়তে হবে ও কোনদিন ভাবে নি।

গাড়ি ছেড়ে দিল রাজীব। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হল কলকাতায়। রাজীব ভাবতে ভাবতে চলেছে, এতটা রূঢ় হওয়া বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হল না। কাল যদি এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে উৎপলরা আইনের কোন প্যাঁচে

ওকে ফেলার ব্যবস্থা করে ?

ফেলতে যদি চায় ফেলবে, রাজীব তলিয়ে যাবে। তবু সে জঘন্য চরিত্রের একটি মেয়েকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে—এও তো কম সান্ত্বনার বিষয় নয়। বলতে গেলে তার প্রেমের করুণ পরিণতির ওপর এই সান্ত্বনাই এখন একমাত্র প্রলেপ।

বাড়ি ফিরেই রাজীব রাত্রের খাওয়া সেরে নিল।

নির্মলার কথা আর ভাববে না। অতীতের অন্ধকারে মিলিয়ে যাক নির্মলা।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে রাজীব ড্রইংরুমের দিকে চলল। সাময়িক পত্র পত্রিকায় চোখ বোলাবে ঘণ্টাখানেক। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করবার পর মান্টিল্‌পিসের ওপর দিকে টাঙানো মেজকাকার বিরাট ওয়েলপেন্টিং-এর ওপর দৃষ্টি পড়ল। মেজকাকা যেন হাসছেন, রাজীবের শোচনীয় পরাজয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছেন।

হঠাৎ একটা কথা রাজীবের স্মরণ-পথে উদয় হল। বিলেত যাবার আগে মেজকাকা তাকে বলেছিলেন। মনে হল সেই কথার জের টেনে এখন তিনি বলছেন, কিহে ছোকরা, দুনিয়াটা দেখলে তো ? ভালই হল, ঠেকে কিছু শিখতে পারলে। বিলেত যাবার আগে আমার কাছ থেকে যে-কথা শুনেছিলে, মনে আছে ? বাচস্পতির মেয়ে এখনো অবিবাহিতা—

আর কোন কথা নয়, বাচস্পতির মেয়েকে রাজীব বিয়ে করবে। তবে আগে তাকে দেখে নেওয়া দরকার। আগামীকাল নিজেদের গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলে কেমন হয় ? মন্দ কি ! বাই কার চলে যাবে কাল।

বারুনী চব্বিশ পরগণার একটি গ্রাম।

রাজীবের ঠাকুরদা এখানকার দুর্দান্তপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা নাকি ডাকাতি করা অর্থ দিয়ে এখানকার জমিদারী কিনেছিলেন। রাজীবের বাপ-কাকারা অবশ্য জমিদারীর মোহ ত্যাগ করেছিলেন। নিজেদের প্রায় দশ আনা জমি বিক্রি করে—সেই টাকায় কোন্নগরের জুটমিলের অংশ কিনে ব্যবসায় নেমেছিলেন।

বারুনীতে মজুমদারদের পেল্লায় ইমারত এখনো অটুট আছে। প্রতি বছর না হলেও মাঝে মাঝে সংস্কার করানো হয়। জনকয়েক কর্মচারি মোতায়েন আছে বাড়িখানাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে।

বেলা দশটার সময় রাজীব গ্রামে পৌঁছল।

তার আগমনে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু মাতব্বরেরা কেউই সাহস

করে রাজীবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন না। একে বড়লোক তায় বিলেত ফেরত—উঁচু মেজাজের কি না হবে? কি বলতে কি বলে বসবে কে জানে। নিজের মান নিজের কাছে বিবেচনা করে কেউ আর জমিদার বাড়ির ছায়া মাড়ালেন না।

কিন্তু মাতব্বরেরা অবাক হলেন যখন তাঁদের কাছে লোক এসে জানাল রাজীব মজুমদার বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের সাক্ষাতপ্রার্থী। সকলে গুটি-গুটি এলেন জমিদার-বাড়ি—বাচস্পতিও আছেন তাঁদের মধ্যে। সেকেলে ঢং-এ সাজানো বিরাট একটি ঘরে রাজীব অপেক্ষা করছিল। সকলকে সাদর আহ্বান জানাল। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বলল, আমার ধারণা, গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা বোধহয় তেমন ভাল নয়।

শোচনীয় বলতে পারো বাবাজী—একজন বললেন। অনেক লেখালিখি করেও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। সাত মাইল রাস্তা ভেঙে ছেলেদের স্কুল করতে যেতে হয় সেই বামুনচকে।

আরেকজন বললেন, দূরে স্কুল বলে বেশির ভাগ ছেলে যেতে চায় না। এই ভাবে গ্রামে বিদ্যার প্রসারের চর্চা কমে আসছে।

রাজীব বলল, এ বিষয়ে বহু আগেই মেজকাকাকে আপনাদের বলা উচিত ছিল। স্কুলের ব্যবস্থা কবে হয়ে যেত। যা হোক, আমি স্থির করেছি গ্রামের বিদ্যার প্রসারের জন্যে কিছু করব।

রাজীবের কথায় সকলে সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

রাজীব নিজেদের এই বাড়িখানা স্কুলের জন্যে ছেড়ে দেবে জানালো। এবং অন্যান্য সাহায্য কি রকম করবে, তাও সবিস্তারে বর্ণনা করল। সবশেষে গ্রামের মাতব্বররা প্রচুর জলযোগ করে বিদায় নিলেন।

যাবার সময় বাচস্পতির সঙ্গে রাজীবের কথা হল। মেজকাকা বাচস্পতি মশাইকে কত শ্রদ্ধা করতেন তা জানালো। কথা বলতে বলতে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর বাচস্পতি বললেন, তোমার মেজকাকা গ্রামে এলেই যেতেন আমার বাড়ি। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধানকে তিনি মানতেন না।

আমাকে আপনি অন্য চোখে বিচার করবেন না। আমি এখুনি যাব আপনার বাড়ি—

বাচস্পতি মশাইয়ের বাড়ি যাবার একটা সুযোগ রাজীবকে গ্রহণ করতে হত। নইলে তাঁর মেয়েকে দেখার উপায় থাকে না। এই সুযোগ সে সহজেই গ্রহণ করল। বাচস্পতি তাকে সাগ্রহে নিয়ে এলেন বাড়িতে। বাইরের ঘরে রাজীবকে বসিয়ে গলা ছাড়লেন, কই গো, কোথায় গেলে—? দেখ কে এসেছে আমার সঙ্গে।

ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন বাচস্পতি-গিন্নি

—কিন্তু তরুণ অতিথিকে চিনতে পারলেন না।

বাচস্পতি সাড়ম্বরে রাজীবের পরিচয় দিয়ে বললেন, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রতিমাকে গিয়ে বলো, যা-হোক কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করুক রাজীবের জন্যে।

কর্তার ইঙ্গিত গিন্নি বুঝতে পেরে ভেতরে যেতে উদ্যত হলে রাজীব বলল, মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন আপনারা। ও-সমস্ত হাঙ্গামার মধ্যে যাবেন না।

হাঙ্গামা আর কি বাবা!—গিন্নি বললেন, কি আর সোনাদানা খাওয়াব তোমাকে···বসো, আসছি।

মিনিট পনের পরে রেকাবিতে চারটে নারকেল নাড়ু ও এক বাটি চা নিয়ে লাজনম্র চরণে প্রতিমা ঘরে এল। গিন্নিও সঙ্গে আছেন। গ্রামঘরে পরপুরুষের সামনে এই শহুরে কায়দায় মেয়েকে বার করবার রেওয়াজ নেই। একথা যে বাচস্পতির অজানা আছে তাও নয়। আসলে বিলেত-ফেরত রাজীবকে তিনি পূর্বস্থিরীকৃত একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন। তাঁর সুন্দর মেয়েকে দেখে রাজীবের মেজকাকা তাকে পুত্রবধূ করবার মনস্থ করেছিলেন—একথা রাজীব হয়তো বিশ্বাস করবে না। কাজেই মুখে কিছু বলবেন না বাচস্পতি, রাজীব নিজের চোখে দেখে যদি প্রতিমাকে পছন্দ করে, তাহলে সবদিক রক্ষা পায়।

জলযোগ সেরে ঘণ্টাখানেক আরো কথাবার্তা বলে ওখান থেকে বিদায় নিল রাজীব।

কলকাতায় ফিরে এসে রাজীব বাচস্পতিকে চিঠি দিল।

প্রতিমাকে দেখার পর ও আরেকবার হৃদয়ঙ্গম করল মেজকাকা প্রথম শ্রেণীর জহুরী ছিলেন। প্রতিমা ধুলো-কাদার মধ্যে পড়ে থাকা হীরে ছাড়া আর কিছু নয়।

বাস্পতিকে রাজীব লিখল—

শ্রীচরণেষু,

> অনন্যোপায় হয়ে এমন একটা বিষয় নিয়ে আপনাকে চিঠি দিতে হচ্ছে, যা আমার পক্ষে শোভন নয়। আমার বিয়ের ব্যাপারে মেজকাকা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বিলেত যাবার আগে আমি সেকথা শুনেছিলাম তাঁর মুখ থেকে। তিনি আজ নেই। তাঁর দেওয়া কথাটা মিথ্যে হোক, তা আমি চাই না। প্রতিমাকে গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি।
>
> আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। প্রণাম নেবেন।
>
> রাজীব মজুমদার।

চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন বাচস্পতি। পরের ডাকে উত্তর দিলেন।

বিয়ের দিন স্থির হতে বিলম্ব হল না। অনেক দিন পরে লিটন স্ট্রীটের মজুমদার হাউস আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে। বৌভাতে প্রচুর লোককে আমন্ত্রণ জানালো রাজীব। সোসাইটি ক্লাবের সভ্য-সভ্যারাও বাদ গেল না।

বৌভাতের দিন আর সকলে এলেও নির্মলা এল না।

উৎপল ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গোঁজা অবস্থায় একটু এড়িয়ে এড়িয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত তুমি গেঁও মেয়ে বিয়ে করলে।

রাজীব মৃদু হেসে বলল, এতে তোমার অবাক হবার কি আছে?

অবাক হবার আছে বই কি! তোমার মত বিলেত-ফেরৎ ধনী অভিজাত পরিবারের ছেলে এ রকম বোকামীর পরিচয় দেবে, ভাবতে পারি নি।

ধনী না হলেও আভিজাত্য ওদের কম নেই উৎপল। অবশ্য সোকল্ড অ্যারিস্টোক্রেসির ছিটে ফোঁটাও আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের হাবে ভাবে খুঁজে পাবে না স্বীকার করছি।

তাহলে তো তুমিও একটেরে হয়ে পড়লে বলতে হবে। তোমার স্ত্রী যদি আমাদের সমাজের চাল-চলনে রপ্ত না হতে পারেন, তাহলে তোমার বন্ধ ঘরে বাস করার মত অবস্থা হবে বলে রাখছি। অবশ্য তাই যদি তুমি পছন্দ করো আমার বলবার কিছু নেই। রাত হল, এবার চলি।

উৎপল চলে গেল। ছায়াছন্ন মনে রাজীব দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট ওখানে। হালকাভাবে বললেও উৎপলের কথায় শ্লেষের ছোঁয়াছিল। রাজীব আপন মনে হেসে উঠল, প্রগতিশীল সমাজ!! টাকা যখন আছে, তখন প্রতিমার আধুনিক হতে বাধা কোথায়। উৎপলের সমাজকে দেখিয়ে দেবে রাজীব তার স্ত্রী টপ অ্যাবোস্টক্র্যাট হতে পারে কি না।

অতিথিদের বিদায় নিতে নিতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

আরো এক ঘন্টা পরে রাজীব শোবার ঘরে গেল। প্রতিমা তখন আনমনে বসেছিল খাটের ওপর। গ্রামের মেয়ে, শহরের চাকচিক্য ওর মধ্যে নেই। তবে রূপ আছে—অপর্যাপ্ত রূপ।

রাজীবকে দেখে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। লজ্জায় ভেঙে পড়ল না। বাসর ঘরে মহিলাকুল অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওদের দুজনকে বেহাই দেওয়ায়—দুজনের আলাপ-পরিচয় ভালভাবেই হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের মেয়ে হলেও প্রতিমা বেশ সপ্রতিভ, ওর জড়তা আর আরষ্ট ভাব রাজীবকে বিরক্ত করে তোলে নি।

ঘুম পাচ্ছে তোমার ?—রাজীব হালকা গলায় প্রশ্ন করল।

না।

এই বিরাট বাড়িতে নিজের বলতে তোমার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে—আমি জানি, অল্প দিনের মধ্যেই তুমি সমস্ত কিছু মানিয়ে নিতে পারবে।

প্রতিমা একটু চুপ করে থেকে বলল, কি করে জানলেন ?

রাজীব ওকে নিজের কাছে টেনে আনল—লোক দেখে আমি বুঝতে পারি।

প্রতিমা সরে যাবার চেষ্টা করল।

ওকি সরে যাচ্ছ কেন ?

দরজা খোলা রয়েছে।

গলা ছেড়ে রাজীব হাসল। থাক না দরজা খোলা, বললাম না কেউ নেই বাড়িতে। আর চাকর-বাকরদের সাহস হবে না আড়ি পাতবার।

এরপর অনেক কথা হল দুজনের। অর্থহীন অনেক কথা।

শেষে রাত আড়াইটে বেজে যাবার পর রাজীব বলল, এবার ঘুমের বাড়ি পাড়ি দেওয়া উচিত আমাদের! কাল সাড়ে সাতটার সময় মিলে যেতে হবে আবার।

কালও মিলে যাবে ?

বিয়ে করেছি বলে কাজে ফাঁকি দেব ? তবে সারাদিন থাকব না ওখানে, তাড়াতাড়িই ফিরে আসব। একটা কথা আজই তোমাকে বলে দেওয়া দরকার, তোমাকে প্রচণ্ড রকমের আধুনিক হতে হবে।

আমাকে আধুনিক হতে হবে ?

হ্যাঁ। তুমি যে পরিবেশে বড় হয়েছ, সেখানকার সমস্ত চালচলন তোমাকে ভুলে যেতে হবে। আধুনিকতার ছাঁচে নিজেকে ঢেলে এখানকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিশে যেতে হবে।

সভয়ে প্রতিমা বলল, আমি কি পারব ?

পারবে। আমার যখন টাকা আছে, তখন তোমার না পারার কোন প্রশ্নই উঠে না।—শিক্ষিকারা আসবেন, তাঁরাই তোমাকে এ-বিষয়ে তালিম দেবেন। শুয়ে পড়া যাক এবার, আলো নিভিয়ে দিয়ে এস।

এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মোটা মাইনে দিয়ে মোট চারজন শিক্ষিকাকে রাখা হল। তাঁরা ইংরাজি, এটিকেট ম্যানার্স, আধুনিক সাজপোশাক এবং মেকআপ-এর পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিমাকে শেখাতে লাগলেন।

দিন কেটে চলল। প্রতিমার শিক্ষাও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

বছর দেড়েক অতিক্রম করবার পর প্রতিমা আর প্রতিমা রইল না—পরিণত হল পামা মজুমদারে। এখন ও অনর্গল ইংরাজি বলতে পারে। সাজপোশাকে, চলনে-বলনে ও এখন পুরোমাত্রায় আধুনিকা। কে বলবে দেড় বছর আগে প্রতিমা গ্রামের মেয়ে ছিল।

প্রতিমার এই নিখুঁত রূপান্তরে রাজীব খুশি হল।

ইতিমধ্যে ওদের একটি বাচ্চা হয়েছে। রাজীব ছেলের নাম দিয়েছে রাজেশ।

ছ'টার আগেই মিল থেকে রাজীব ফিরল আজ। প্রতিমাকে বলল, তৈরি হয়ে নাও, আমাদের বেরুতে হবে।

কোথায় যাবে? গঙ্গার ধারে?

না; তোমাকে নতুন এক জায়গায় নিয়ে যাব। আমাদের সোসাইটি ক্লাবে; ভালই লাগবে তোমার সেখানে গিয়ে।

খেয়ে নাও এসে। আমি তারপর তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, জামা-কাপড় বদলে রাজীব ড্রইংরুমে এসে বসল। প্রতিমা তৈরি হয়ে এল মিনিট দশেক পরে। দুজনে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজীবের দৃষ্টি পড়ল মেজকাকার অয়েলপেন্টিংএর ওপর। চিত্রকর তাঁর মুখে যে হাসির ছোঁয়া এঁকে রেখেছে, মনে হল সেই হাসি যেন তাঁর মুখে নেই।

ওরা ক্লাবে পৌঁছল সাতটার অনেক পরে।

সকলে সবিস্ময়ে তাকাল—রাজীবের দিকে নয় কিন্তু; সকলের দৃষ্টি রাজীবের পাশের উগ্র আধুনিক সাজে সজ্জিতা, তন্বি তরুণীর ওপর। সভ্য-সভ্যারা সকলেই রাজীব মজুমদারের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তার মত বিলেত ফেরত মিলওনিয়ার লোক যদি নিজের ইচ্ছেয় গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে তাকে পাগলের পর্যায় ফেলাটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

কিন্তু এ মেয়েটি কে? সকল সভ্য-সভ্যাই বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছেন। প্রতিমাকে কেউই চেনেন না, তাছাড়া গ্রামের মেয়ের কাছ থেকে এই আধুনিক চালচলন আশা করা যায় না কখনই। কে? মজুমদার কি ছেঁড়া জুতোর মত সেই গ্রাম্য মেয়েকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, অন্য কোথাও থেকে এই আধুনিকাকে সংগ্রহ করেছে? তাই হবে।

সকলের মনের ভাব বুঝতে পেরে অল্প হেসে রাজীব বলল, ইনি আমার স্ত্রী পামা মজুমদার। বৌভাতের দিন এঁর সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবার সুযোগ পান নি।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

পামা মজুমদার! গ্রামের সেই লজ্জাবতী মেয়েটি!!

নির্মলাও উপস্থিত ছিল ঘটনাস্থলে। রণেশও। মাস আটেক হল ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেদিনের সেই তীব্র অপমান নির্মলা ভুলে যায় নি। কোন দিন ভুলবে না। তবু রাজীবের বাহাদুরীকে প্রশংসা করল মনে মনে।

দু-ঘণ্টার ওপর রাজীব ও প্রতিমা রইল ক্লাবে।

পিয়ানোর সামনে বসে সুরের ঝঙ্কার তুলল প্রতিমা। ইংরাজি সুরে বাংলা একটা গান গেয়ে চমৎকৃত করল সকলকে।

বিদায় নেবার সময় কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, আপনি লাকি চ্যাপ, এরকম স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

পরের দিন ওরা দুজন আবার ক্লাবে এসেছে।

তার পরের দিন আবার এবং পরিশেষে নিয়মিত।

এরপর কেটে গেছে চার-চারটে বছর।

রাজীবের এখন মরবার ফুরসত নেই। অসম্ভব কাজের চাপ বেড়ে গেছে। জুট মিল ছিল, সম্প্রতি কাচের একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্লাবে আর যেতে পারে না, মিল আর কারখানা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন রাত ন'টা হয়ে যায়। প্রতিমা একাই যায় এখন ক্লাবে। বলা বাহুল্য রাজেশ মানুষ হচ্ছে আয়ার কাছে।

অনেক দিন পরে আজ রাজীবের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যাটা ভালভাবে কাটাবে। রবিবার সারাটা দিন ছুটি থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা বেলা আধ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায় না; রাজ্যের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট তখন! অনেক তাড়াতাড়ি করেও সাড়ে সাতটার আগে রাজীব বাড়ি ফিরতে পারল না।

প্রতিমা বাড়ি ছিল না।

চাকরদের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল ও ক্লাবে গেছে। সাড়ে আটটার আগে বাড়ি ফেরে না। এত রাত অবধি প্রতিদিন ক্লাবে থাকে ও। আরেকটা বিষয় রাজীবকে বিস্মিত করল, প্রতিমার জন্যে যে গাড়ি নির্দিষ্ট আছে, সে-গাড়িও ব্যবহার করে না। ক্লাবে যায় ট্যাক্সি করে।

রাজীব ক্লাবে ফোন করল।

রিসিভার ধরলেন কৃষ্ণ চৌধুরী।—হালো—

রাজীব মজুমদার কথা বলছি। পামা আছে ওখানে?

না তো, তিনি আসেন নি। বহুদিন আপনিও তো আসেন নি এখানে।

খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে মিসেস চৌধুরী। আসছি একদিন শিগগির। আপনাকে বিরক্ত করলাম, দুঃখিত। গুডনাইট।

রাজীব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বেয়ারাকে এক কাপ কফি দিতে বলে বসল গিয়ে ড্রইংরুমে।

অনেক দিন পরে মেজকাকার অয়েল পেন্টিংএর দিকে তাকাল। মনে হল তাঁর মুখে ধিক্কারের হাসি। সময় সময় মেজকাকার হাসির ভাব কেন পাল্টে গেছে রাজীব বুঝতে পারে না।

ঘণ্টা দেড়েক পত্রিকার পাতা উল্টেই কাটিয়ে দিল।

প্রতিমা ফিরল ন'টার সময়। রাজীবকে ড্রইংরুমে দেখে বিস্মিত গলায় বলল, তুমি কখন এলে?

প্রায় দেড় ঘণ্টা হবে। কোথায় গিয়েছিলে?

কোথায় আবার, ক্লাবে।

রাজীবের মনে একটা বাঁকা প্রশ্ন ধূমায়িত হল। তবু সে স্বাভাবিক গলায় বলল, তাই বলো! আমি ভাবছিলাম, সিনেমা গেছ বুঝি।

সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না! সন্ধ্যা হতেই ক্লাবে চলে গিয়েছিলাম; এতক্ষণ ছিলাম ওখানেই।

রাজীব হাত ধরে টেনে প্রতিমাকে নিজের পাশে এনে বসাল। দু-হাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে আনল নিবিড়ভাবে। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, যে-কোন কারণেই হোক প্রতিমা তাকে মিথ্যে কথা বলছে। তবু সে ও-সম্পর্কে কিছু না বলে বলল, যত দিন যাচ্ছে, তুমি ততই সুন্দর হয়ে উঠছ—কে বলবে তোমার চার বছরের ছেলে আছে।

প্রতিমা ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল, থাক, আর এত সোহাগে দরকার নেই।

নেই কেন? কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার সুন্দর মুখ যখন মনে পড়ে যায়, তখন কি যে ভাল লাগে কি বলব।

আমারও সারা দিন তোমার কথা মনে পড়ে। এক এক সময় ইচ্ছে করে, লাঞ্চের সময় চলে যাই তোমার কাছে। তুমি খেতে থাকো আর আমি চুপটি করে বসে থাকি সামনে।

গেলেই তো পারো।

প্রতিমা সরে এল রাজীবের কাছ থেকে।

আর তোমার সঙ্গে বকতে পারি না বাপু, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। ডিনারটা চলো সেরে নিই, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাবে।

রাজীব ও প্রতিমা ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল।

ট্যাক্সিতে করে ক্লাবে যাও কেন?—এগুতে এগুতে রাজীব বলল।

কেন আবার! এমনি।

কাল থেকে নিজের গাড়িতেই যাবে।

বেশ।

দিন চারেক পরে আবার সকাল সকাল বাড়ি ফিরল রাজীব। প্রতিমা যথারীতি বাড়িতে অনুপস্থিত। আজ আর ক্লাবে ফোন করল না। ভ্রূ-কুঁচকে মিনিট কয়েক চিন্তা করে নিল; তারপর রওনা হল ক্লাবের উদ্দেশে।

ক্লাবে পৌঁছতেই রুদ্র চৌধুরী রাজীবকে সাদরে আহ্বান জানালেন। অনেকেই এগিয়ে এসে অনুযোগ জানালেন তার নিয়মিত ক্লাবে না আসার জন্যে। রাজীব লক্ষ্য করল প্রতিমা এখানে নেই।

রুদ্র চৌধুরী বললেন, মিসেসকে আনলেন না কেন?

তিনি মার্কেটিংএ বেরিয়েছেন।

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল অগত্যা।

আপনি তো বছর দুয়েক ধরে ক্লাবে আসা বন্ধ করেছেন। মিসেস মজুমদার আসতেন, তিনিও বোধহয় মাস আটেক আসেন নি। আপনারা সকলে ক্লাবকে বয়কট করলে কিভাবে চলবে বলুন?

রুদ্র চৌধুরীর অনুযোগের উত্তরে রাজীব একটু হাসল। কিন্তু তার বুকের মধ্যে গুরু গুরু রব তুলে ঢাক বাজছে। আট মাস! অথচ প্রতিমা তাকে সেদিন বলল, নিয়মিত ক্লাবে যায়! এখানে যে আসে না, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেল। কোথায় যায় তাহলে! তাকে লুকিয়েই বা যায় কেন?

আরও দু-চার কথা বলার পর ওখান থেকে বিদায় নিল।

ঘোরাল চিন্তা ভোঁতা ছুরির মতই রাজীবের মনকে টুকরো টুকরো করে কাটতে আরম্ভ করেছে। সে ক্লাব থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে গাড়িতে উঠতে যাবে, বাধা পেল। বাধা দিল নির্মলা।

চিনতে পারছ?

কে, নির্মলা? চিনতে না পারার তো কোন কারণ নেই।

নির্মলা আরও এগিয়ে এসে বলল, আমি যে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসব, নিশ্চয় ভাবতে পারো নি?

রাজীব নির্বিকার গলায় বলল, তুমি যে প্রথম শ্রেণীর বেহায়া, তা আমার জানা আছে। চলি এখন—

খুব ব্যস্ততা দেখছি? বৌকে খুঁজতে যাচ্ছো বোধহয়? তার সন্ধান যে এখন পাবে, তা তো মনে হয় না।

গাড়িতে উঠতে গিয়েও থামল রাজীব।

প্রশ্ন করল দ্রুত গলায়, কি বলতে চাইছ তুমি?

কথাটা শুনতে খুব ভাল লাগবে না। অবশ্য তোমাকে বলবার জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। তোমার পামাকে এখন পাবে সুমিত ভদ্রর

প্রাইভেট চেম্বারে।

সুমিত ভদ্র! সে কে?

একজন স্ট্রাগলিং ব্যারিস্টার। বাপ অনেক টাকা রেখে গেছে। তোমার শ্রীমতী যে এখন তাঁর হৃদয়বল্লভা।

নির্মলা!—রাগে ফেটে পড়ল রাজীব।

নির্মলা দৃঢ় গলায় বলল, চোখ রাঙাচ্ছো কাকে? আমি কি তোমার কেনা বাঁদী। লজ্জা করে না তোমার, নিজের স্ত্রীকে গ্রিপে রাখতে পারো না। আমাকে যে অপমান তুমি করেছিলে, তার প্রতিশোধ এইভাবে আমি নিয়েছি। লম্পট সুমিত ভদ্রর সঙ্গে পামার আলাপ আমিই করিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার সর্বনাশ করে আমাকে বিয়ে করো নি, সে-কথাও বলেছি তাকে।

এ-কথা সত্যি নয়।

না হোক, তবু তাকে বলেছি। আমার কথা বিশ্বাস করেছে তোমার প্রিয়তমা। আর সময় নষ্ট করব না তোমার। গুড নাইট রাজীব।

কথা শেষ করে নির্মলা বারান্দায় গিয়ে উঠল। রাজীব রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে উঠল গিয়ে। ঝড়ের বেগে ফিরে এল বাড়িতে। প্রতিমা তখনও ফেরে নি। বেয়ারাদের অবাক করে দিয়ে অস্থিরভাবে পোর্টিকোতেই পায়চারি করতে লাগল।

প্রতিমা ফিরল সাড়ে ন'টায়, ট্যাক্সিতে করেই ফিরল। পোর্টিকোয় রাজীবকে পায়চারি করতে দেখে বিস্মিত গলায় বলল, ব্যাপার কি? তুমি এখানে ঘুর ঘুর করছ?

তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ড্রইংরুমে এসো, কথা আছে।

আমি ভীষণ ক্লান্ত, জামা-কাপড় বদলাই গিয়ে। খাওয়ার টেবিলে বরং কথা হবে।

না। খাওয়ার টেবিলে নয়—রাজীব দৃঢ় গলায় বলল, এখুনি কথা বলতে চাই, এসো!

রাজীবের গম্ভীর মুখ আর ভারি গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে গেল প্রতিমা। কোন প্রতিবাদ না করে ড্রইংরুমে গেল স্বামীর পিছু পিছু। কাঁপা গলায় বলল, কি বলবে বলো?

কোথায় গিয়েছিলে?

ও, দেরি হয়ে গেছে বলে রাগ করেছ? প্রতিমা হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, কাল থেকে আর দেরি হবে না, আটটার সময় ফিরে আসবে দেখো।

প্রশ্ন এড়িয়ে যেও না, কোথায় গিয়েছিলে?

কোথায় আবার, ক্লাবে।

রাজীব এই মিথ্যে কথাটা শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

মিথ্যে কথা বলছো, ক্লাবে তুমি যাও নি।

না…মানে…

থাক, একটা মিথ্যেকে ঢাকতে আরেকটা মিথ্যের অবতারণা করো না। শুধু আজ নয়, গত আট মাসের মধ্যে তুমি ক্লাবে যাও নি। নিয়মিত কোথায় যাও, বলো?

প্রতিমা নিজের ভীত ভাব কাটিয়ে উঠেছে এতক্ষণে। আর দুর্বলতা প্রকাশ করলেই ভীষণ ভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়তে হবে। ও গম্ভীর গলায় বলল, তুমি যদি ওই ভঙ্গিতে আমাকে প্রশ্ন করো, আমি কোন উত্তর দিতে পারব না।

রাজীব গলায় বিদ্রূপ ঢেলে দিয়ে বলল, দেবার মত সুস্থ উত্তর তোমার কাছে নেই—তা আমি জানি।

নেই কেন? আছে। তুমি বস্তিতে বাস-করা স্বামীর মত স্ত্রীর ওপর জুলুম চালাবার উপক্রম করছো, তাই কোন উত্তর দেবে না।

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—রাজীব ওর পথ রোধ করল।

বলতে হবে তোমাকে। আমি শুনতে চাই।

বলব না।

প্রতিমা !!!

মারবে নাকি?

প্রয়োজন হলে …

প্রয়োজন হলে মারবে আমাকে! উঃ, আর বস্তির সঙ্গে কোন তফাৎ রইল না!

রাজীব চিৎকার করে উঠল, দোষ করার পর গলাবাজি করতে লজ্জা করে না! ভাবছো, আমি কিছু জানি না? সব জানি। স্কাউণ্ড্রেল সুমিত ভদ্রর সঙ্গে মেলামেশা করছো আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে—

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। দরজা ধরে নিজেকে কোন রকমে সামলালো প্রতিমা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজের দুর্বলতা জয় করে বলল, লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই মেলামেশা করি।

কেন করো জানতে চাই।

এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী তুমি। আমি গ্রামের মেয়ে, দুনিয়ার এত হালচাল জানতাম না। তুমি আমাকে সোসাইটি গার্ল করে তুললে। তারপর দিনের পর দিন আমাকে উপেক্ষা করে ব্যবসা নিয়ে মেতে রইলে! আমার সময় কাটবে কি ভাবে? শেষ পর্যন্ত তাই আমি সুমিতকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছি।

বন্ধু!—রাজীব শ্লেষের সঙ্গে বলল, বর্তমানে সেই লোকটার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, তাও আমি জানতে পেরেছি।

অভিজাত দুই নারী-পুরুষের কথা-কাটাকাটি সত্যি বস্তি-বাড়ি-পর্যায় এসে পৌছল।

প্রতিমা ঝলসে উঠল।—নিজের চরিত্রের কথা মনে রেখে পরকে বিচার করতে এসো। আমিও সব জানি। ওই নির্মলা—ওকে নিয়ে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করেছ তুমি। বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার ওরকম চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারে নি।

মিথ্যে কথা। নির্মলার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, এই পর্যন্ত—

বিয়ে করতে চাও নি, বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে দিনের পর দিন তার সঙ্গে অবৈধ যোগাযোগ বজায় রেখেছিলে। সব শুনেছি—নির্মলার মুখ থেকেই শুনেছি।

মিথ্যে কথা বলেছে তোমাকে। বিশ্বাস করো, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে তোমাকে।

কোন মেয়ে নিজের সম্পর্কে এই সমস্ত বাজে কথা বলতে পারে না। সকলে মিথ্যে কথা বলছে আর তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

রাজীব প্রতিমার দু-হাত চেপে ধরল এবার। অনুনয়ে ভেঙে পড়ল, মিথ্যে একটা ব্যাপারকে নিয়ে তুমি মাথা গরম করছ। অনর্থক কথা বেড়ে যাচ্ছে—যেতে দাও ও-সমস্ত। যা হবার হয়ে গেছে। আমরা এবার থেকে নিজেদের মধ্যেকার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বজায় রেখে চলতে পারি।

প্রতিমা এক ঝটকায় নিজের দুহাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং যেভাবে আছি ভালো আছি।

ও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে।

এক বাড়িতে বাস করলেও রাজীবের সঙ্গে প্রতিমার আর কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ায় প্রতিমা এখন বেপরোয়া। লুকিয়ে-ছাপিয়ে আর কিছু করে না, প্রকাশ্যে সুমিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে। হাত কামড়াতে থাকে রাজীব। এক-এক সময় ইচ্ছে করে গুলি করে সুমিত ভদ্রকে শেষ করে দেয়।

আবার ইচ্ছেকে দমন করতে হয় প্রবল ভাবে।

সুমিত ভদ্রর দোষ কোথায়? সম্পূর্ণ দোষ তার। প্রতিমার মনে মেকি আভিজাত্যের ছাপ মেরে দেবার জন্যে দায়ী সে স্বয়ং। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে,

শিক্ষিকা রেখে ওর মনের কোণে কোণে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাই-সোসাইটির নগ্ন রূপ। প্রতিমা গ্রামের মেয়ে, এই শিক্ষার ফলে দিশেহারা হয়ে গা ভাসিয়ে দেয়াই তো স্বাভাবিক।

রাজীব নিজের রাগকে কোন রকমে সামলে রেখেছে।

এই সময় ওকে ব্যবসার কাজে ইংল্যাণ্ড যেতে হল। কন্টিনেন্ট ট্যুর করে দেশে ফিরল প্রায় এক বছর পরে। প্লেন থেকে নেমে বাড়িতে যখন পা দিল, তখন রাত দশটা। প্রতিমাও ফিরল মিনিট কুড়ি পরে। রাজীবকে দেখেও দেখল না, চলে গেল নিজের ঘরে। মনে হল টলছে। বিচিত্র নয়, আজকাল হয়তো ড্রিঙ্ক করতে আরম্ভ করেছে। চরম হল। মজুমদার বাড়ির বৌ মদ খেয়ে রাত সাড়ে দশটার সময় টলতে টলতে বাড়ি ফিরল।

প্যারিসে রাজীবকে প্রতিমা চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল, ও আর এক সঙ্গে থাকতে চায় না। ভারতে ফিরে এসেই যেন ওর আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিমার অবস্থা দেখে তার মন অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল। রাজীব মনস্থির আগেই করে রেখেছে। হেস্তনেস্ত এখনই করে ফেলবে।

কায়রোর হোটেলে পরা পোশাক না বদলেই রাজীব প্রতিমার ঘরে গেল।

প্রতিমা খাটের ওপর আড় হয়ে পড়েছিল। অ্যালকোহলের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। সন্দেহের অবকাশ নেই—মদ খেয়েছে।

প্রতিমা রাজীবের দিকে তাকাল।—কিছু বলবে?

হ্যাঁ। তুমি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলে। সে-বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে চাই।

বিছানায় উঠে বসল প্রতিমা। অলস ভঙ্গিতে একবার কাঁধ নাচিয়ে নিয়ে বলল, আলোচনা করবার তো বিশেষ কিছু নেই। আমার বক্তব্য তোমাকে লিখে জানিয়েছি। আর কি? আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই চুকে যায়।

রাজীব শান্ত গলায় বলল, শুধু আলাদা থাকার ব্যবস্থা কেন, আমাদের দুজনের সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেই তো ভাল হয়।

সমস্ত সম্পর্ক?

সমাজের আমি একজন গন্যমান্য লোক নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। তোমার জন্যে আমি নিজের সম্মানকে আর খোয়াতে চাই না। তাছাড়া আমার টাকায় যা ইচ্ছে করে বেড়াবে, তাও আমি আর পছন্দ করছি না। সুতরাং—

ঘাড় বেঁকিয়ে প্রতিমা বলল, ডাইভোর্সের কথা বলছো? কোর্ট অবধি গিয়ে যদি কেলেঙ্কারি বাড়াতে চাও—বাড়াতে পারো, আমার আপত্তি নেই।

তবে মিউচুয়ালি ব্যবস্থা করে নিলেই ভাল হয়। বৌবাজারের বাড়িটা খালি হয়েছে। আমি ওখানে উঠে যাচ্ছি মাসে মাসে আমাকে দেড় হাজার টাকা দিলেই চলবে।

দেড় হাজার টাকা!

ওর চেয়ে কমে আমার মাস চলবে বলে তো মনে হয় না। ভেবে দেখ রাতভোর।

রাজীব আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সমস্ত কথা শুনে ফ্যামিলি ল-ইয়ার ওই কথাই বললেন।

রাজীবও ভেবে দেখল, আন্তরিক সম্পর্ক যখন কোনমতেই বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন এই ভাল। হিন্দু বিয়ে সুতরাং ডাইভোর্স করা যাবে না। অথচ প্রতিমার চাহিদা মত মাসোহারা দিতে না চাইলেও হয়তো খরপোশের আদায়ের জন্যে কোর্ট অবধি যাবে। তার চেয়ে দেড় হাজার টাকা দেওয়া ভাল। আর কিছু না হোক, রাজীব শান্তিতে বাড়িতে থাকতে পারবে।

দিন পাঁচেকের মধ্যে প্রতিমা বৌবাজারের বাড়িতে উঠে গেল; রাজেশও গেল তার সঙ্গে। বাড়িখানা আগেই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রতিমা আলাদা হবার পরও কিন্তু রাজীবের মনে শান্তি এল না। প্রত্যহই কোন-না কোন সূত্রে তার কানে আসতে লাগল প্রতিমার কেচ্ছা-কাহিনী; কান তার ঝালাপালা হয়ে উঠল।

চরম হল আজ সকালে চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে। দৈনিকের মাঝের পাতায় একটি হাফ-সাইজের ছবি ছাপা হয়েছে। বিষয়-বস্তু হল, একটি মেয়ে দরজার সামনে ফুটপাথের ওপর পড়ে আছে, বছর ছয়-সাতের একটি ছেলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবির তলায় লেখা রয়েছে, 'জনৈক বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পপতির স্ত্রী মাতাল অবস্থায় পথের ওপর পড়ে রয়েছে, ছেলে মায়ের কাণ্ড দেখছে!'

প্রতিমা ও রাজেশকে চিনতে পারল রাজীব। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল সমস্ত শরীর। প্রতিটি ফোঁটা রক্ত মাথায় উঠে গেল এক-মুহূর্তে। মজুমদার বাড়ির সম্মান বৌবাজারের ফুটপাথ অবধি নেমে এল শেষ পর্যন্ত!

এই সময়ে নরেন গুপ্ত এসে উপস্থিত হলেন।

রাজীব বাড়িতে ডেকেছিল তাঁকে। সকালে দুজনে গ্র্যাণ্ডে গিয়ে একজন বৃটিশ এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা করবে কথা ছিল। নরেন গুপ্ত কর্তার মুখের অবস্থা দেখে বললেন, শরীরটা কি আজ আপনার ভাল নেই?

রাজীব কিছু না বলে তাঁর দিকে দৈনিকখানা এগিয়ে ধরল। ছবিখানা দেখলেন তিনি। তাঁর সমস্ত কথাই জানা ছিল। রাজীব তাঁর সঙ্গে প্রতিমার ব্যাপার নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

শেষে রাজীব বলল, এখন আমি কি করব বলুন তো?

কথার পরিবর্তে তার গলা দিয়ে যেন হাহাকার বেরিয়ে এল।

তরুণ প্রভুর মনের শোচনীয় অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করে নরেন গুপ্তর মন উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি নরম গলায় বললেন, করণীয় কাজ তো আপনার একটিই রয়েছে।

কোন কাজ?

ছেলেকে নিয়ে আসুন ওখান থেকে। ওই পরিবেশে থাকলে শিশু-মনও বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রবীণ অভিজ্ঞ কর্মচারির দিকে এক নজর তাকিয়ে নিল রাজীব। কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন। এছাড়া বর্তমানে তার আর কোন কি করণীয় থাকতে পারে? কাজের কথা হল না কিছু। বৃটিশ এক্সপার্টের কাছে যাওয়া হল না। মিনিট দশেক পরে নরেন গুপ্ত বিদায় নিলেন।

রাজীব উঠে গিয়ে ফোন করল প্রতিমাকে।

হ্যালো—আমি রাজীব—তোমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা আছে—না, ফোনে সব কথা বলা যাবে না—চলে এসো না একবার এখানে—তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি—

রাজীব রিসিভার নামিয়ে রেখে জামা-কাপড় বদলে নিয়ে সিণ্টন কফি হাউসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। আগে প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে কতবার এসেছে, রাজীবের সেই সমস্ত সোনালী দিনগুলি এখন স্মৃতির পর্দায় ফুটে আছে শুধু। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিমা এল।

চেয়ারে বসতে বসতে বলল, এইভাবে ডাকাডাকি আমি পছন্দ করি না, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো। হাতে আমার সময় বিশেষ নেই।

নষ্ট করবার মত সময় আমারও নেই প্রতিমা। প্রয়োজনীয় কথাটা রাজেশকে নিয়ে—

রাজেশ! সে আবার কি করল?

কিছু করে নি, তবে তার সম্বন্ধে আমার কিছু করণীয় আছে। তুমি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছো কাটাও, আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু রাজেশের জীবন নষ্ট হয়ে যাক, তা আমি চাই না! তার জ্ঞান বুদ্ধি হচ্ছে ক্রমে, সে এখন যা দেখবে তাই শিখবে। তাছাড়া, ওই কদর্য পরিবেশের মধ্যে থেকে মায়ের ওপর তো বটেই, বাপের ওপরও তার ঘৃণার ভাব জাগবে। আমাদের

দুজনের পক্ষেই তা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আমার মতে…

তাকে কথা শেষ করতে দিল না প্রতিমা। তীব্র গলায় বলল, তোমার প্রতিটি কথাতেই আমার চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত থাকে, লক্ষ্য করেছি। ছেলে তোমার একার নয়, তার ভাল-মন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতা আমার আছে। তার সামনে আমি এমন কোন কাজ করি না, যাতে তার মনে নোংরা দাগ কাটতে পারে।

বিদ্রূপের হাসি হাসল রাজীব।

তোমার কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি, তার প্রমাণ আজকের একটি দৈনিকে রয়েছে। ছবিখানা নিশ্চয় দেখে থাকবে, তুমি মাতাল অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছো রাজেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তুমি কি বলো—এই দৃশ্য দেখে তার শিশু মনে কোন নোংরা দাগ কাটে নি।

এ-কথার কোন উত্তর দিল না প্রতিমা।

মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে বলল, তোমার ইচ্ছে রাজেশ এখন থেকে তোমার কাছে থাক, এই তো ?

না। তাকে দেরাদুন, গোয়ালিয়ার বা দার্জিলিংয়ের কোন কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া। ভালভাবে মানুষ হবার সুযোগ পাবে সে-সমস্ত জায়গায় রাজেশ।

তোমার পরিকল্পনা ভালই। আর কিছু বলবার আছে ?

বলবার আর কিছু নেই। ছেলেটাকে আজ আমি নিয়ে যাবো।

তুমি নিয়ে যাবে কেন ? পরিকল্পনা তো শুনলাম, যা করবার আমি করব।

রাজীব বিরক্তির সুরে বলল, সব ব্যাপারে জেদ ভাল লাগে না প্রতিমা। রাজেশকে তুমি বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আস নি। ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি তার বাপ। তার ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশি।

আমি তার মা, এ-কথাও ভুলে যেও না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, রাজেশের লেখা পড়ার যা খরচ করতে চাও, আমায় দিও। আমি কোন ভাল কনভেন্টেই তাকে ভর্তি করে দেব।

প্রতিমা !

সিন ক্রিয়েট করো না, এটা পাবলিক প্লেশ। চলি। মাসে শ'তিনেক টাকার কমে কিন্তু হবে না, জানিয়ে রাখলাম।

প্রতিমা কথা শেষ করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রাজীবও উঠল। কফি হাউসের বাইরে এসে দেখল, প্রতিমা মোটরে উঠেছে। দরজা খুলে দিয়ে তাকে মোটরে উঠতে সাহায্য

করছে একটি যুবক। এই স্মিত ভদ্র নাকি। না, অন্য কোন পতঙ্গ? নিশ্চয় ওরই গাড়ি চড়ে প্রতিমা এসেছিল! রাজীবের ইচ্ছে করল, ছুটে গিয়ে প্রতিমার টুঁটি চেপে ধরে। বেহায়াপনার এই সমস্ত দৃষ্টান্তকে চিরদিনের মত মুছে দেয়। অসীম বলে নিজেকে সংযত করল রাজীব।

রাজীব অফিসে ফিরে এল।

সারাটা দিন কাজে মন বসল না, অসংখ্য চিন্তা তাকে কুরে কুরে খেয়ে চলল। প্রতিমার অবহেলা ও উপেক্ষাকে এতদিন সে কৃপার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে, আজ মনে হচ্ছে সমস্ত কিছু সহের বাইরে চলে গেল। মনে হচ্ছে, এতদিন ধরে প্রতিমা যা কিছু করছে—প্রতিটি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেয়।

কি ভাবে? কি ভাবে?

বেয়ারা চা নিয়ে এল তিনটের সময়।

অকারণেই বাঁ হাতের এক ঝটকায় ট্রে-সমেত চায়ের পাত্র টেবিল থেকে সরিয়ে দিল। ঝনঝন করে মাটিতে ভেঙে পড়ল দামী ক্রকারিস।

চায়ের লিকারে ভিজে উঠল কার্পেট।

বেয়ারা প্রভুর কাণ্ডকারখানায় হতবাক।

রাজীব লজ্জিত হল। বেয়ারার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, কাচগুলো কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দাও।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল। দুর্বার বেগে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে তো রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে অবিরত পায়চারি করে চলল রাজীব। মিনিটের পর মিনিট ক্রমে ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গড়িয়ে গেল। শেষে—তার মনে হল, প্রতিমাকে যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায়, তাতেই বা কোন অসুবিধা হবে রাজীবের? সেও তো পারে বোহেমিয়ান লাইফ লিড করতে? নিশ্চয়ই পারে। পয়সা ফেললে কলকাতায় কিসের অসুবিধা!

আর চিন্তা নয়। রাজীব ওয়ার্ডরোব খুলে দামী টুইডের সুট বার করল। পরিপাটি করে নিজের প্রসাধন শেষ করল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সোয়া-সাতটা। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসল। প্রত্যহ এই সময় কফি খায়। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল।

সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাতে লাগল।

সাড়ে আটটায় বেরুবে। যাবে হোটেল পিকাডেলিতে। সন্ধ্যা বেলায় সেখানে জমায়েত হন শিল্পপতিরা। তাঁদের সঙ্গে আসেন অনেক মদালসা যৌবনবতী। তারপর আমোদ-আহ্লাদের নামে চলে কামনার হল্লোড়। সেখানে যাবার বহু অনুরোধ পেয়েছে রাজীব, যায় নি। আজ যাবে—আজ

থেকে যাবে প্রতিদিন।

সাড়ে আটটা বাজল।

কোচ ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই রাজীবের দৃষ্টি পড়ল মেজকাকার অয়েল পেন্টিংয়ের দিকে। তার মুখে আজও ধিক্কারের হাসি। ঝটিতে মুখ সরিয়ে নিল, ছবির দিকে তাকাবে না। মেজকাকার ছবির দিকে তাকালেই মনের মধ্যেটা কেমন গুমরে ওঠে। কিন্তু ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। রাজীবের পা-দুটো অনড় হয়ে গেল। মনে হল, মেজকাকা চেঁচিয়ে বলছেন, রাজেশ—রাজেশের কি হবে ?

তাই তো রাজেশের কি হবে ? এতক্ষণ ধরে চিন্তা করেও সে আসল বিষয় থেকে ছিটকে পড়েছে! প্রতিমাকে উপেক্ষা করে গেলেও রাজেশকে তো উপেক্ষা করা চলে না। তার আত্মজকে সে পাঁকের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে দেবে না।

হোটেলে পিকাডেলিতে আর যাওয়া হল না, চিন্তার গভীর সমুদ্রে রাজীব আবার তলিয়ে গেল। ঘণ্টা খানেক পার হয়ে গেলে আরো। শেষে নিজের মনকে দৃঢ়ভাবে বাঁধতে হল। রাজেশকে প্রতিমার কাছে আর রাখা চলবে না, ভয় দেখিয়ে জোর করে নিয়ে আসতে হবে। আর মান-সম্মানের ভয় করলে চলবে না, এর জন্যে প্রতিমা যদি কোর্ট অবধি যায়, যাক।

রাজীব আবার শোবার ঘরে ফিরে গেল। চাবি খুলে দেরাজের মধ্যে থেকে রিভলবার বার করে পকেটে রাখল। প্রতিমা কোন গোলমাল করবার চেষ্টা করলে—চেষ্টা কি, গোলমাল ও করবেই—রিভলবার দেখিয়ে ভয় দেখাবে তখন। যে গ্রাম্য মেয়েকে সে তথাকথিত পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, তার কাছে বারবার হেরে যেতে আর ভাল লাগে না।

বৌবাজারের বাড়িতে রাজীব যখন পৌঁছল, তখন দশটা বেজে গেছে।

দুজন চাকর আর আয়া তটস্থ হয়ে উঠল। জানা গেল প্রতিমা বাড়ি নেই। সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছে। রাজেশ ঘুমোচ্ছে ওপরের ঘরে। ভালই হল। এখনকার মত অন্তত গোলমাল এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল। রাজীব ওপরে গিয়ে ঘুম থেকে তুলল রাজেশকে। অসময়ে বাপকে দেখে ছেলের মিষ্টি মুখে বিস্ময়ের ছায়া নামল।

চলো, আমরা ও-বাড়ি যাই। রাজীব নরম গলায় বলল।

মা যাবে না ?

যাবে বৈকি! এখন শুধু তুমি আর আমি যাব। তারপর তোমাকে নিয়ে রেলে চড়ে আরেক জায়গায় যাব। সেখানে তুমি পড়াশুনো করবে—কেমন ?

অনভ্যস্ত হাতে রাজেশকে জামা-কাপড় পরালো রাজীব। ওকে নিয়ে নিচে নেমে এল। বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল এই সময়। নিশ্চয় প্রতিমা এল। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। গোলমাল এড়িয়ে যাওয়া গেল না।

কথাবার্তা ও হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল বাইরে থেকে। প্রতিমা একা নয়, সঙ্গে আরেকজন কেউ আছে। রাজীব রাজেশকে নিয়ে সরে এল আড়ালে। প্রতিমা ঘরে এল একজন সুবেশ যুবকের সঙ্গে। সাজ-পোশাকের কি জেল্লা!

প্রতিমা বলল, তুমি এবার যাও সুমিত—রাত হল।

সুমিত ভদ্র কায়দা করে হেসে বলল, যেতে ইচ্ছে করছে না তোমাকে ছেড়ে। আচ্ছা, এই ভাবেই চলবে নাকি চিরকাল?

চিরকালের ভাবনা পরে—এখন তো চলুক। কাল ক'টায় আসছো?

সুমিত সাপটে ধরল প্রতিমাকে।—ঠিক আটটায় আসব।

বিদায় নেবার আগে পাথেয় সংগ্রহ করবার জন্যেই বোধহয় সুমিত ভদ্র মুখ নামিয়ে আনল—বাধ সাধল রাজীব। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত শরীর থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে চিৎকার করে বলল, চমৎকার! মনে হচ্ছিল সিনেমার স্যুটিং দেখছি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজীবের আবির্ভাবে প্রতিমা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সুমিত ভদ্র ঘাবড়ে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে লোকটা?

অবশ্য আগেই প্রতিমার কাছ থেকে সরে এসেছিল।

রাজীব ফেটে পড়ল।—এ-বাড়ি আমার। ইউ ইডিয়েট, গেট আউট, গেট আউট। পরের স্ত্রীর সঙ্গে ইল্লিগাল কানেকশন রাখা—তোমার মত লোকেদের চাবকে লাল করা উচিত।···এখনো দাঁড়িয়ে আছো, হাউ ডেয়ার—! কিক্‌ড-আউট হতে চাও?

সুমিত ভদ্র আর দাঁড়াল না।

প্রতিমা নিজেকে ফিরে পেয়েছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত নেমে আসছে ওর মুখের ওপর। রাগে নিজের প্রবল ভাবে কাঁপা দেহটাকে টেবিল ধরে দাঁড় করিয়ে, তীব্র গলায় বলল, অসভ্য জানোয়ার কোথাকার—তুমিও বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।

যে-অবস্থায় ধরা পড়ে গেলে, তাতে তোমার লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত। তা নয়, আবার গলাবাজি করছো? অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। ইচ্ছে করছে, তোমাকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিই। গ্রামের পুরুত বাচস্পতির মেয়ে, ক' অক্ষর গোমাংস ছিল তোমার কাছে! আমি তোমাকে দুনিয়া

চেনাগাম, সেই তুমি শিক্ষার অমর্যাদা করে বেলেল্লাপনা করছো ?

প্রতিমা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইংরাজী সিনেমার নায়িকার ঢং-এ তোমার আর কিছু বলবার আছে কি ?

তোমাকে আর কিছু বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এবার আইন কথা বলবে। কোন রকম আর্থিক সাহায্য আর তুমি পাবে না। কাল সকালে বাড়ি থেকে যদি বেরিয়ে না যাও, পুলিশ তোমাকে অপমান করে বার করে দেবে।

মগের মুল্লুক নাকি ! আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক চার্জ আনতে পারি। আদালতের দরজা আমার কাছে বন্ধ নয়।

আদালতে যেতে পারো। দেখা যাবে মোকদ্দমা লড়তে রেস্ত কে জোগায় ! ফুটপাথে যখন গিয়ে দাঁড়াবে, দুনিয়ার আসল রূপ দেখতে পাবে তখন। সুমিত ভদ্রর মত প্রাণের বন্ধুরাও তখন এগিয়ে আসবে না।

রাজীব রাজেশকে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগোল।

ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?

বাড়ি।

ওকে নিয়ে যাওয়া হবে না।

রাজীব এই কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে এগোল।

প্রতিমা ছুটে এসে ছেলেকে ধরবার চেষ্টা করল। রাজীব এক ধাক্কায় ফেলে দিল ওকে। একটা টিপয়ের ওপর প্রতিমা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল। তারপর—তারপর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে, টেবিলের ওপর থেকে ব্রোঞ্জের টেবিল-ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে সজোরে রাজীবের ঘাড়ে আঘাত করল।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠল।

আচমকা আঘাতে রাজীবের শরীর ঝনঝনিয়ে উঠল। আঘাতের জায়গায় চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। টেবিল-ল্যাম্পের বাল্বের পাতলা কাচ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের এখানে-ওখানে।

প্রতিমা রাজীবকে আঘাত করেই বাইরের দিকে দরজা বন্ধ করে দাঁড়াল ছিটকিনি আড়াল করে। রাজেশ মা-বাবার কাণ্ডকারখানায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। তার একটা হাত বাবার মুঠোর মধ্যে। রাজীব মাথা ঘুরিয়ে একবার ক্ষতস্থানটা দেখে নিল। ব্রোঞ্জের ভারি টেবিল-ল্যাম্পটা তখনো প্রতিমার হাতে রয়েছে।

ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজেশকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আবার আমি মারব।

আর কোন উপায় নেই। প্রতিমা রাজীবকে বাধ্য করেছে।

পকেট থেকে রাজীব রিভলবার বার করল—সরে দাঁড়াও। আমি ধৈর্যের

শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে আর ঘাঁটালে গুলি চালিয়ে দেব।

ফাঁকা আওয়াজে আমি ভয় পাবো না। রাজেশকে রেখে তুমি জাহান্নামে যেতে চাও, যেতে পারো।…রিভলবার দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে! ছোট-লোক, ইতর, চামার—

এরপর নিজেকে সংযত রাখা যায় না। রাজীবও রাখতে পারে নি। তবু ট্রিগারে আঙুলের চাপ জোরে হোক, তা সে চায় নি। কিন্তু সেই না-চাওয়া জিনিসটাই ঘটে গেল। সেফটি ক্যাচ যে আগেই তোলা আছে, একথা তো তার জানা ছিল। একবার নয়, পর পর দু'বার গুলি খেয়ে আর্ত-চিৎকার করে প্রতিমা ঘুরে পড়ে গেল মেঝেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ওর সমস্ত শরীর দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

রাজীব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে ডাকল, রামু—

দুজন চাকর ও আয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। তাদের বুঝে উঠতে অসুবিধা হচ্ছে না ঘরে কি হয়েছে। রাজীবের চিৎকারে রামু দরজার কাছে এল।

আমার নাম করে ডাক্তার মিত্রকে এখুনি ডেকে নিয়ে এসো।

রামু ডাক্তার ডাকতে ছুটল।

রিভলবারের আওয়াজে রাজেশের মূর্ছার মত হয়েছে। রাজীব আয়াকে ডেকে ওপরে নিয়ে যেতে বলল।

ফিনকি দিয়ে রক্ত আর পড়ছে না। প্রতিমার দামী শাড়ি বেয়ে চটচটে রক্ত গড়িয়ে চলেছে। যন্ত্রণায় ওর শরীর আর কুঁকড়ে যাচ্ছে না। নিথর, নিষ্কম্প হয়ে গেছে।

রাজীব অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হন্তদন্ত হয়ে ডাঃ মিত্র ঘরে ঢুকলেন। মজুমদার-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেক দিনের। চাকরের মুখেই তিনি অবিশ্বাস্য কথাটা শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে দ্রুত পরীক্ষা করলেন প্রতিমাকে। রাজীব তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রইল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মারা গেছেন।

মারা গেছে! প্রতিমাকে রাজীব মেরে ফেলল!

বুকের মধ্যে হাহাকার জাগল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে রাজীব বলল, ডাক্তার মিত্র, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন?

থানায় খবর পাঠিয়ে দিন। আমি পুলিশের জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করব।

রাজীব ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত দেড়টার সময় পুলিশ এল।

ডাঃ মিত্রর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে, বৌবাজারের বাড়ি গিয়ে মৃতদেহের ব্যবস্থা করে এবং চাকরদের এজাহার নিয়ে ইন্সপেক্টার এ-বাড়িতে এলেন। রাজীব এই সময়ের মধ্যে নিজের উইল লিখে ফেলেছে। নিজের হাতে লিখেছে, কাজেই সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিছু সে রাজেশকেই লিখে দিল। শুধু সাবালক না হওয়া পর্যন্ত দত্তচৌধুরী য়্যাটর্নি ফার্ম ওকে গাইড করবে।

রাজীবের বৈষয়িক কাজকর্ম দত্তচৌধুরী ফার্মই করে।

ব্যক্তিগত আলাপ না থাকলেও, রাজীবের মত বিখ্যাত শিল্পপতির নাম ইন্সপেক্টারের অজানা ছিল না। তিনি কিভাবে কথা আরম্ভ করবেন প্রথমে স্থির করতে পারলেন না। অন্যান্য সাধারণ হত্যাকারীর সঙ্গে এঁর পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

রাজীবই প্রথম কথা বলল, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম ইন্সপেক্টার।

ইন্সপেক্টার সসম্ভ্রমে বলল, একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে স্যার।

স্টেটমেণ্ট ? দেব, থানায় গিয়েই দেব। ভাল কথা, আমি আমার য়্যাটর্নির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

প্রাথমিক কাজকর্মগুলো চুকে যাবার পর সে-ব্যবস্থা আমরা করে দেব।

রাজীব মেজকাকার অয়েলপেণ্টিংয়ের দিকে আর তাকাল না। মাথা নত করে ইন্সপেক্টারকে অনুসরণ করল।

যথা সময়ে কেস উঠল কোর্টে।

চাঞ্চল্যকর কেস। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। একজন তরুণ শিল্পপতি তার সুন্দরী স্ত্রীকে গুলি করে মেরেছে—এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা নিয়মিত ঘটে না। কাজেই জনসমাজে চাঞ্চল্য আসবে।

রাজীব পুলিশের কাছে খুন করবার কথা অস্বীকার করে নি। তার ব্যবহারজীবি আদালতেও সে-কথা অস্বীকার করলেন না। তিনি তাঁর মক্কেলের হয়ে যে যুক্তিজাল বিস্তার করলেন, তার সারমর্ম হল, একটি গ্রাম্য মেয়েকে রাজীব মজুমদারের মত শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি যেচে বিয়ে করেছিলেন।

তাঁর পিছনে অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করে তাঁকে শিক্ষা ও রুচিতে আধুনিক করে তুলেছিলেন। তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁকে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস ও ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারেন নি। নোংরা জীবন বেছে নিয়েছিলেন তিনি। আমার মক্কেলের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। তবু তিনি কোন রকমে সমস্ত সয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার দিন অবস্থা চরমে উঠল। মৃতা মিসেস মজুমদার ভারি ব্রোঞ্জের টেবিল-ল্যাম্প নিয়ে আমার মক্কেলকে আক্রমণ করলেন, আর কোন উপায় ছিল না, আত্মরক্ষার তাগিদে মিস্টার মজুমদার—ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

পরিশেষে আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবি বিচারপতির কাছে আবেদন জানালেন, আসামীর উপায়হীন অবস্থা এবং তাঁর বংশমর্যাদা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করে তাঁর লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক।

দীর্ঘ দিন ধরে কেস চলল।

অসংখ্য সাক্ষীকে নেড়ে-চেড়ে দেখা হল। তুচ্ছ ও বিরাট বিষয়ের ওপর তর্কবিতর্ক হল। পরিশেষে বিচারপতি রায় দিলেন। মৃত্যুদণ্ড অবশ্য হল না, তবে লঘুদণ্ডও দিলেন না। বিশ বছর জেলে যাবার জন্যে আদেশ প্রদত্ত হল।

ভেতরে প্রবল ঝড় বইলেও, রাজীব শান্তভাবে নিজের দণ্ডাদেশ শুনল। জেলের গাড়িতে চড়বার আগে রিপোর্টাররা ঘিরে ধরল তাকে। প্রশ্নের বৃষ্টি হতে লাগল। রাজীব কারুর কথার উত্তর দিল না, শুধু হাসল একটু।

এরপর কত বছর কেটে গেছে।

রাজেশ মাঝে মাঝে জেলে এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হলেই রাজীব ছেলেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছে। রাজেশ ছেলে খারাপ নয়। যোগ্যতার সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আই-এ পাশ করেছে। অল্প বয়সে যোগ দিয়েছে নিজের ব্যবসায়। এখন তার শরীরে যৌবনের জোয়ার। বলতে গেলে ছেলের দিকে তাকিয়েই রাজীব জেলের কঠোর পরিশ্রম হাসি মুখে সহ্য করে যাচ্ছে।

সেন সাহেব নিজের গল্প শেষ করলেন। দেবী দত্ত তন্ময় হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। তাঁর তন্ময়তা ভেঙে গেল, তিনি গা ঝাড়া দিয়ে বসলেন; বললেন, বিচিত্র জীবন ৩২৩-এর। আশা করা যায় ভদ্রলোক জেল থেকে বেরিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাবেন।

কিছুই বলা যায় না। ব্যাস্টার মানুষের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফলো করে।···নটা বেজে গেছে, আপনি এবার নিজের কাজ সেরে নিন ডাক্তার।

ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে দেবী দত্ত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমস্ত করণীয় কাজ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হল।

৩২৩কে আনা হল অফিস-ঘরে।

দীর্ঘ উন্নত দেহ। রঙ টকটকে ফরসা ছিল, এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত মুখ। কপালে বলিরেখা। রগের কাছে চুল কিছুটা পেকেছে। গায়ে এখন কয়েদীর পোশাক নেই, আঁট-সাঁট সিভিলিয়ান ড্রেস।

সেন সাহেব ৩২৩-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আবার সামাজিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন। জেলের স্মৃতি আপনার মন থেকে কোনদিন মুছে যাবে না জানি। আমার কোন ব্যবহার যদি বিশেষ ভাবে ব্যথিত করে থাকে, জানবেন তা নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে আমাকে করতে হয়েছে :

আপনার ব্যবহার কোনদিন আমাকে ক্ষুন্ন করেনি। বরং আপনি যে আমার খাতির-যত্ন কিছুটা করেছেন, তার প্রমাণ পুরনো জামা-কাপড় আমার ভীষণ আঁট হয়েছে—আমি মোটা হয়ে গেছি।

সেন সাহেব হাসলেন।

এই মুহূর্তে আপনার কোন্ কথা সব চেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে ?

এখন আমার মনে হচ্ছে, জেল থেকে বেরিয়েই আমি যেন আমার ছেলেকে দেখতে পাই।

আরো দু-চার কথা ও অফিসিয়াল অনুশাসনের শেষ পর্ব অতিক্রম করবার পর ৩২৩কে জেলের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

সেণ্ট্রাল জেলের বাইরে লোকে লোকারণ্য।

রাজেশ গেটের দিকে তাকিয়ে মোটরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেহারায় রাজেশ সম্পূর্ণ বাপের প্রতিচ্ছবি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওর মামা দেবেনবাবু। দেবেনবাবু মিলের একজন পদস্থ কর্মচারি। বিয়ের পর বোনের সুপারিশে তিনি ওখানে চাকরি পেয়েছিলেন।

ঝনঝন শব্দ হল।

লোহার বিরাট গেট খুলল না; খুলল একটা ফোকর। একজন লোক সহজেই সেই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে। রাজীব বেরিয়ে এলেন সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে। রাজেশ দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

বাপ ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

মিল আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কর্মচারি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। কর্মচারিরা তাঁকে মালা পরিয়ে দিতে লাগল, মালার ভারে তিনি ঝুঁকে পড়লেন। সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করে হাসি মুখে গাড়িতে

গিয়ে বসলেন। মুখে হাসি থাকলেও মনের মধ্যে রাজীব হু-হু করে কাঁদছিলেন। কান্নার ভারে তার মন কেন ভারাক্রান্ত, তা তিনি নিজেই জানেন না। হয়তো প্রিয়, অতি পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আসার আনন্দে এই হৃদয়াবেগ।

নিপুণ হাতে গাড়ি চালিয়ে রাজেশ বাবা ও মামাকে নিয়ে এল বাড়িতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন রাজীব। যেখানকার যা, ঠিক তেমনি রয়েছে; তেমনি ঝকঝকে তকতকে। রাজীব ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন, তাকালেন মেজকাকার তৈলচিত্রের দিকে। আজ তিনি মেজকাকার হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন না—বিদ্রূপ কি শ্লেষ, ধিক্কার কি প্রশ্রয়—কিসের হাসি কে জানে! রাজীব ছবির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ডাকলেন,—রাজেশ!

বাবা।

মেজকাকার ছবিখানা এ-ঘর থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে।

রাজেশ বিস্মিত হলেও মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করে বলল, কালই সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করব।

কাল নয়, আজ।

বেশ।

রাজীবের দিন পনেরো সময় লেগেছিল সহজ হতে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন ভাল খাবারের স্বাদ বুঝতে পারলেন না। এত বছর ধরে এক নাগাড়ে পোড়া রুটি খেয়ে খেয়ে জিভ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, পনেরো দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এল।

রাজেশ বলল, তোমার এখন প্রচুর বিশ্রামের দরকার আমি বলি বাইরে ঘুরে এসো বাবা, মাসকয়েকের জন্যে।

বাইরে! কোথায় বলতো?

সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাস ছ'য়েক গিয়ে থাকলেই সব দিক থেকে ভাল হয়।

ছেলের কথায় গলা ছেড়ে হাসলেন রাজীব। সস্নেহে বললেন, পাগল ছেলে—বিশ্রামের জন্যে সুইজারল্যাণ্ড দৌড়াব?

দৌড়ালেই বা!

দেবেনবাবু বললেন, এখন আপনার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন, জামাইবাবু!

রাজীব জেলে চলে যাবার পর দেবেনবাবু স্ত্রীকে নিয়ে এ-বাড়িতে চলে এসেছিলেন। না এসে উপায় ছিল না, রাজেশকে মানুষ করা ও এই বিরাট

বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করার তখন আর কে ছিল। রাজীব ফিরে আসার পর দেবেনবাবু চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাপ ও ছেলে দুজনেই ঘোর আপত্তি তোলায় তাঁকে থেকে যেতে হয়েছে এখানে।

তোমরা বুঝতে পারছ না, এত বছর হাতুড়ি চালিয়ে আর কোদাল ঠেঙিয়ে কাটালাম. এখন হঠাৎ বিশ্রাম নিলে শরীরের অভ্যন্তরে গোলমাল দেখা দেবেই। আমি অ্যাকটিভ থাকতে চাই।

রাজেশ বলল, তোমার কথা অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তাহলে তুমি নিয়মিত অফিস করতে আরম্ভ করো, অ্যাকটিভ থাকবে।

আমিও সেই কথাই ভেবেছি ; তবে তুমি যে এই ফাঁকে সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাবে, সেটি হবে না! কোম্পানীর ডিরেক্টার তুমিই থাকবে, আমাকে হাজার খানেক টাকা অ্যালাউন্স দিলেই চলবে।

তুমি কি বলছ বাবা! আমি চার হাজার টাকা আলাউন্স নেব, আর তুমি মাত্র···

কি হয়েছে তাতে! তাহলে ওই কথাই রইল, আমি কাল থেকে মিলে বেরুব।

পরের দিন রাজীব মিলে গেলেন। আগে যে-ঘরে বসতেন সেই ঘরে গিয়ে বসলেন। আগেকার মত কোন্নগরেই সমস্ত কিছু সীমাবদ্ধ নেই, এখন ডালহাউসিতে বিরাট অফিস হয়েছে। ওখান থেকেই সমস্ত ব্যবসা অপারেট হয় ; কোম্পানীর তরুণ ডিরেক্টার রাজেশ মজুমদার ওখানেই বসে।

স্থির হয়েছে রাজীব মিল পরিচালনা করবেন। তিনি প্রথমেই নরেন গুপ্তর অনুসন্ধান করলেন। জানা গেল, বছর ছ'য়েক আগে গুপ্ত মারা গেছেন। অফিসেই স্ট্রোক হয়েছিল তাঁর বাড়ি যাবার পথে মারা গেলেন।

রাজীবের কর্মজীবন আবার আরম্ভ হল। বাঁধা-ধরা ছকে বাঁধা জীবন যাত্রা। মিলে আসেন—সারাটা দুপুর কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন, বাড়ি ফিরে যান বিকালে। দেবেনবাবুর সঙ্গে টেনিস খেলেন খানিক, তারপর লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসেন বই মুখে করে।

ডিনারের টেবিলে দেখা হয় রাজেশের সঙ্গে। কাজ সেরে সাড়ে আটটার আগে কোনদিন ও বাড়ি ফিরতে পারে না। খাবার টেবিলে গল্প হয় দুজনের মধ্যে। নানা বিষয় নিয়ে গল্প হয়। ব্যবসার কথা হয়। তারপর যে-যার ঘরে আশ্রয় নেয়, ঘুমের বাড়ি পাড়ি দেবার জন্তে।

এই তো জীবন!

এক মাসেই রাজীব হাঁপিয়ে উঠলেন। শুধু যে হাঁপিয়ে উঠলেন তাই নয়, ওই সঙ্গে এক উৎকট বাসনা তাঁর মনে বাসা বাঁধল। যৌবনে ইংল্যাণ্ড থেকে

ফেরার পর একঘেয়েমির দরুন একাকিত্ব বোধ করেছিলেন তিনি, প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল জীবন-সঙ্গিনীর; এখনও—এই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেও জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে একটি নারীর সান্নিধ্য পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

রাজীবের রাতে-বেরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। ঈর্ষা জাগছে সেই সমস্ত মানুষের ওপর যারা শয্যা-সঙ্গিনীর সুখ-স্পর্শ নিয়ে ঘুমের কোলে ঢোলে রয়েছে। তাঁর সব আছে, শুধু ওই সুখ থেকে তিনি বঞ্চিত। তবে বিয়ে আর করবেন না। বয়স হয়েছে বা লোকে কি বলবে, সেই কারণে নয়—বিয়ে করে একবার প্রচণ্ড ঠকেছেন। ও-পথ আর তাই মাড়াবেন না। বলতে গেলে বনের ময়ূরী তিনি এনেছিলেন। খাঁচায় বন্ধ করে রাখবার মনোভাব তাঁর ছিল না। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন…যাক, সে-কথা।

বিয়ে না করেও তো নারীসঙ্গ পাওয়া যায়। নিজের স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে না নেমে মনকে পরিতৃপ্ত করার সহস্র উপায় না থাক, গোটা কয়েক উপায় তো আছেই. বরং দায়িত্ব তাতে অনেক কম।

নিজের মন-স্থির করে ফেললেন রাজীব। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। ওখানে লেডি সেক্রেটারিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করা রীতিমত একটা ফ্যাসান। তিনিও ওই ফ্যাসানে যদি গা ভাসিয়ে দেন, ক্ষতি কি? মিলের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কয়েকটি লেডি টাইপিস্ট আছে লক্ষ্য করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে সহজেই একজনকে বেছে নেওয়া চলে। কিম্বা পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলে তো কথাই নেই—অজস্র মেয়ে আবেদন করবে। তাদের মধ্যে কি দু'চারটে সুন্দরী মেয়ে না পাওয়া যাবে।

ডিনার টেবিলে বললেন কথাটা রাজেশকে। না বললেও ক্ষতি ছিল না, তবু বললেন।—একজন সেক্রেটারি না হলে আমার আর চলছে না।

রাজেশ বলল, হৃদয়বাবুকে তোমার সেক্রেটারি হিসাবেই অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে বাবা। তিনি কি…

আধবুড়ো লোকদের দিয়ে কি কোন ফাষ্ট ওয়ার্ক হয়! আমি চটপটে ধরনের একটি মেয়ে সেক্রেটারি প্রেফার করছি। ওহে দেবেন, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।

দেবেনবাবু খাবার টেবিলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছু বলবার আগেই রাজেশ বলল, বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই, ওরকম একটি মেয়ে অফিসেই আছে। আমি মিস গাঙ্গুলীর কথা বলছি মামা।

দেবেনবাবু বললেন, সুপর্ণা গাঙ্গুলীর কথা বলছ? মেয়েটি বেশ চটপটে। তাছাড়া ওকে স্পেয়ার করা যাবে।

দেখতে কেমন জানবার উৎসুক্য থাকলেও রাজীব বাহ্যিক কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

পরের দিন সুপর্ণাকে চাক্ষুস দেখে খুশি হলেন। নিঃসন্দেহে মেয়েটি সুন্দরী। স্মার্ট। মনে মনে এই রকম লেডি সেক্রেটারি তিনি চেয়েছিলেন।

সেই দিনই অন্যান্য স্টেনো টাইপিস্টদের মনে জ্বালা ধরিয়ে সুপর্ণা রাজীবের ঘরে তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসল। মনে প্রচুর ভয় ছিল—না জানি, কত ঘোরাল কাজ তাকে করতে হবে। কার্যক্ষেত্রে তেমন ভয়ের কিছু দেখা গেল না, সারাটা দিন সুপর্ণা বসেই রইল।

রাজীব তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলেছেন। কোন কাজের কথা নয়, গালগল্পই বলা চলে। সুপর্ণা বিস্মিত হয়ে শুনেছে; প্রয়োজন বোধে উত্তর দিয়েছে দু-চারটে। তবে একটা জিনিস তাকে সারাটা দুপুর অস্বোয়াস্তির মধ্যে রেখেছে। রাজীব মজুমদারের চোখ; তার দুটি তীক্ষ্ণ চোখ সর্বক্ষণ যেন সুপর্ণাকে লেহন করেছে।

চারটের সময় রাজীব অফিস থেকে বেরুল।

যাবার সময় বলে গেলেন, তোমার ছুটি।

সুপর্ণা ছুটি হবার এক ঘণ্টা আগে আজ অফিস থেকে বেরুল।

সুবীর ঘড়ির দিকে তাকাল, পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট দেরি আছে! আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। মিনিট কুড়িক আগে মিলে একবার রাউণ্ড দিয়ে এসেছে। আজ যেন একটু বেশি ক্লান্ত লাগছে। টাই-নাট ঠিক করে নিয়ে, হ্যাঙ্গার থেকে কোট খুলে নিয়ে পরল।

এখন নিশ্চয়ই অফিস থেকে বেরুতে পারে নি সুপর্ণা। আজ তার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘর থেকে বেরুবার আগে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। বিরক্ত মনে টেবিলের কাছে এসে সুবীর রিসিভার তুলে নিল। এই সমস্ত উটকো ঝামেলা ভীষণ বিশ্রী লাগে।

হ্যালো!···

রাজেশ মজুমদার স্পিকিং—ব্যানার্জী কথা বলছেন?

সুবীর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।—হ্যাঁ স্যার—

আপনাকে এখুনি একবার হেড অফিসে আসতে হবে। কোন অসুবিধা হবে কি?

অসুবিধা বিলক্ষণ হবে, কিন্তু সে-কথা সুবীর প্রকাশ করতে পারে না। বিরস মুখে বলল, আমি এক্ষুণি আসছি স্যার।

ধন্যবাদ।

লাইন কেটে গেল!

বিরক্ত মনে সুবীর গাড়িতে এসে বসল। কোথায় সারাটা সন্ধ্যা সুপর্ণাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবে; তা নয়, নতুন কাজের খচাখচির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। মিল থেকে বেরিয়ে সুবীর স্টেশনের কাছে এল। কি আশ্চর্য! সুপর্ণা দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায়। এত তাড়াতাড়ি ও এখানে এল কিভাবে!

গেট খুলে দিতেই সুপর্ণা গাড়ির ভেতরে এসে বসল। অনুযোগভরা গলায় বলল, ফোরম্যান সাহেবের এতক্ষণে সময় হল বুঝি? আমি প্রায় একঘণ্টা হল দাঁড়িয়ে আছি।

চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়েছ নাকি! কিভাবে বেরুলে? তুমি তো আজ থেকে বাঘের গহ্বরে রয়েছ?

মৃদু হেসে বলল, বাঘ চারটের সময় আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

সুবীর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

সারা দুপুর বুড়ো মজুমদার বোধহয় তোমায় খুব খাটাল?

বরং উল্টোটাই ধরতে পারো। বসেছিলাম সারা দুপুর, বুড়ো মাঝে মাঝে গল্প করেছে।

গল্প করেছে! বলো কি?

আমিও অবাক হলাম। তাছাড়া এমন দৃষ্টিতে চাইছিলেন বারবার, যে কি বলব!

সুবীর মৃদু হেসে বাঁ হাত দিয়ে সুপর্ণাকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, সুন্দরী মেয়েদের দিকে সকলে বিশেষ দৃষ্টিতেই তাকায়। তরুণ ও বৃদ্ধের পার্থক্য এখানে বোধহয় নেই। মাইনে তোমার বাড়ল বলে। বুড়ো যখন তোমার দিকে বিশেষ দৃষ্টি হানবে, তুমিও তখন মন-মাতানো হাসি হাসবে। এরপর আর দেখতে হবে না!

অসভ্য কোথাকার।—সুপর্ণা ওর কাছ থেকে সরে আসবার চেষ্টা করল।

মাঝে মাঝে হেসেই দেখো না—এই অসভ্যের কথা ঠিক ফলবে। ধাপে ধাপে তোমার মাইনে চড়তে থাকবে।

ঠাট্টা রাখো, আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন?

সুবীরের গলার আওয়াজ পাল্টে গেল,—যাবার তো ইচ্ছে ছিল অনেক জায়গায়, সব প্রোগ্রাম মাটি হয়ে গেল। কড়া হুকুম, এখুনি হেড অফিসে যেতে হবে। কি বিশ্রী কাণ্ড বলো তো?

সুপর্ণা ম্রিয়মান হয়ে গেল।

আমাকে পার্কের কাছে নামিয়ে দিও তাহলে।

সুবীর কিছু বলল না, ভ্রূ-কুঁচকে স্টিয়ারিং ধরে বসে রইল। দ্রুতগতিতে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

এই—

বলো ?

চুপ করে গেলে কেন ?

আমার কাছে যদি হাজার ত্রিশেক টাকা থাকত, চাকরি ছেড়ে দিতাম। এ-রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে সব সময় ভাল লাগে না।

টাকা থাকলে কি করতে ?

ব্যবসা করতাম। যখন টাকা নেই, তখন ও-নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক। শোনো পর্ণা, আমি ভাবছি কাল যাব তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

সুপর্ণা একটু চুপ করে থেকে বলল, কি দরকার দেখা করে।

কি দরকার মানে ? তাঁর অনুমতি তো নিতে হবে। আসল কথা কি জানো, ফাল্গুন মাসটা আমি পার হতে দিতে চাই না।

মাকে না জানিয়েও তো আমরা বিয়ে করতে পারি।

পারি হয়তো ; কিন্তু জানিয়ে সমস্ত কিছু করাই তো শোভন।

না, মাকে কোন কিছু জানাবার দরকার নেই।

কেন পর্ণা ?

তুমি জানো না, মা সমস্ত ভণ্ডুল করে দেবেন। এদিকে তো তোমাকে বলেছি সব কথা, তিনি আমাকে চড়া দরে কোন অর্থ-পিশাচের হাতে বিক্রি করতে চান। সেই পিশাচটিকে এখনও সংগ্রহ করতে পারেন নি, তাই আমার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে নি। তিনি যদি বুঝতে পারেন আমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে ফেলেছি, তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। কি দরকার ঝামেলার মধ্যে যাবার, বিয়ের পর ওঁকে সংবাদ দিলেই হবে।

বেশ।

ও-প্রসঙ্গে আর কোন কথা হল না।

হালকা আলাপ আলোচনার মধ্যে আরো কিছুক্ষণ সময় কাটল। ওরা কলকাতার সীমায় এসে পৌঁছল। নর্থে থাকে সুপর্ণা। পাঁচমাথার মোড়ে গাড়ি থামাতে বলল।

এখানে কেন ;—সুবীর বলল, পার্কের সামনে নামিয়ে দিই বরং।

না, এখানেই নামি। উল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরব।

সুবীর গাড়ি থামাল। মিষ্টি হেসে ওর কাছ থেকে বিদায় নিল সুপর্ণা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে ভ্যারাইটি কর্ণারে গিয়ে ঢুকল।

হাফ পাউণ্ড উল কিনে নিয়ে দোকান থেকে বেরুল মিনিট দশেক পরে। বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সার্কুলার রোড পেরিয়ে সুপর্ণা একটা গলিতে ঢুকল। গলি পেরিয়ে দেশবন্ধু পার্কের সামনে পৌঁছান যাবে। পার্কের গা ঘেঁসে পুব

দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, ওদের বাড়ি সেই রাস্তায়।

সুবীর এতক্ষণে হেড অফিসে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। ক'টা অবধি ওখানে থাকবে কে জানে! প্রত্যহ অনেক রাত পর্যন্ত সুবীরের কথা চিন্তা করে সুপর্ণা। কল্পনার পর্দায় আঁকে নিজের ভবিষ্যতের ছবি। ওদের দুজনের কত চমৎকার সংসার হবে। কিছুদিন পরে ওদের কাছে আসবে ছোট একটি আগন্তুক। তারপর—

অথচ এক বৎসর আগে ঘনিষ্টতা দূরে থাক, আলাপ পর্যন্ত ছিল না দুজনের মধ্যে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বাড়িতে বসেছিল সুপর্ণা। পড়তে পড়তেই শখ করে শিখেছিল স্টেনোগ্রাফি ও টাইপ। মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে এখানে-ওখানে যেতে আরম্ভ করলেন। অমুক ব্যারিস্টার আর অমুক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন। মেয়ে বড় ধরনের কাৎলা গেঁথে তুলুক, এই তাঁর ইচ্ছে। কিংবা গেঁথে না তুলে খেলাতে থাকুক —এই সুযোগে কিছু পয়সা আসুক হাতে। সুপর্ণার এ সমস্ত ভাল লাগে না। মা ও মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হতে লাগল।

ও চাকরির খোঁজ করতে লাগল। চাকরি পেলে আর কিছু না হোক মা'র হাত থেকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পাওয়া যাবে। চাকরি সহজ লভ্য নয়। এখানে-ওখানে আবেদনপত্র পাঠানোই সার হতে লাগল! এই সময় দৈবাৎ এই চাকরিটা জুটে গেল। শুধু দৈবাৎ নয়, বেশ নাটকীয় ভাবেই বলা চলে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সুপর্ণা বুনছিল—ফোন এল।

এক অপরিচিত ভদ্রলোক লাইনের অপর প্রান্ত থেকে যা বললেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। তিনি বললেন, রোজমেরি জুটমিল-এ স্টেনো-টাইপিস্টের প্রয়োজন আছে। বিশেষ প্রতিযোগিতার সামনাসামনি হতে হবে না। আবেদন করলে চাকরি হয়ে যেতে পারে।

সংবাদদাতা ভদ্রলোক যে কে সুপর্ণা বুঝতে পারল না। আবেদন করল —চাকরি হয়ে গেল।

চাকরি পাবার মাস দুয়েক পরে সুবীরের সঙ্গে আলাপ হল সুপর্ণার। অফিসে নয়, হাওড়া স্টেশনে। জুট-ইণ্ডাস্ট্রির উন্নয়ন সম্পর্কে একটি অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স হচ্ছিল দিল্লীতে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার রাজেশ মজুমদার নিজে যাবেন কনফারেন্সে যোগ দিতে। সঙ্গে ওয়ার্কস-ম্যানেজার কল্যাণ সেন ও স্টেনো হিসাবে সুপর্ণাও যাচ্ছে।

আটটা কত মিনিটে ট্রেন যেন।

পৌনে আটটার সময় হাওড়ায় পৌঁছাল। টিকিট ও রিজার্ভেশন স্লিপ

আগে ওকে দিয়ে রাখা হয়েছিল। নির্দিষ্ট কামড়ায় পৌঁছে দেখল মজুমদার সাহেব বা কল্যাণ সেন দুজনের মধ্যে কেউই আসেন নি তখন। কয়েক মিনিট পরে অফিসের বেয়ারা লালা এসে একটা চিঠি দিল ওর হাতে। চিঠি লিখেছেন কল্যাণ সেন। তিনি জানিয়েছেন অনিবার্য কারণে তাঁর বা মজুমদার সাহেবের দিল্লী যাওয়া হচ্ছে না, তাঁদের বদলে কম্পানীর হয়ে যাবেন সুবীর ব্যানার্জী। সুপর্ণা যেন দিল্লীতে সুবীরের নির্দেশ মত কাজকর্ম করে।

ট্রেন ছাড়বার যখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, তখন হন্তদন্ত হয়ে সুবীর এল! মালপত্র গুছিয়ে সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি মিস গাঙ্গুলী?

হ্যাঁ। আপনি বোধহয় মিস্টার ব্যানার্জী?

সুবীর মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট নিশ্চয়ই চুকিয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

শুয়ে পড়ুন। মেশিন সঙ্গে এনেছেন তো? সকালে উঠে গোটা কয়েক নোট দেব আপনাকে, টাইপ করে ফেলতে হবে।

এনেছি!

সুবীর আর কিছু বলল না, ও-ধারের আপার বার্থে নিজের বিছানা পেতে নিতে লাগল। আড়চোখে ওদিকে কয়েকবার তাকাল সুপর্ণা। দীর্ঘ, স্মার্ট চেহারা। অল্পেই বুঝতে পারা যায় অত্যন্ত সপ্রতিভ।

কামড়ায় ওরা দুজন ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় লোয়ার বার্থে বসে টাইম-টেবিলের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

বিছানা আগে পেতে ছিল; গায়ে রাগ্ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুপর্ণা।

কনফারেন্স উপলক্ষে চারদিন দিল্লীতে থাকতে হয়েছিল।

একটি অভিজাত হোটেলের দুটি ঘরে ওরা বাসা বাঁধলেও দুটি মন এক হতে খুব বেশি সময় নেয় নি। মাত্র চারদিন সময়ের মধ্যে দুজনে দুজনকে অবিশ্বাস্য রকমের ভালবেসে ফেলল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুটিয়ে বেরালো দুজনে দিল্লী।

কলকাতায় ফিরে আসবার পর ব্যাপারটা সুপর্ণার বাড়িতে কেউ না জানলেও অফিসে জানাজানি হয়ে গেল। এখন ওরা বেপরোয়া। অফিসের পর প্রত্যহ সুপর্ণাকে কম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া গাড়িতে তুলে নিয়ে কলকাতা পৌঁছে দেয় সুবীর। কোন কোন দিন কাজে আটকে পড়লে সুপর্ণা ট্রেনে চলে যায়।

ভাবতে ভাবতে গলি অতিক্রম করে পার্কের সামনে এসে পড়ল ও। শীতের সন্ধ্যা; বেশ নির্জন। কয়েক পা এগিয়ে লক্ষ্য করল, ষণ্ডা-মার্কা ছেলে দুটো পার্কের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। এরা কয়েকদিন ধরে অত্যন্ত বিরক্ত করছে সুপর্ণাকে। এদের বোধহয় কোন কাজকর্ম নেই। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। অফিস যাওয়ার সময় বা অফিস থেকে ফেরার সময় লোক দুটো আজেবাজে মন্তব্য করে, ইঙ্গিত পূর্ণ গান গায়।

কলকাতা যে কি হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

দৃঢ় পায়ে সুপর্ণা এগুলো। লোক দুটো ওকে দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। বয়স তাদের ত্রিশের মধ্যে। চেহারা দেখে উঠতি রোমিও বলে মনে হয় না। সুপর্ণা এগিয়ে আসতেই বলল, কি চাস মাইরি!

জান একেবারে খারাপ করে দেয়।

দুজনে হেসে ওঠে একসঙ্গে।

সুপর্ণা দাঁড়িয়ে পড়ল। এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, তবু দাঁড়িয়ে পড়ল। লোক দুটোকে কিছু না বললে ভয়ানক প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।

আপনারা কি চান বলুন তো?

এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে যে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে সুপর্ণা কথা বলবে, ওরা ভাবতে পারে নি। একজন কাঁপা গলায় বলল, আমরা আবার কি চাইব।

কয়েকদিন থেকে আপনারা আমাকে বিরক্ত করছেন। একজন মহিলাকে হ্যারাস করতে আপনাদের লজ্জা করে না। ভবিষ্যতে আমাকে বিরক্ত করলে পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব।

অন্যজন বলল, আমাদের পুলিশের ভয় দেখাবেন না মিস, পুলিশকে আমরা তোয়াক্কা করি না। কর্পোরেশনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা গান গাইতে পারি, কথা বলতে পারি, তাতে কারুর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

সুপর্ণা আর কিছু বলল না, দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগুলো। নিজের ওপর বেশ বিরক্ত হল, কি দরকার ছিল ওদের সঙ্গে মুখ লাগাবার। ওই সমস্ত লোফারদের সঙ্গে কথা না বলে পুলিশকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখা ভাল।

তাই রাখবে জানিয়ে।

আবার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নির্মলা আর রণেশের বিবাহিত-জীবন প্রথম কয়েক বছর ভালই কেটে ছিল। মেয়ের জন্ম হয়েছিল এই সময়। রণেশের নেশা টুটে গেল একদিন। অনেক ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর যে আনন্দ, একটি ফুলকে নিয়ে পড়ে থাকলে

তা নেই। রণেশ গাঙ্গুলী সে-কথা উপলব্ধি করে নির্মলাকে ফেলে পালাল। বছর চারেক কোথায় যে ডুব দিয়ে রইল ভগবান জানেন।

রণেশ যেমন হঠাৎ পালিয়েছিল, উদয় হল আচমকা তেমনি একদিন। কলকাতার বাইরে গিয়েছিল নাকি। ফিরে এলেও নির্মলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখল না। সস্তা হোটেলে একটা ঘর নিয়ে থাকতে লাগল। বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা হলে নির্মলা এতদিনে কবে একটি ধনীর দুলালকে সংগ্রহ করে ফেলত, কিন্তু এখন আর সে সুদিন নেই। মেয়ে হবার পর শরীর ভেঙে গেছে, এনার্জিও ফুরিয়ে এসেছে। পৈতৃক সূত্রে একখানা বাড়ি ও ভবানীপুরের ওষুধের দোকান পেয়েছিল। কাজেই কোন আর্থিক অসুবিধা ছিল না, মোটামুটিভাবে গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছিল।

মেয়ে বড় হল। রূপের ভারে তার শরীর ভেঙে পড়েছে দেখে নির্মলা খুশি হল। এবার সোসাইটিতে ঘুরে মনোমত মক্কেল জুটিয়ে নিতে পারলে সব দিক রক্ষা পায়। মেয়ের কিন্তু সে-রকম কোন গাগোচ দেখা গেল না। এমন কি নির্মলা কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হতে লাগল।

আজকালকার মেয়েদের যে কি মতিগতি বোঝা ভার। পড়া ছেড়ে দিল। নির্মলাকে না জানিয়ে সে কোন এক মিলে চাকরি যোগার করে ফেলল। তাও আবার কলকাতায় নয়, বাইরে। মেয়ের ব্যবহারে সাংঘাতিক চটলেও মুখে কিছু বলল না নির্মলা। দিন কাটছিল এইভাবে। আজ অভাবনীয়ভাবে একটা সংবাদ পাওয়া গেছে। নিজের নাম না প্রকাশ করে ফোনে নির্মলাকে একজন জানিয়েছে, তার মেয়ে সুপর্ণা যে মিলে কাজ করে, তার মালিক হল রাজীব মজুমদার। শুধু তাই নয়, সুপর্ণা আবার রাজীবের পার্সোনাল সেক্রেটারি।

নির্মলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

বহু বছর আগেকার তীব্র অপমানের জ্বালা এখনও সে ভুলতে পারে নি। প্রতিমাকে বিপথে চালিয়ে কিছুটা জ্বালা কমেছিল বলা চলে ; এবার সম্পূর্ণ প্রতিশোধ নেবে। সুপর্ণার সাহায্যেই তার প্রতিশোধ পূর্ণ হবে।

টেলিফোনে কে যে সংবাদ দিল সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাল না নির্মলা। এখন পরামর্শের জন্যে রণেশকে প্রয়োজন হবে। বিবাদের কথা এখন মনে রাখলে চলবে না। রণেশের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে সমস্ত কথা বলল নির্মলা। টাকার গন্ধে খুশি হল রণেশ গাঙ্গুলী। পরিকল্পনা নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হল।

ষণ্ডা লোক দুটোর দিকে আর না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এল সুপর্ণা।

নির্মলা মেয়ের অপেক্ষায় ছিল। মেয়েকে ফিরতে দেখে তাড়াতাড়ি জল খাবারের ব্যবস্থা করল। স্বপর্ণা অবাক কম হল না। অফিস থেকে ফিরে আসবার পর মা কোনদিন ওর জন্যে জল খাবার তৈরি করে রাখেন না। খিদে থাকলেও নিজে হালুয়া-টালুয়া কিছু একটা তৈরি করে নেয়।

আমার খিদে নেই। স্বপর্ণা নিজের ঘরে চলে গেল। কাপড় বদলে, মুখ হাত ধুয়ে ক্লান্তভাবে বসল ডেক-চেয়ারে।

নির্মলা ঘরে এল। কোন ভূমিকা না করে বলল, স্বপা, তোমাদের মিলের মালিকের নাম কি রাজীব মজুমদার?

হ্যাঁ, মা।

তিনি কি জেলে ছিলেন অনেক দিন?

হ্যাঁ। কি হয়েছে মা। মিস্টার মজুমদারের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

ওই মজুমদারের সঙ্গে আমার একদিন আলাপ ছিল।

বলো কি! মিলিওনিয়ার রাজীব মজুমদারের সঙ্গে আলাপ ছিল তোমার?

নির্মলা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি বড় হয়েছ স্বপা, তোমাকে এখন সব কথা বলা চলে। রাজীবের সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার। সে কথা দিয়েও আমাকে বিয়ে করে নি, চরম অপমান করেছিল।

অপমান করেছিলেন?

হ্যাঁ। আমি আগে জানতাম না তুমি ওর মিলে কাজ করছ। তাছাড়া আমার জানা ছিল না রাজীব জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। অপূর্ব যোগাযোগ! আমি তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে রাখছি স্বপা, তোমার সাহায্যেই রাজীব মজুমদারের ওপর অপমানের প্রতিশোধ নেব।

ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বপর্ণা।

না মা, ও-সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আমি মাথা গলাতে পারব না। আমি তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি, একটু এদিক-ওদিক হলে চাকরি চলে যাবে।

পার্সোনাল সেক্রেটারি বলেই তো সুবিধা বেশি?

না না, আমাকে এর মধ্যে জড়িও না, মা।

নির্মলা গলায় জোর দিয়ে বলল, সব সময় জেদ ভাল লাগে না! যে কথাই বলা হোক, তাতে তোমার আপত্তি!

তুমি কিভাবে একটা নোংরা প্রস্তাব আমার কাছে করছো, বুঝতে পারছি না।

তোমাকে দিয়ে নোংরা কাজ করানো হবে, কিভাবে বুঝলে? তুমি শুধু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ভান করবে। তারপর যা করবার, করবেন তোমার বাবা।

বাবা—!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, এই কথা জানে সুপর্ণা। তিনিও আছেন এই ব্যাপারের মধ্যে।

ভয় দেখিয়ে লোকটার কাছ থেকে তোমার বাবা সহজেই মোটা টাকা আদায় করে নেবেন। তারপর তাকে চূড়ান্ত অপমান করা হবে।

মিস্টার মজুমদার একটু হাল্কা চরিত্রের হলেও লোক খুব খারাপ নন মা। কেন মিথ্যে তাঁকে হ্যারাস করবে!

নির্মলা জ্বলে উঠল।—রাজীবের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি আমাকে বেশি কিছু বলো না সুপা। আমি অনেক বেশি জানি।

রণেশ গাঙ্গুলী ঘরে প্রবেশ করল। এতক্ষণ অন্য কোন ঘরে ছিল, পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে আসরে উদয় হল।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি অযথা মাথা গরম করছো। আমায় বুঝিয়ে বলতে দাও।···বেশ তো, তোমার যদি আপত্তি থাকে, আমরা না হয় রাজীব মজুমদারকে অপমান করব না। তবে টাকাটা—

কিন্তু বাবা···

শোনো, আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো। রাজীব মজুমদারের অনেক টাকা আছে। সেই টাকা থেকে আমরা কিছু নিলে তার কোন অসুবিধা হবে না। অথচ আমাদের লাভ হবে প্রচুর। অর্থনৈতিক কারণে তোমার মা ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—তা মিটে যাবে। আমি নতুন একটা স্ক্রিপ্ট ফ্লোরে নিয়ে যেতে পারব। একটু চিন্তা করে দেখ সুপর্ণা, তোমার সহযোগিতা পেলে চারদিক থেকে কত উপকার হয়।

সুপর্ণা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

রণেশ বুঝল ওষুধ ধরেছে। সে আবার বলল, আমাদের প্রতি তোমার কিছু কর্তব্য রয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই চাইবে আমরা সকলে আবার এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করি।

আমি···আমাকে একটু চিন্তা করবার সময় দাও।

বেশ তো, তুমি চিন্তা করে দেখ। এসো নির্মলা।

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুপর্ণা মুহ্যমানের মত আবার বসে পড়ল ডেক-চেয়ারে। তলিয়ে গেল চিন্তার অতল সাগরে।

দিন সাতেক কেটে গেছে।

সুপর্ণা সমস্ত কথা বলেছে সুবীরকে। সুবীর ওকে বুঝিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। সবশেষে বলেছে, আর দিন কুড়ি কোন রকমে চালিয়ে নাও, তারপর আমাদের রেজেষ্ট্রি হয়ে যাবে।

কুড়িদিন! কেন, তার আগে হয় না?

কুড়িদিন তো আমি বললাম—সময় হয়তো আরো বেশি লাগবে। রেজেষ্ট্রি ম্যারেজে অনেক ঝামেলা।

এতদিনে রাজীবও সুপর্ণার দিকে বেশ কিছুটা এগিয়েছেন। হেসে হেসে কথা বলেন সব সময়। সামনের মাস থেকে মাইনে পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দেবেন বলেছেন। সুপর্ণাকে চেষ্টা করতে হচ্ছে না। নির্মলার প্ল্যান নিজে থেকেই দানা বাঁধছে। যেন রাজীবই নির্মলার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

এদিকে সেই উটকো ঝামেলা লেগে আছে। ষণ্ডামার্কা লোক দুটো যথা নিয়মে বিরক্ত করে চলেছে। সেই পার্কের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কদর্য টিপ্পনি আর নোংরা গানের ফোয়ারা বজায় রেখেছে।

কয়েকদিন আগে রণেশকে কথাটা বলেছিল সুপর্ণা। উদ্বিগ্ন রণেশ গাঙ্গুলী পার্কের কাছে গিয়েই ফিরে এসেছিল।

ওদের সায়েস্তা করবার ক্ষমতা আমার নেই। টেরিটি বাজারের নামী গুণ্ডা যতীন আর লালু—। পুলিশকে জানানোই ভাল।

পুলিশকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ আমদানী হতেই পার্কের কাছ থেকে কেটে পড়েছে যতীন আর লালু। এখানে ওখানে দেখা হলে এখন বিরক্ত করছে। সুপর্ণার কি আতঙ্কে যে দিন কাটছে বলার নয়।

ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ সেরে নিজের টেবিলের কাছে যখন ফিরল সুপর্ণা, তখন রাজীব এসে গেছেন। পাইপ মুখে দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছেন। সুপর্ণাকে দেখে বললেন, লাঞ্চ সেরে এলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি খেলে?

আর অবাক হয় না সুপর্ণা। এ ক'দিনেই বুঝতে পেরেছে, রাজীবের প্রশ্ন বাঁধা-ধরা পথ দিয়ে চলে না। নিজের খেয়াল খুশিমত—যখন যা মনে আসে, তখন তাই জিজ্ঞেস করেন।

সুপর্ণা টেবিলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, দুটো টোস্ট, ডিম-সেদ্ধ, একটা সন্দেশ আর এককাপ চা।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে রাজীব বললেন, সেকি! এই খেয়ে এত বড় দুপুর কাটিয়ে দাও? উঁহু, ভাল কথা নয়। কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।

এবার সুপর্ণাকে বেশ অবাক হতে হয়।

কথা শেষ করে রাজীব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। এগিয়ে এলেন নিজের

সেক্রেটারির কাছে ; বললেন নরম গলায়, আমি তোমার ভাল চাই সুপর্ণা। তুমি যাতে আরো ভাল ভাবে থাকতে পারো, সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি আছে জানবে। কোন বিষয়ে তুমি সঙ্কোচ করবে না। আমাকে বন্ধু বলে মনে করতে পারো।

বিহ্বল গলায় সুপর্ণা বলল, স্যার, আপনি...

রাজীব ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে দ্বিধাহীন গলায় বললেন, তুমি সঙ্কোচকে মিথ্যে প্রশ্রয় দিচ্ছ। বোঝা উচিত আমি তোমার প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছি।

সুপর্ণা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

রাজীব বলে চলেছেন, বয়স আমার একটু হয়েছে অস্বীকার করি না। তাতে কি আসে-যায়! টাকা দিয়ে সব ঢাকা যায়। একবার আমার নজরে যখন পড়ে গেছ, তখন তোমার ভাবনা কি ? কোন কাজ করতে হবে না তোমায়। কাজের অজুহাতে প্রতিদিন আসবে আমার কাছে—দুপুরভোর আমরা গল্প করব—তারপর বিকেলে বেড়াতে বেরুবো আমি ভীষণ শ্রান্ত সুপর্ণা, আমায় সঙ্গদান করে আমাকে একটু আনন্দ দাও, আর কিছু চাই না।

অসহায় সুপর্ণা কিছু বলতে পারছে না। তবে লক্ষপতি রাজীব মজুমদার যে ওর চেয়ে কম অসহায় নয়, তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না।

ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

সুপর্ণা রেহাই পেয়ে গেল উত্তর দেবার হাত থেকে। রাজীব গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। কথা বললেন কার সঙ্গে যেন তারপর ; 'এখুনি আসছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরলেন সাড়ে চারটের সময়। বললেন, মান্থলি কনফারেন্সের ঝামেলা চুকিয়ে এলাম। চলো এবার, বেরিয়ে পড়া যাক।

সুপর্ণা বলল, ছুটির পর আমার অন্যত্র একটু কাজ ছিল।

ও-কাজ এখন তোলা থাক, চলো আমার সঙ্গে।

অনিচ্ছার সঙ্গে সুপর্ণা রাজীবকে অনুসরণ করল।

গাড়িতে স্টার্ট নেবার পর রাজীব বললেন, কোথায় যাচ্ছি বলো তো ?

আমায় শ্যামবাজারে নামিয়ে দেবেন।

আমার কথার উত্তর দাও।

জানি না।

প্রথমে আমরা বেঙ্গল স্টোরে যাচ্ছি, ওখান থেকে বেরিয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

সুবিখ্যাত বেঙ্গল স্টোরে পৌঁছে একখানা দামী শাড়ি কিনে দিলেন সুপর্ণাকে। ভীত ভাবে বার দুই আপত্তি তুললো সুপর্ণা। রাজীব আপত্তিতে

কর্ণপাত করলেন না। ওকে শাড়ি নিতে হল।

বাড়ির দরজার গোড়ায় ওকে নামিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল রাজীবের, কিন্তু সুপর্ণার সানুনয় অনুরোধে পার্কের সামনে গাড়ি থামাতে হল।

কাল দশটায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো। অফিস যাবার আগে তোমায় তুলে নিয়ে যাব।

সকালে আসবেন না অনুগ্রহ করে—আমি ট্রেনে চলে যাব।

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল সুপর্ণা।

রাজীব তাকিয়ে রইলেন। ওর যৌবনভারাক্রান্ত দেহের নিখুঁত ছন্দ দেখতে লাগলেন। উগ্র লালসা পাকসাট খাচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে। ইচ্ছে করলে জোর করে আদায় করে নিতে পারেন সব কিছু, তা তিনি নেবেন না। আজ শাড়ি দিয়েছেন, সোনার গয়নাও দেবেন, দুর্বার লোভ জাগিয়ে তুলবেন ওর মনের মধ্যে।

ঝনঝন শব্দে রাজীব চমকে উঠলেন। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, পিছন দিকের সিটের ওপরকার কাচ ভেঙে গেছে। কি রকম হল! রাজীব গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে পেলেন, দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

কি হল বলুন তো?

লোক দুজন আর কেউ নয়, যতীন আর লালু।

যতীন বলল, বিশেষ কিছু হয়নি, কাচ আমরা ভেঙেছি ঢেলা মেরে।

সবিস্ময়ে রাজীব বললেন, সেকি! কেন?

আজ কাচ ভেঙেছি, কাল আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব।

ননসেন্স। কি আজেবাজে বকছেন—?

লালু খিঁচিয়ে উঠল, গালাগাল দিচ্ছেন কেন? কাল থেকে যদি আবার ওই মেয়েটাকে নিয়ে মোটরে ঘুরতে দেখেছি, মাথা বাঁচানো শক্ত হবে জানবেন।

ভীত ভাবে রাস্তার এধার-ওধার রাজীব দেখে নিলেন। বহুদূরে জন তিনেক লোক ছাড়া আর কেউ নেই। শীতের রাত্রে পার্কের ধারে কে-ই বা থাকবে!

তিনি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, ওর সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক আছে নাকি?

সম্পর্কের কথা কি বলছেন মশাই! ও হল আমাদের মাল। ওকে কেউ ফুসলে নিয়ে যাবে, আমরা সহ্য করব না। যান, সরে পড়ুন এখান থেকে।

রাজীব আর অপেক্ষা করলেন না। ভয় আর অপমান, এই দুই বোধের সংমিশ্রণে তাঁর মনের অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তিনি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। গুণ্ডা দুটির কথা চিন্তা করলেন অনেক রাত অবধি।

দিন দশেক কেটে গেছে।

রাজীব স্বপর্ণার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিদিন মূল্যবান কিছু-না-কিছু উপহার দিচ্ছেন ওকে। তবে বাড়ি আর পৌঁছে দিচ্ছেন না। গুণ্ডা দুটির কথা তাঁর মনে আছে। যেচে অপমানিত আর হতে চান না। স্বপর্ণা নিরাসক্ত ভাবে উপহার গ্রহণ করেছে। ওর মত উভয় সঙ্কটে যেন আর কেউ না পড়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা প্রথমে হাল্কা ভাবে নিয়েছিল সুবীর। কিন্তু ঘটনার স্রোত যেভাবে বইতে আরম্ভ করেছে, তাতে ও বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মেয়েদের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। টাকার মায়াকে শেষ পর্যন্ত যদি স্বপর্ণা কাটিয়ে উঠতে না পারে?

এদিকে রণেশ গাঙ্গুলী প্রস্তুত হয়েছে। তার আসরে নামবার সময় হয়ে গেছে।

রবিবার। কাজের তাড়া নেই। পার্লারে বসে কথা হচ্ছিল রাজীব, রাজেশ ও দেবেনবাবুর মধ্যে। বেলা তখন নটা। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি 'জুট ব্যবসায়ী ডেলিগেট' পাঁচ সপ্তাহের টুরে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে। এই দলের রাজেশ অন্যতম সদস্য। আগামী সোমবার—অর্থাৎ আর দিন ছয়েকের মধ্যে ওকে ভারত ছাড়তে হবে।

কথা হচ্ছিল ওই নিয়ে।

পাসপোর্ট, ট্রাভলার-চেক ইত্যাদি রেডি হয়ে গেছে। ট্রেনে বম্বে যেতে হবে। ওখান থেকে প্লেনের ব্যবস্থা। আটজন সদস্য নিয়ে এই দল। তার মধ্যে কলকাতার তিনজন।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে রাজীব বললেন, সময় সময় ইচ্ছে করে আমিও ঘুরে আসি। আবার মনে হয় কোথায় যাব, বেশ আছি।

রাজেশ বলল, আমি ফিরে আসবার পর তুমি একবার ঘুরেই এসো না!

এখন আমি ওল্ড হর্স, ছুটোছুটি কি আর ভাল লাগে!

আরো আধ ঘণ্টাখানেক গল্প-গুজোব হল তিনজনের মধ্যে। ফোন পেয়ে রাজেশ এক সময় উঠে গেল। দেবেনবাবু অন্দরের দিকে গেলেন। রাজীব পেপারে মন দিলেন। মিনিট কয়েক পরে বেয়ারা এসে জানাল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

কি নাম?

বেয়ারা আগেই কার্ড এগিয়ে দিয়েছিল। প্রশ্ন করেই তিনি কার্ডের ওপর

দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, রণেশ গাঙ্গুলী। অপরিচিত নাম। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা না থাকলে কারুর সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করেন না। হাতে এখন কোন কাজ নেই, কি খেয়াল হল বেয়ারাকে বললেন, পাঠিয়ে দাও।

বেয়ারা রণেশকে নিয়ে এল।

বসুন। কি দরকার বলুন তো?

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

কই, না।

অনেক দিনের কথা তো, আমার নাম ভুলে গেছেন। নির্মলা ভটচাজকে আপনার মনে পড়ে?

নড়ে-চড়ে বসলেন রাজীব। সমুদ্রের তলায় নেমে ঝিনুক কুড়িয়ে আনার মত, মুহূর্তের মধ্যে স্মৃতির অতল থেকে রণেশের পরিচয় সংগ্রহ করলেন। মনে পড়ে গেল সেই সব দিনের কথা—যা তিনি মোটেই মনে রাখতে চান না। বললেন, এবার মনে পড়েছে। কম দিনের কথা তো নয়! আপনার সঙ্গে নির্মলার বিয়ে হয়েছিল, না?

হ্যাঁ।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

নিন, চা খান।

চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে রণেশ বলল, আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে আমার।

বলুন—

কথাটা একটু গোপনীয়, মানে...

আসুন আমরা স্টাডিতে গিয়ে বসি। ওখানে কথা হবে।

রাজীবের পিছু পিছু রণেশ স্টাডিতে এল। দরজা ভেজিয়ে, রণেশকে বসতে অনুরোধ করে রাজীব বলল, এবার বলুন—

কথাটা সুপর্ণাকে নিয়েই।

খুলে বলুন।

সুপর্ণা আমার মেয়ে।

রাজীব ধাক্কা খেলেন। সুপর্ণা নির্মলার মেয়ে! কি অদ্ভুত ব্যাপার! তা না হয় হল, কিন্তু এই লোকটা—রণেশ গাঙ্গুলী তাঁকে কি বলতে এসেছে! তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, সুপর্ণা যে আপনার মেয়ে সে-কথা আমাকে কোনদিন বলে নি।

আসলে সে জানে না, তার মা'র সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ছিল। যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক। আমরা সব কথা জানতে পেরেছি।

রাজীব কেমন হয়ে গেলেন। বললেন, কি জানতে পেরেছেন?

তার মা'র সঙ্গে যে-খেলা আপনি একদিন খেলেছিলেন, সুপর্ণার সঙ্গে এখন সেই খেলা খেলছেন।

রণেশবাবু!

উত্তেজিত হবেন না মিস্টার মজুমদার। আমার কথা শুনুন—প্লেন বিজনেস টক আমি আপনার সঙ্গে করতে চাই, কিছু টাকা আপনাকে খরচ করতে হবে।

কেন?

নইলে সুপর্ণার বাপ হিসেবে আমার যা কিছু করণীয় করতে বাধ্য হব।

আপনার করণীয় কাজগুলো কি জানতে পারি?

নিশ্চয় পারেন! ধরুন, আপনার বিরুদ্ধে পুলিশে গিয়ে রিপোর্ট করা। তারপর কেস। কেস ভালই জমবে। আমার মেয়েকে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেছেন, আমি তা প্রমাণ করতে পারব। সুপর্ণা প্রধান সাক্ষী হিসেবে অনেক কথা হাকিমের সামনে বলবে। মান-সম্মানকে যদি তোয়াক্কা নাও করেন, কয়েক বছর জেলের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। কথা হচ্ছে, এত ঝুঁকি আপনি নেবেন কেন? হাজার চল্লিশ টাকা তো আপনার হাতের ময়লা।

ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন?

আমার প্রস্তাবকে যদি ব্ল্যাকমেল বলে মনে করেন, আমি নাচার। টাকাটা চেকে দেবেন না, ক্যাশে।

টাকা নেবার পর আপনি যে ওই এক দাবী নিয়ে আবার আসবেন না, তার গ্যারাণ্টি কোথায়।

গ্যারাণ্টি আমি নিজে। কথা দিচ্ছি, আর আসব না।

শুধু কথায় আস্থা রাখা যায় না রণেশবাবু! নষ্ট করবার মত সময় আমার আর নেই, আপনি যেতে পারেন।

আপনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন?

ধরতে পেরেছেন তাহলে!

কাজটা ভাল করলেন না মিস্টার মজুমদার, আমাকে বাধ্য হয়ে কোর্টে যেতে হবে। তাছাড়া আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি, আপনাদের চীফ ফোরম্যান সুবীর ব্যানার্জী সুপর্ণার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে হয়তো আপনাকে…

আপনাকে আর সময় দিতে পাচ্ছি না। যাবার আগে শুধু একটা কথা শুনে যান, সুপর্ণাকে দিয়ে গত কালই আমি একটা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছি। দশ বছরের মধ্যে সে চাকরি ছাড়তে পারবে না, এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, কোর্টে আমার বিরুদ্ধে সে কিছু বলতে পারবে না। বেয়ারা, সাহেবকে রাস্তা দেখাও।

আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। রাগে, অপমানে ফুলতে ফুলতে রণেশ গাঙ্গুলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেবেনবাবু পার্লারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ডাকলেন গাঙ্গুলীকে। স্টাডির পাশ দিয়ে আসবার সময় গোটা কয়েক কথা তাঁর কানে গেছে। বেশ অবাক হয়েই তিনি রণেশকে ডাকলেন।

কি হয়েছে বলুন তো মশাই ?

তার আগে জানতে চাই আপনি কে ?

আমি গৃহকর্তার সম্বন্ধি।

লাভ যখন কিছু হল না, তখন প্রতিপক্ষের অনিষ্ট করতে বাধা কোথায়। শ্যালক-প্রবরকে বসিয়ে কথাটা বলতে পারলে আর কিছু না-হোক, রাজীব মজুমদারের পারিবারিক শান্তি নিশ্চয় কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে।

ও! বিশেষ কিছু হয়নি। আপনার জামাইবাবু আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। আমার মেয়ের কথা বলতে এসেছিলাম···ইত্যাদি। টাকা আদায়ের কথা বাদ দিয়ে, সুপর্ণার সঙ্গে রাজীব কিরকম অসঙ্গতভাবে মেলামেশা করছেন, তা সালঙ্কারে রণেশ বর্ণনা করল। তারপর দেবেনবাবুকে এর বিহিতের জন্তে অনুরোধ করতে ছাড়ল না।

রণেশকে বিদায় দিয়ে গম্ভীর মুখে দেবেনবাবু স্টাডিতে ঢুকলেন।

কথা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব গরম হয়ে উঠলেন। তারপর জীবনে প্রথমবার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল শালা-ভগ্নীপতির মধ্যে। রাজেশ ছুটে এল। বাবা আর মামার কাণ্ড দেখে তো ও থ্ হয়ে গেল।

রাজীব চোখ মুখ রাঙা করে তখন বলছেন, আমার খাবে আবার আমাকেই ধমকাবে! আমার যা ইচ্ছে হবে, তাই করব!

বাবা কি হচ্ছে—তোমরা ছেলেমানুষের মত ঝগড়া আরম্ভ করলে ? কি হয়েছে কি ?

বিশেষ কিছু হয়নি ; তোমার মামা তিলকে তাল করে তুলেছেন।

থাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মামা ঘর থেকে চলে এস, বাবাকে এখন একলা থাকতে দাও।

দেবেনবাবু আর রাজেশ স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল।

কি হয়েছিল কি ?

গর গর করতে করতে দেবেনবাবু বললেন, তোমার বাবার ভিমরতি হয়েছে। পার্সোনাল সেক্রেটারির সঙ্গে প্রেম করছেন! একটু আগে মেয়েটির বাবা এসেছিল, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি...

তোমার মাথা-গরম করা উচিত হয়নি মামা, বাবার দিকটা একটু ভেবে দেখ।

কি আবার ভেবে দেখব ?

সারাটা জীবন কত নিঃসঙ্গ ভাবে উনি কাটালেন। উনি মনের দিক থেকে হালকা হবার জন্যে যদি কারুর সঙ্গে মেলামেশা করেন—আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

দেবেনবাবু কিছু বললেন না। রাজেশ আবার বলল, আমি বাইরে যাচ্ছি মামা। এই সময় যদি তোমরা ঝগড়া ঝাঁটি করো, ইংলণ্ডে গিয়ে মন দিয়ে কোন কাজ কি আমি করতে পারব?

দেবেনবাবু ভাগ্নের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে জল চকচক করছে।

একটু সঙ্কোচ ছিল। গতকাল জানাজানি হয়ে যাওয়ায় সঙ্কোচের বেড়া চমৎকার ভাবে টপকেছে রাজীব। বরং বলা চলে এখন একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। এবার সুবীর ব্যানার্জীর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়।

পাউচ থেকে টোবাকো বার করে পাইপে ভরলেন। অগ্নিসংযোগ করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তাকালেন দরজার দিকে, ঘড়ির দিকেও তাকালেন। সুপর্ণা ত্রস্ত পায়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ওর সুন্দর মুখ বাসীফুলের মত শুকিয়ে রয়েছে, বাড়িতে প্রচুর অশান্তি হয়েছে বুঝতে পারা যায়।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং। দেরি হল তোমার?

মানে...

তোমার পেরেণ্টসরা আসতে দিচ্ছিলেন না বোধহয়? কেন যে তাঁরা বোকামির আশ্রয় নিচ্ছে বুঝতে পারছি না। যাক, সুবীর ব্যানার্জীকে তুমি চেনো?

সুপর্ণার শিরায় শিরায় হিমপ্রবাহ নামল।

চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও।

চিনি।

ঘনিষ্টতা আছে! তোমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা আছে বলেই তার চাকরি থাকবে না।

চাকরি থাকবে না?

না। চুরি করার অপরাধে তাকে বরখাস্ত করা হবে।

তিনি তো চুরি করেন নি!

আজকাল চাকরি খাওয়া একটু শক্ত। চার্জ ওইভাবে সাজাতে হবে। একজন নিরপরাধ লোক শুধু তোমার জন্যে বেকার হয়ে যাবে।

সুপর্ণা ভেঙে পড়ল অনুনয়ে।—ওকে বরখাস্ত করবেন না! যদি কোন শাস্তি দিতে হয়, আমায় দিন!

শাস্তি?

সুবীরকে দয়া করুন!

টেনে টেনে হাসলেন রাজীব।—সমবেদনা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে! তোমাকে আর কি শাস্তি দেব। তবে একটা সর্তে ওকে রেহাই দিতে পারি।

বলুন।

তুমি ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না। কথা দিয়ে যদি কথার খেলাপ করো, তবে সুবীর ব্যানার্জীর চাকরি থাকবে না। রাজি আছো?

একটু চুপ করে থেকে অসহায় সুপর্ণা বলল, বেশ।

রাজীব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। সুপর্ণার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, এই তো লাইক গুড গার্লের মত কথা।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবীর। পাঁচটা বেজে গেছে সুপর্ণার দেখা নেই। এই জায়গাটা হল ওদের মিটিং প্লেশ। নিয়মিত এখানেই দেখা-সাক্ষাত হয় অফিসের পর। তারপর দুজনে কলকাতায় ফেরে। আজ ওর এত দেরি হচ্ছে কেন! বুড়ো মজুমদারের গল্পের ফোয়ারা এখনও চলছে নাকি?

ছ'টা বেজে গেল ক্রমে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, বুড়োর সঙ্গে চলে গেছে নিশ্চয়! ভারাক্রান্ত মনে সুবীর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পরের দিনও ওই একই ব্যাপার ঘটল; সুপর্ণা এল না।

তার পরের দিনও। অথচ এই তিন দিন সুপর্ণা অফিস এসেছে, সে-সংবাদ পেয়েছে সুবীর। ওকে কি এড়িয়ে যাচ্ছে? কেন? রাজীব মজুমদারের টাকার ঝনঝনানি ওকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তাই কি?

আজ আর সুবীর অপেক্ষা করল না, একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতা চলে এল। দেশবন্ধু পার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা তখন হয় হয়, সুবীর লক্ষ্য করল মন্থর পায়ে সুপর্ণা আসছে। ওর কোন দিকে লক্ষ্য নেই।

কাছাকাছি আসতেই সুবীর বলল, পর্ণা—

চমকে উঠল সুপর্ণা।—একি, তুমি!

তিনদিন ধরে ধৈর্য পরীক্ষা দেবার পর আমাকে আজ এখানে আসতে হল।

তুমি যাও সুবীর।

যাও মানে?

সারাদিন অফিসে খাটুনি গেছে, এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো।

ও-সমস্ত ছেলে ভুলানো কথা বাদ দাও, গাড়িতে ওঠো!

আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

গাড়িতে ওঠো পর্ণা! দুটো লোক আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে,

তাদের চোখের ওপর সিন্ করে লাভ নেই। আমাকে কয়েক মিনিট সময় তোমায় দিতেই হবে।

সুপর্ণা মুখ ফিরিয়ে দেখল, ষণ্ডা-মার্কা সেই লোক দুটো সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। ও আর আপত্তি না করে গাড়িতে উঠে বসল।

সুবীর ওর পাশে বসে সেলফ-স্টার্টারে চাপ দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে। কারুর মুখে কথা নেই। মাইল মিটারের কাঁটা হেলছে দুলছে।

শেষে বৌবাজারে নিজের ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে এসে সুবীর গাড়ি থামাল। বাড়িখানা বিরাট। দোতলায় দু'খানা ঘরে মাকে নিয়ে থাকত। মা উপস্থিত কলকাতায় নেই, কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ভারতদর্শনে বেরিয়েছেন।

সুবীর বিস্মিত সুপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আমি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

সে কথা আমায় মুখ ফুটে বলতে হবে!

তবু বলো?

হ্যাঁ, বাসি।

কোন আপত্তি না করে এবার তুমি আমার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাটে এসো।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও সুবীর।

দেব। তার আগে একটা কাজ শেষ করতে হবে, এসো।

যন্ত্রচালিতের মত সুবীরকে অনুসরণ করে ওর ফ্ল্যাটে এল সুপর্ণা।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সুবীর বলল, শোনো পর্ণা, এবার আমাদের বিয়ে হবে।

বিয়ে! এখন?

হ্যাঁ, এখনই। রেজিস্ট্রির ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামা। আমি স্থির করেছি, আর্য-সমাজের মতে আমাদের বিয়ে হবে। একজন আর্যসমাজীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি এই বাড়িতে থাকেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হবে।

বিহ্বল গলায় সুপর্ণা বলল, এত তাড়াতাড়ি করবার কি আছে, বরং···

তাড়াতাড়ি করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে পর্ণা, ক্রমেই তুমি বুড়োর খপ্পরে পড়ে যাচ্ছো। বিয়ে করে···

তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমি নিরুপায় হয়ে···

বুড়োর টাকা আর আমাকে বিয়ে করা, এই দুটোর মধ্যে একটা তোমাকে এখুনি বেছে নিতে হবে।

সুপর্ণা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, এলিয়ে পড়ল সুবীরের বুকের ওপর। কান্না-জড়ানো গলায় বলল, আমি কত নিরুপায়, তুমি বুঝতে পারছ না!

কেন তুমি নিরুপায়!

বুড়ো আমাকে জানিয়ে রেখেছে, তোমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমার চাকরি যাবে।

ঘর ফাটিয়ে হাসল সুবীর। সুপর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, এই ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছ? ওখানকার চাকরি আমি নিজে থেকেই ছেড়ে দেব। মাস খানেকের মধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান জুট মিলে জয়েন্ট করছি। তুমিও চাকরি ছেড়ে দেবে। শ আটেক টাকা মাইনে পাব—আমাদের দুজনের ভালভাবেই চলে যাবে।

আমি তো চাকরি ছাড়তে পারব না! তাছাড়া বুড়োর অবাধ্য হওয়াও চলবে না।

কেন?

আমাকে দিয়ে দশ বছরের একটা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছেন।

বণ্ড !!!

সুপর্ণার কাছ থেকে সরে এল সুবীর।

ভ্রূ-কুঁচকে কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল, ঘোড়েল লোক। বণ্ডের টার্মসগুলো কি?—সুপর্ণা বলল।

হুঁ। কাজটা খুবই বোকার মত করে ফেলেছ। বেশ ভাবনার কথা হল পর্ণা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই সমস্ত কায়দা করে বুড়ো তোমাকে বিয়ে করতে চায়; তা আমি হতে দেব না। আচ্ছা, বণ্ড-পেপারটা কোথায় রাখা আছে, জানো?

উনি নিজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলেন।

আমার এখন কি ইচ্ছে করছে জানো পর্ণা? ইচ্ছে করছে, ওই লোকটাকে খুন করি। থাক, এখন আর মাথা গরম করব না। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

তুমি রাগের মাথায় সত্যি কিছু করে বসবে না তো?

সুবীর মৃদু হাসল।—চলো।

রাজীব প্রায় বেলা তিনটের সময় অফিসে এলেন।

এতক্ষণ তিনি রাজেশের সঙ্গে ছিলেন। আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে রাজেশের কলকাতা ছাড়বার কথা। অফিসে মোটেই আসতেন না, শুধু সুপর্ণাকে দেখবার জন্যেই এসেছেন। এমনি সময় তো বটেই, স্বপ্নের মধ্যেও মেয়েটা তাঁর মনকে রেহাই দেয় না। আধ-ঘন্টাটাক গল্প-গুজোব করলেন সুপর্ণার সঙ্গে। তিনি স্থির করে ফেলেছেন আর কথায় চিঁড়ে ভেজাবেন না, এবার অনিষ্ঠ হবেন ওর সঙ্গে। নির্মলার রক্ত ওর গায়ে বইছে—বিয়ে করতে হয়তো

চাইবে না। না চাইলেই বা ক্ষতি কি, এমনি থাকুক! রাজীব বাড়ি কিনে দেবেন, মোটা ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে দেবেন—তার পরিবর্তে মাঝে মাঝে রাত কাটিয়ে আসবেন ওর কাছে।

গল্প-গুজোব সেরে ড্রয়ার খুলে কি একটা কাগজ বার করতে গিয়ে দেখলেন বণ্ড-পেপারটা নেই। কি হল? সুপর্ণা কোন কারসাজি করে নি তো? কিভাবে করবে, দেরাজের চাবি তো তাঁর কাছে।

কি আশ্চর্য! বণ্ড-পেপারটা এখানে রেখেছিলাম, দেখতে পাচ্ছি না এখন!

সুপর্ণা চমকে উঠল, তবে কি—

রাজীব আবার বললেন, ভুলে বাড়ি নিয়ে গেছি বোধহয়; তাই সম্ভব। ভাল কথা, পরশু মানে রবিবার দিন দুপুরে আমরা ডায়মণ্ডহারবারে থাকব। দশটায় সময় কলকাতা থেকে স্টার্ট করতে হবে. তুমি রেডি থেকো।

তিনি আর বসলেন না, ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ, যদি না ইংলণ্ড থেকে রাজেশের কেব্‌ল রবিবার দিন আসত। ওর পৌঁছনোর সংবাদ শনিবার মাঝে-রাত্রে নিশ্চয় পাবার কথা; বলতে গেলে দুশ্চিন্তায় সারাটা রাত পায়চারি করে কাটিয়েছেন। সকাল হয়ে যাবার পর ভাবছিলেন, বহির্বিভাগীয় দপ্তরে একবার অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা।

ফোন এল—বহির্বিভাগীয় দপ্তর থেকেই ফোন এসেছে। সংবাদ পাওয়া গেল, এই মাত্র তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন মিঃ রাজেশ মজুমদার ও অন্যান্য ডেলিগেটরা ভাল ভাবেই লণ্ডনে উপস্থিত হয়েছেন। রাজীব অস্থির হবেন—একথা জানে বলেই বহির্বিভাগীয় দপ্তরকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল রাজেশ, ওর পৌঁছনো সংবাদ পাবার পর যেন সঙ্গে সঙ্গে এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়।

কেব্‌লটা এল আরো আধঘণ্টা পরে। রাজেশ লিখেছে লণ্ডনে এখন বৃষ্টি হচ্ছে; ভীষণ ঠাণ্ডা। রাজীব নিশ্চিন্ত হলেন। নিশ্চিন্ত মনেই সুপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন পিকনিক করতে ডায়মণ্ডহারবারে।

ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে সুপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছিল। অনিচ্ছার সঙ্গে আসতে হয়েছে ওকে। না এলে রাজীব হয়তো নিজে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন। সে এক বিশ্রী কাণ্ড! খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। রাজীব নিজের কনভার্টেবল ডিসোটা নিয়ে উপস্থিত হলেন। আজ তাঁকে বেশ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। পরনে গল্‌ফ স্যুট। চোখে রঙীন আবরণ।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক সময় নিল ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছতে। রবিবার আজ। অনেকেই পিকনিক করতে এসেছে। ওদের মত দুজনের দল নয়, তারা বেশ দলে ভারি।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে রাজীব বললেন, কি ভিড় দেখছো! ভদ্রলোকের আসার অযোগ্য হয়ে উঠেছে দেখছি জায়গাটা।

খোঁজাখুঁজি করে নির্জন একটা জায়গা বেছে নেওয়া হল।

ঝোপঝাড় দিয়ে ঘেরা জায়গাটার তিনধার। একটু নিচু হওয়ার দরুন এখান থেকে জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ির কেরিয়ার থেকে সতরঞ্চি এনে নিজে পাতলেন রাজীব। একে একে সমস্ত কিছু বয়ে আনা হল। অনুষ্ঠানের ক্রটি নেই। চাউস দুটো টিফিন-কেরিয়ার। অনেক রকম খাবার বোঝাই হয়ে আছে তাতে! কফিফ্লাস্ক, কেক-এর বাক্স, গোটা কয়েক বই, যোড়া, কুশান, ট্রানজিস্টার, তাস আরো কত কি।

সুপর্ণাকে বসতে বলে নিজে বসলেন রাজীব। ওর কাছে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই বসলেন; বললেন, আজকের পিকনিকের আসল উদ্দেশ্য কি জানো? নিরিবিলিতে তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলা।

থমথমে মুখে সুপর্ণা চুপ করে রইল।

তার আগে একটা কথার উত্তর দাও। আমার কাছে এলে তোমার মুখে হাসি থাকে না কেন?

হাসি তো!···আপনাকে কফি ঢেলে দেব।

পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছো।···দাও কফি, তুমিও নাও। খাবারও কিছু বার করো।

জলযোগ-পর্ব সাঙ্গ হল।

টাওয়েলে হাত মুছলেন রাজীব। সুপর্ণা সংস্কারবশে উঠে গিয়ে হাত ধুতে গেল। চোখ পড়ে গেল সুবীরের ওপর। হতবাক হয়ে গেল! ও এখানে কেন? সুবীর ঝোপের আড়ালে গা মিশিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নিরুপায় সুপর্ণা হাতের ইসারায় ওকে অপেক্ষা করতে বলে রাজীবের কাছে ফিরে গেল।

রাজীব পাইপ ধরিয়েছেন। তৃপ্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ছেন। সতরঞ্চিতে না বসে সুপর্ণা বলল, এধার-ওধার ঘুরে এলে হত না।

কি আর দেখবার আছে! নামেই সমুদ্র। আসলে বঙ্গোপসাগর এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।

আমি এর আগে কখনো আসিনি, একটু ঘুরে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।

যাও, ঘুরে-ফিরে এসো। আমিও তোমার সঙ্গে গেলে মন্দ হত না, কিন্তু কেউ এখানে না থাকলে জিনিসপত্র চুরি যাবে। আমি ততক্ষণ ট্রানজিস্টার বাজাই। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

আচ্ছা।

সুপর্ণা পা চালিয়ে সুবীরের কাছে এল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তুমি এখানে

কি ভাবে এলে ?

তোমাদের ফলো করে।

তার মানে ?

তুমি কাল বললে না, বুড়োর সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে আসছ। তোমাকে একা ওর হাতে ছাড়তে ভরসা হল না। ওঁৎ পেতে ছিলাম। ফড়িয়াপুকুর থেকে ফলো করছি।

এ-রিস্ক তোমার নেওয়া উচিত হয়নি। মুখে দু-চার কথা বলতে পারে, এই খোলা জায়গায় আর কি ক্ষতি করবে ? তুমি যাও।

সুবীর ওর একটা হাত চেপে ধরল।—যাব মানে! চলো, জলের ধারে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি।

না, না, আমায় ছেড়ে দাও। বুড়ো জানতে পারলে ভয়ানক ঝামেলা হবে।

জানতে পারবে কি করে ? তোমার সঙ্গে যখন এল না, তখন মালপত্র ছেড়ে উঠবে বলে মনে হয় না। এসো—

অগত্যা—

দুজনে পাড়ের দিকে এগোল।

গজ দশেক দূরে গাছতলায় দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখে সুপর্ণা চমকে উঠল। তারা আর কেউ নয়, সেই গুণ্ডা দুজন—যারা ওকে বিরক্ত করে। তারাও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে! আশ্চর্য!

সুবীরের গা ঘেঁসে সুপর্ণা বলল, গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো কিছুদিন ধরে আমাকে বিরক্ত করছে!

গুণ্ডা দুজন তখন সরে পড়েছে!

তাই নাকি ? আগে তো আমায় বলো নি ?

বলি-বলি করেও বলা হয়নি। বাবা পুলিশে খবর দিয়েছিলেন, তাও ওরা পিছু ছাড়ে নি।

আমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পর আর এসব উটকো ঝামেলা থাকবে না। এসো, জলের ধারে বসি।

ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল দুজনে। সামনের দিকে তাকাল ওরা—শুধু জল আর জল। বড় বড় খানতিনেক জাহাজ কলকাতার দিকে চলেছে। এত দূর থেকে বুঝতে পারা গেল না কোন্ দেশের জাহাজ।

মিনিট কুড়ি গল্প হল দুজনের।

সুপর্ণা আর বসল না। বলা যায় না, বুড়ো যদি জিনিসপত্রের মায়া ছেড়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে, তাহলেই তো চিত্তির। কাল কোথায় দেখা হবে জেনে নিয়ে সুবীর বিদায় নিল।

ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুপর্ণা। সুবীর চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ও পা বাড়াল।

কাছাকাছি আসতেই কানে এল বাজনার ঝঙ্কার। রাজীব ট্রানজিস্টার শুনছেন। বুড়োর শখ আছে। শুধু শখ নয়, মনে বেশ পুলক আছে। ঝোপে-ঘেরা জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু সুপর্ণা স্তম্ভিত হল। রাজীব হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন শতরঞ্চির ওপর, আর একধারে কাত হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ট্রানজিস্টার বাজছে।

সুপর্ণা দৌড়ে তাঁর কাছে এল।

অজ্ঞান হয়ে গেছেন নাকি? হঠাৎ—!!! একটু ইতস্ততঃ করে বহুকষ্টে রাজীবকে সোজা করে শোয়ালো। একি! শরীর এত শক্ত কেন? বুক যেন সন্দেহজনক ভাবে স্থির, ওঠা-নামা করছে না। তবে কি—

না, না, তা নয়—তা নয়। উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন, নিশ্চয় হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সুপর্ণা নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হল। যেখানে রাজ্যের লোক এখানে-ওখানে বসে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সেখানে ছুটে গেল। প্রথমে যে ভদ্রলোককে দেখতে পেল তাঁকেই বলল, ভীষণ বিপদে পড়েছি—আমার সঙ্গী ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, যদি একটু সাহায্য করেন—

মিষ্টি মুখে অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি আর তাঁর সঙ্গী আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সুপর্ণার সঙ্গে গেলেন; করবার কিছু ছিল না। রাজীবকে দেখেই সকলে বুঝতে পারলেন, তিনি মারা গেছেন। হাওয়ার মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে; জনকয়েক ডাক্তারও ছিলেন তাদের মধ্যে।

একজন বললেন, আমার মতে পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল।

অবস্থা যতদূর শোচনীয় হওয়া সম্ভব সুপর্ণার এখন তাই। দুর্বিপাক একেই বলে; মনের আনন্দে পিকনিক করতে এসে লোকটা মারা গেল!

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলছেন কেন?

মুখের অবস্থা দেখেই বলছি। মনে হচ্ছে, পয়জনিং ডেথ।

পয়জনিং ডেথ! সুপর্ণা অন্ধকার দেখতে লাগল; এই সময় সুবীর পাশে থাকলে যে কত সুবিধা হত।

বিষ-প্রয়োগে ভদ্রলোক মারা গেছেন, খবর রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে কে থাকতে চায়! পুলিশে সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হল না। কে যে সংবাদ দিল ভগবান জানেন!

ডায়মণ্ডহারবারের সদর থানার ও-সি সদলবলে ঘটনাস্থলে এলেন। তখন ট্রানজিস্টার বাজছিল। কেউ কোথাও নেই। পিকনিক পিয়াসীরা সম্পূর্ণ

মুছে গেছেন সেখান থেকে। শুধু সতর্বাঞ্চর একপাশে বসে, প্রবল জ্বর হলে মানুষ যেভাবে কাঁপে সেইভাবে ঠকঠক করে কাঁপছে সুপর্ণা। আর একপাশে বিষ জর্জরিত রাজীবের দেহ পড়ে আছে। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর মৃত্যুর পরও বীভৎসতার কোন ছায়া নেই. যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ও-সি সরোজবাবু প্রথমে ট্রানজিস্টারটা বন্ধ করে দিলেন। দু-চারটে প্রশ্নের মাধ্যমে ঘটনাটা জেনে নিলেন।

সুপর্ণা কোন রকমে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করল।

সরোজবাবু বললেন, বডি দেখে আমারও মনে হচ্ছে বিষপ্রয়োগে খুন করা হয়েছে ভদ্রলোককে।

খুন করা হয়েছে!

কিম্বা উনি আত্মহত্যা করেছেন। এমনও তো হতে পারে সন্দেহ অমূলক। এক্ষেত্রে বডি আমাকে পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।

সরোজবাবু সুপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এলেন। রাজীবের দেহ জিপে তুলে নেওয়া হল। তাঁর জিনিসপত্র ও মোটরকার সঙ্গে চলল। দুজন কনস্টেবলকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করে রাখা হল।

হৈ-হৈ পরে গেছে চারিদিকে।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই দৈনিকপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠল। বড় বড় হেডিংয়ে পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া হল, প্রখ্যাত শিল্পপতি রাজীব মজুমদার খুন হয়েছেন। এ-কথাও সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল, পিকনিক প্যারাডাইস ডায়মণ্ডহারবারে তিনি তরুণী প্রণয়িণীকে সঙ্গে নিয়ে চিত্তবিনোদনের জন্যে গিয়েছিলেন, দুর্ঘটনা সেখানে ঘটেছে। নেপথ্যে নারী-ঘটিত কোন ব্যাপার থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এদিকে পুলিশের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ডায়মণ্ডহারবারে ছুটে গেছেন দেবেনবাবু। মৃতদেহ ততক্ষণে পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সনাক্ত-করণের প্রশ্ন না ওঠায় পূর্বাহ্নে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠানো হচ্ছে। দিশেহারা দেবেনবাবু পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কলকাতায় ফিরে এলেন।

ইংল্যাণ্ডে কেব্‌ল করলেন রাজেশকে।

গভর্ণমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে রাজেশের পরিবর্তে অন্য একজনকে ডেলিগেট মনোনিত করে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হল। রাজীব মারা যাবার চতুর্থ দিন বিদেশ থেকে ফিরল রাজেশ। মুহ্যমান রাজেশকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন দেবেনবাবু।

সন্ধ্যাবেলা হোমিসাইড স্কোয়াডের অভিজ্ঞ অফিসার মিঃ সামন্ত ওদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। নিজের পরিচয় দেবার পর বললেন, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সন্দেহের আর কোন কারণ নেই—পটাসিয়াম সায়নাইডের সাহায্যে খুন করা হয়েছে মিস্টার মজুমদারকে! সৎকারের জন্যে মৃতদেহ আপনারা যে-কোন সময় নিয়ে আসতে পারেন।

তিনি আরও জানালেন, চব্বিশপরগণা পুলিশের হাত থেকে তাঁরা কেসটি টেক-আপ করেছেন। এবার তদন্ত আরম্ভ করতে চান।

ওদিকে নির্মলাও সংবাদ পেয়েছে। মেয়ের মুখ থেকেই সংবাদ পেয়েছেন। তার মুখ দেখে বুঝতে পারা গেল না তার মনে কোন বিকার উদয় হয়েছে কিনা। সেদিনের পর থেকে বলতে গেলে সুপর্ণা বিছানা নিয়েছে। রাজীবের মৃত্যুতে ও যে কাতর হয়ে পড়েছে তা নয়; আসলে সত্যি যদি খুন হয়ে থাকেন, পুলিশ ওকে নিয়ে প্রচুর টানা-হেঁচড়া করবে, কাতরতা সেই কারণে।

রাজীবের মৃত্যুর পরের দিন রোজমেরি জুটমিল বন্ধ ছিল। তার পরের তু'দিন অফিস যায় নি সুপর্ণা। সুবীর উদ্বিগ্ন হচ্ছে, উপায় কি? হয়তো একদিন মরিয়া হয়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হতে পারে।

রণেশ উড়োন-চণ্ডীর মত আবার উধাও হয়ে যায় নি, বাড়িতেই আছে। রাজীবের মৃত্যুতে তার মনে কি-রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে নির্মলার মতই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে রণেশ গাঙ্গুলী এই চারদিনে বাড়ির বাইরে পা দেয় নি, এটুকু বলা যায়। বাইরের ঘরে বসে সে সিগারেট ফুঁকছিল।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল বার কয়েক।

উঠে গিয়ে দরজা খুলেই চমকে উঠল।—পুলিশ।

পুলিশ কর্মচারি নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, এখানে সুপর্ণা গাঙ্গুলী থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি…

সুপর্ণা আমার মেয়ে।

ও! তাঁকে এখানে ডেকে দিন।

রণেশ ভেতরে গেল।

পুলিশ এসেছে শুনেই সুপর্ণা আরো দমে গেল। মনকে যত বোঝাবার চেষ্টা করে, রাজীবকে যখন ও খুন করে নি, তখন এত ভয় পাবার কি আছে? পোড়া-মন বুঝতে চাইলে তো!

রণেশ ও নির্মলার সঙ্গে পুলিশ-অফিসারের কাছে এল স্বপর্ণা।

নমস্কার! আপনাকে আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে।

থানায় কেন?—রণেশ দ্রুত প্রশ্ন করল।

থানায় গেলেই উনি সব বুঝতে পারবেন, আসুন।

বেলা গড়িয়েছে।

দুশো একচল্লিশের কে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বসবার ঘর তখন গল্পমুখর।

বাসব বলছিল: তুমি বুঝতে পারছ না ডাক্তার, কেসটাকে ওই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে কখনই কূলে এসে পৌঁছতে পারবে না। আমি যে প্রথমে ধাঁধায় পড়ে যায় নি তা নয়, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করবার পর এগিয়ে যাবার পথ পেলাম। প্রথমেই দেখতে হবে বেসিনে রক্তের দাগ এল কেন? হত্যাকারী…

বাসব কথা শেষ করবার আগে সোমা বাধা দিল। ঘরে ছিল না, ঢুকতে ঢুকতে বলল, খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে হয়, তা নয় সমানে বকে চলেছেন।

শৈবাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, জমাটি আড্ডাটাকে মাটি করতে এলে তো?

তোমার আর কি বসে বসে গল্প শুনছ, বকে মরতে হচ্ছে ওঁকে।

বাসব সম্প্রতি যে কেস সলভ করেছে তারই কথা শুনছিলাম। তুমি এখন এমন কি রাজকার্য করছ? বসো ওই কোচে, খুব ইন্টারেস্টিং।

সোমা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাসব মৃদু হেসে বলল, দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া আমার অভ্যাস নেই! বসো, তুমি শোনো গল্পটা।

বাহাদুরের রান্না কিছুদিন থেকে খুব বিস্বাদ লাগছিল বাসবের কথাটা শৈবালের কানে উঠতেই ও বলেছিল, কয়েকদিন সোমার হাতের রান্না খেয়ে মুখ বদলাও।

বাসব বলেছিল, মন্দ প্রস্তাব নয়। এক কাজ করো না, তুমি আর সোমা দিন পনেরোর জন্যে চলে এসো না আমার বাড়িতে। হৈ-হৈও হবে আবার ভালটা-মন্দটা পেটেও পড়বে।

তথাস্তু!

শৈবালদের এ-বাড়িতে আসার আজ দ্বিতীয় দিন। তাছাড়া রবিবার থাকায় দুপুরবেলা আড্ডা জমতে বাধা নেই।

ঘটনাটা সোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করবার আগেই বাহাদুরের নিরেট চেহারার দর্শন পাওয়া গেল। মূর্তিমান প্রতিবন্ধকের

মত সে জানালে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

অগত্যা সোমাকে ভেতরে যেতে হল।

বাসব বলল, ভদ্রলোককে নিয়ে এসো।

আগন্তুক ঘরে এলেন। শৈগাল খুঁটিয়ে দেখল, আগন্তুক যুবক শ্রেণীর। দীর্ঘ ঋজু দেহ, গায়ের রং কালো হলেও মুখে শ্রী আছে। অভিজাত ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। বেশ বিচলিত হাবভাব।

বাসববাবুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।

আমিই। বসুন। আপনি—?

আগন্তুক কোচে বসে পড়ে বলল, আমার নাম সুবীর ব্যানার্জী।

বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

বাসব হেসে বলল, প্রয়োজন না থাকলে কে আর আমার কাছে আসে। কি প্রয়োজনে এসেছেন, এবার তাই বলুন।

আমার ভাবী স্ত্রীকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে; তাকে কোন রকমে বাঁচাতে হবে বাসববাবু।

অকারণে তো পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। তিনি নিশ্চয় এমন কিছু করেছিলেন, যার জন্যে—

সে কিছুই করে নি। কাগজে শিল্পপতি রাজীব মজুমদারের খুন হওয়ার কথা নিশ্চয় পড়েছেন? তাঁর হত্যাকারী হিসেবে পুলিশ সুপর্ণাকে গ্রেপ্তার করেছে। খোলা জায়গায় একটা মানুষকে খুন করা কি কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব?

বাসব সোজা হয়ে বসল। রাজীব মজুমদারের খুন হওয়ার কথা এখন কে না জানে? প্রতিটি দৈনিকপত্র এই নিয়ে এখন হৈ চৈ-এর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

অর্থাৎ আপনি আমার সাহায্যে আসল হত্যাকারীকে ধরতে চান, যাতে আপনার ভাবী স্ত্রী পুলিশের হাত থেকে রেহাই পায়।

এক্সজ্যাক্টলি।

আপনাকে আগে আমায় ঘটনাটা বলতে হবে, তারপর চিন্তা করে দেখব কেসটা আমার পক্ষে টেকআপ করা সম্ভব হবে কিনা।

বেশ, শুনুন।

সুবীর ঘটনাটা মোটামুটি বলল। সুপর্ণার প্রতি রাজীবের ইন্টারেস্টের কথা বাদ দিল না। বণ্ডে সই করানোর কথাও বলল। শুধু বাদ দিল নিজের ডায়মণ্ডহারবারে উপস্থিতির কথা।

বাসব চুপ করে কয়েক মিনিট জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকার পর বলল, হুঁ, বেশ জটিলতা রয়েছে দেখছি। কেসটা নিলাম। পুলিশকে প্রাইভেট

এনকোয়ারির কথা যদি না জানিয়ে থাকেন, জানিয়ে দিন। এবার গোটা কয়েক কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

করুন।

ওই যে বণ্ডের কথা বললেন—সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ওতে আপনার। রাজীব মজুমদারের কিছু অঘটন আর না ঘটালেও, দশ বছরের আগে সুপর্ণা দেবীকে আপনার বিয়ে করার সম্ভাবনা ছিল না। বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি?

দ্রুত গলায় সুবীর বলল, ওই কারণে আমি মজুমদারকে খুন করেছি, আপনি বোধহয় এই কথা বলতে চাইছেন?

না; আমি বলতে চাইছি, রাজীব মজুমদারের বণ্ডের হাত থেকে সুপর্ণা দেবীকে রেহাই দেবার কোন পরিকল্পনা আপনার ছিল কিনা?

অস্বীকার করব না, মজুমদারের ওপর দুঃসহ রাগ আমার হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বণ্ডটা হাতে পেলে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিই। ওই রাগ অবধিই সার, আর অগ্রসর হবার ক্ষমতা আমার কোথায়!

যেদিন রাজীব মজুমদার মারা যান, সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

ছুটির দিন ছিল—বাড়িতে ছিলাম।

আচ্ছা, আপনার কাকে হত্যাকারী বলে মনে হয়?

পার্টিকুলার কোন নাম করা শক্ত। আমার বিশ্বাস, রাজীব মজুমদারের বিরাট ব্যবসা ছিল, কাজেই তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না।

এবার আপনি যেতে পারেন সুবীরবাবু, প্রয়োজন বোধে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ঠিকানা রেখে যান।

পকেট থেকে নামাঙ্কিত কার্ড বার করল। তার তলায় ঠিকানা লেখা শেষ করে, বাসবের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, পেমেন্টের বিষয় তো কোন কথা হল না।

হবে—কেসটা সল্ভ করতে যদি পারি, তারপর। চিন্তিত হচ্ছেন কেন? কিঞ্চিৎ ব্যস্ত না থাকলে আমার কাছে আসতেন না। তাছাড়া আমার দাবী কিছু আকাশ ছোঁয়া নয়।

সুবীর আর কিছু বলল না, নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

শৈবাল তার নিয়মিত প্রশ্ন পুনরুক্তি করল, কি রকম বুঝলে?

বাসব সিগারেট ধরাল। কয়েক মিনিট ধরে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ল।

কি বলছিলে?…ও, না, বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি এখনো। চলো ডাক্তার, পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে ঘুরে আসি। কাগজে দেখেছিলাম আমাদের মিঃ সামন্তের হাতে কেসটা রয়েছে। হয়তো কিছু তথ্য সংগ্রহ

করা যেতে পারে।

ওরা দুজন বেরিয়ে পড়ল।

মিঃ সামন্ত অফিসে ছিলেন। ওদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, মড়ার গন্ধ পেলে আর রক্ষে নেই—শকুনের ছোঁ মারা চাই।

বাসবও সহাস্তে বলল, মড়ার তো ছড়াছড়ি—কতজনের ওপর ছোঁ মারব বলুন ?

আরে মশাই, মাদার মণ্ডল খুন হল কি ধরু গয়লা খুন হল, তার জন্তে যেন আপনার কত মাথা ব্যথা! আসল মড়াটির উদ্দেশে এসেছেন, বুঝতে কি আর পারি নি!

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যাক, ভালই হল, আপনার সহযোগিতা না পেলে কিছুই করা যাবে না।

সিগারেটের টিন বাসবের দিকে ঠেলে দিয়ে সামন্ত বললেন, প্রতিবারই তো ছেলে-ভুলোনো কথা বলেন। আসলে যা বলতে এসেছেন ঝেড়ে কাশুন।

ওরা দুটো চেয়ার দখল করেছিল আগেই। বাসব টিন থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ঝেড়ে না কেসে উপায় কি ? প্রথমে মশাই, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখব।

সামন্ত টেবিলের দেরাজ থেকে রাজীবের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বার করে দিলেন। বাসব পুরো রিপোর্টটা পড়ল মন দিয়ে। রিপোর্টে বলা হয়েছে মৃত্যু হয়েছে পটাসিয়াম সায়নাইডে। ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগায় নিডিল দিয়ে পাংচার করার চিহ্ন বর্তমান। সায়নাইড ওই পথ দিয়েই শরীরে প্রবেশ করেছে। আর কোন কাটা-ছেঁড়ার দাগ শরীরে নেই।

রিপোর্ট সরিয়ে রেখে বাসব বলল, আপনি কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন নাকি মিস্টার সামন্ত ?

আপনি যাকে বাঁচাবার জন্তে নিযুক্ত হয়েছেন, আমরা সেই সুপর্ণা গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার যখন করেছি, তখন মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে বলা চলে।

হুঁ। মিস গাঙ্গুলীকে সন্দেহ করার কারণটা বলবেন কি ?

কেন বলব না। দুর্ঘটনার সময় উনি ছাড়া আর কেউ ছিল না মিস্টার মজুমদারের কাছে। ওঁর কথাবার্তা অত্যন্ত অসংলগ্ন। নিজের কোন উক্তির জোরাল যুক্তি বা সাক্ষী খাড়া করতে পারছেন না।

খুনের একটা মোটিভ তো থাকা চাই।

আছে বৈকি। সুপর্ণা দেবী সুধীর ব্যানার্জীর প্রেমাসক্ত। এদিকে মিস্টার মজুমদার আবার তাঁর প্রেমে পড়লেন। তিনি ব্যবসাদার লোক, হাত

কলকে যাতে না যায়, সেই কারণে সুপর্ণা দেবীকে দিয়ে একটা বণ্ড সই করিয়ে রাখলেন। এখন আপনি বলুন মশাই, যুবার প্রেমে যে মেয়ে মজেছে, হাজার টাকা থাক, তবু বুড়োকে ভাল লাগবে কেন? এদিকে বণ্ডের একটা আড়কাঠি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে…

হুঁ। সংশ্লিষ্ট সকলের এজাহার নিয়েছেন নিশ্চয়। সেই এজাহারের একটা করে কপি পেলে ভাল হয়।

কাল সকালে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

সুপর্ণা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাত করবার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে মশাই। আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঠিকানা এজাহারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।

সুপর্ণা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাত আপনার এখুনি হতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধার জন্যে তাঁকে এখন লালবাজারের লক-আপেই রাখা হয়েছে।

বাসব টিন থেকে সিগারেট তুলে নিয়েছিল, কিন্তু ধরায় নি। এবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, উনি আপনাদের কাছে কোন কথা স্বীকার করেছেন।

কোন কথা না। ভদ্রমহিলা গুম মেরে গেছেন!

চলুন, ওঁর কাছে যাওয়া যাক। যাওয়ার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি মিস্টার সামন্ত—

সামন্ত উৎসুক দৃষ্টি তুললেন।

আপনার থিওরি মেনে নিতে আমি পারলাম না।

কোন থিওরি?

সুপর্ণা দেবীকে হত্যাকারী প্রতিপন্ন করার থিওরি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে আমার কথার সমর্থন পাওয়া যাবে।

কি রকম?

আপনি আমায় বুঝিয়ে বলুন মিস্টার সামন্ত; আমি যদি আপনার ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগায় ছুঁচ ফোটাতে যাই, আপনি আমায় বাধা দেবেন কিনা? দেবেন। রাজীববাবুও দিয়েছিলেন, এবং বাধাপ্রাপ্ত হলে একাজ কোন রকমেই করা সম্ভব নয়। এখানে ভুলে গেলে চলবে না, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে আমরা পাচ্ছি, তাঁর শরীরে আর কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ তাঁকে আহত বা অজ্ঞান করে যে ছুঁচ ফোটানো হয়েছে, সে-কথাও বলা যাচ্ছে না। এমনও তো হতে পারে, সুবীরবাবু আমায় যা বললেন তার ওপর নির্ভর করে বলছি, সুপর্ণা দেবী মিনিট কুড়িকের জন্যে জলের ধারে গিয়েছিলেন। রাজীব মজুমদার একা ছিলেন তখন, অঘটন যা ঘটবার ঘটেছে সেই সময়।

কিন্তু মেন পয়েন্ট তো স্টাণ্ডিং রইল মিস্টার ব্যানার্জী। আহত না করে মজুমদারের আঙুলে ইঞ্জেক্ট করা হল কিভাবে?

এই তো কাজে নামলাম। সমস্ত কিছু তলিয়ে ভাবতে দিন, উত্তর একটা

পাব নিশ্চয়। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সুপর্ণা গাঙ্গুলীকে আমি নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারব। চলুন এবার।

সামন্ত ওদের লক-আপে নিয়ে গেলেন।

ম্রিয়মান সুপর্ণা পায়চারি করছিল। চিন্তায় চিন্তায় ওর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। সামন্ত বাসবের পরিচয় দিয়ে এবং কি কারণে সুপর্ণার সঙ্গে ও সাক্ষাত করতে চায়, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ওখান থেকে সরে গেলেন।

বাসব ওর অবস্থার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আসল কথা আরম্ভ করল।

আপনাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি নিযুক্ত হয়েছি। সে-কাজে আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না জানবেন, সাফল্য নির্ভর করছে আপনার সহযোগিতার ওপর।

ভাঙা গলায় সুপর্ণা বলল, আমায় কি করতে হবে বলুন?

পুলিশকে রেখে-ঢেকে বলেছেন কিনা জানি না, আমাকে কিছু না লুকিয়ে সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে হবে। রাজীব মজুমদারের কনসার্নে আপনি কিভাবে ঢুকলেন ওখান থেকে আরম্ভ করুন।

সুপর্ণা একটু চুপ করে থেকে আরম্ভ করল—ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কথা বলে গেল। নির্মলার সঙ্গে রাজীবের প্রথম যৌবনে কি সম্পর্ক ছিল, রণেশ ও নির্মলা ওর কাছে কি প্রস্তাব করেছিলেন, দুজন গুণ্ডা কিভাবে ওর পিছু লেগেছিল, এবং সুধীর ও গুণ্ডা দুজনের ডায়মণ্ডহারবারে উপস্থিতি—কিছুই বাদ দিল না।

বাসবের মনে হল সুপর্ণার বর্ণনা ভঙ্গি বিশ্বাসযোগ্য।

এবার গোটা কয়েক প্রশ্ন করব।

বলুন?

যে লোক আপনাকে চাকরির সন্ধান দিয়ে টেলিফোন করেছিলেন, তার পরিচয় এখনও আপনার কাছে অজ্ঞাত?

হ্যাঁ। অনেক সময় ভেবেছি কে হতে পারে কিন্তু বুঝতে পারি নি।

অশ্লীল মন্তব্য করা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে গুণ্ডা দুজন এগিয়েছিল কি?

না।

বণ্ডে সই করে দেবার পর আপনি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তাই না?

হ্যাঁ। অবশ্য ওটা চুরি হয়ে যায়।

চুরি হয়ে যায়!

ঠিক চুরি যে হয়েছে, এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে মিস্টার মজুমদার মারা যাবার দিন দুয়েক আগে, ড্রয়ারে কি খুঁজতে গিয়ে আমায়

বলেছিলেন বণ্ড-পেপারটা কেউ সরিয়েছে এখান থেকে।

হুঁ।

সুবীরবাবু আমার কাছে ডায়মণ্ডহারবারে উপস্থিতির কথা চেপে গেছেন। যা হোক, আপনি যখন অনুমতি নিয়ে জলের ধারে গেলেন, তখন মজুমদার কি করছিলেন ?

উনি আমায় বলেছিলেন, তুমি যাও, আমি ততক্ষণ ট্রানজিস্টার বাজাই।

আপনি আবার যখন ফিরে এলেন, তখন দূর থেকে কোন আওয়াজ পেয়েছিলেন ? মানে···কোন কথাবার্তার আওয়াজ ?

না। বাজনার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

তারপর।

এসে দেখি, উনি মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন আর ট্রানজিস্টার বাজছে।

ধন্যবাদ মিস গাঙ্গুলী! আর কোন প্রশ্ন এখন নেই। ভরসা করি, আপনাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

প্রত্যেকের স্টেটমেণ্ট এসে গেল পরের দিন।

খুঁটিয়ে পড়ল বাসব।

সকলে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথা বলেছেন, না কিছু পারসেণ্ট মিথ্যা মেশানো আছে, তা আবিষ্কার করা রীতিমত কষ্টকর। বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বাসব। তীক্ষ্ণ মন নিয়ে পরিস্থিতিকে বাজিয়ে দেখতে লাগল।

এক সময় দেওয়াল ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল। শৈবাল বাড়ি নেই, ডিউটিতে বেরিয়েছে। সোমা দিবা-নিদ্রার আরাধনা করছে। বাসব কোচ ছেড়ে উঠে পড়ল। জামা-কাপড় বদলে ডালহাউসীর উদ্দেশে যাত্রা করল। সকলের ঠিকানা পাওয়া গেছে, একে একে সকলের সঙ্গে দেখা করবে। এখন রাজেশের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

অফিস খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। খবর নিয়ে জানা গেল, ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পর রাজেশ অফিসে যোগ দেয় নি। মামা দেবেনবাবু অবশ্য আছেন। বাসব কার্ড পাঠিয়ে দিল তাঁর কাছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বেয়ারা ওকে দেবেনবাবুর কাছে নিয়ে গেল।

দেবেনবাবু পূর্বাহ্ণে পুলিশের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন, সুবীর সুপর্ণাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাপয়েণ্ট করেছে। এ-কথা সকলকেই জানানো হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। বাসবের নাম দেবেনবাবুর কাছে অপরিচিত নয়। ওর তীক্ষ্ণ প্রতিভার অনেক উদাহরণ তিনি খবরের কাগজের পাতায় দেখেছেন।

থমথমে মুখে প্রৌঢ় দেবেনবাবু বাসবকে স্বাগত জানালেন।

বাসব বসতে বসতে বলল, আপনার মনের অবস্থা ভাল নেই জেনেও আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

আপনি তদন্তভার গ্রহণ করেছেন, পুলিশের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি। মনের অবস্থা সত্যি ভাল নেই। আপনাকে যে খুব বেশি সময় দিতে পারব, তাও নয়। আর পাঁচ মিনিট পরে এলে আপনি আমাকে এখানে দেখতে পেতেন না, বাড়ি চলে যেতাম।

আপনার বেশি সময় আমি নেব না, গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর পেলে আমার চলবে। রাজীববাবুর আর্লি-লাইফ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন ভাল হয়।

দেবেনবাবু ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, জামাইবাবুর খুন হওয়ার সঙ্গে তাঁর আর্লি লাইফের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।

একটা জটিল তদন্তের সমাধানে আসতে গেলে অনেক বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হয়। ওঁর প্রথম জীবনের ইতিহাস হয়তো আমার কোন কাজে লাগবে না—হয়তো লাগবে। অসুবিধা না হলে বলুন।

দেবেনবাবু আর কথা বাড়ালেন না, সংক্ষেপে বললেন। স্ত্রীকে খুন করা, জেলে যাওয়া—সব বলতে হল।

সুপর্ণা দেবী রাজীববাবুকে খুন করেছেন বলে আপনার বিশ্বাস?

যা দিনকাল পড়েছে, অবিশ্বাস করবার তো কিছু দেখি না!

মিস্টার মজুমদার ও মিস গাঙ্গুলীর মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয় কিছু বলবেন কি?

অবান্তর প্রশ্ন করছেন। সম্পর্ক যে কি ধরনের ছিল, তা আপনিও জানেন। এ ব্যাপারে আমি জামাইবাবুর বিশেষ দোষ দেখি না, প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটা তাঁকে খারাপ পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আপনাদের বাড়ির একজন চাকর পুলিশকে এজাহার দিয়েছে, রাজীববাবু মারা যাবার কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে আপনার নাকি ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল?

হয়েছিল। সুপর্ণার ব্যাপার নিয়েই হয়েছিল।

কিছু মনে করবেন না; তাঁর মৃত্যুতে আপনার আর্থিক লাভ কিছু হয়েছে কি?

না। জেলে যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ছেলেকে দান করেছিলেন। জেল থেকে ফিরে এসে হাজার টাকা মাসোহারা নিতেন মাত্র। রাজেশ অবশ্য আমাকে দু-লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক একাউন্ট করে দিয়েছে।

আপনি জানতেন, সুপর্ণা দেবী মিস্টার মজুমদারের প্রাক্তন প্রণয়িনী নির্মলা দেবীর মেয়ে?

তাই নাকি! আমি তো জানতাম না।

মিস্টার মজুমদার সুপর্ণা দেবীকে দিয়ে একটা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কিছু জানেন ?

সুপর্ণার বাবা রণেশ গাঙ্গুলীর মুখে শুনেছি ; আর কিছু জানি না।

শুনেছেন, বস্তুটা চুরি গেছে ?

না।

আপনাকে আর বিরক্ত করব না। রাজেশবাবুকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

বাড়িতে আছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি, চলুন আমার সঙ্গে।

ধন্যবাদ।

মজুমদার প্যালেস দেখবার মত একখানা বাড়ি। মার্বেল পাথরে গাঁথা, গথিক পদ্ধতিতে তৈরি বাড়িখানার দিকে তাকালে মনে হয়, অতীতের প্রতিনিধি লজ্জা দিচ্ছে আধুনিক হর্ম্যশিল্পকে। দেবেনবাবু বাসবকে পার্লারে বসিয়ে রাজেশকে খবর দিতে গেলেন।

মুণ্ডিত-মস্তক রাজেশ এল। রাজীবের অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার দরুন তিনদিনে অশৌচ-পর্ব শেষ করেছে ও। মুখের ওপর করুণ বিষাদের আবরণ। একটা বেতের চেয়ারে বসল।

বাসব বলল, কর্তব্যের খাতিরে না এসে উপায় ছিল না।

আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। মিস গাঙ্গুলী যদি সত্যি অপরাধী না হন— বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমাদেরও নিতে হবে। আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারেন।

ধন্যবাদ। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে নারীঘটিত ব্যাপারে মিঃ মজুমদার খুন হয়েছেন। মিস গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর মেলামেশা করাটা আপনি পছন্দ করতেন ?

আমি হেড অফিসে বেরোই। বাবা মিল-এ যেতেন। কাজেই আমি তাঁর সঙ্গে মিস গাঙ্গুলীর মেলামেশার বিষয় জানতে পারি নি। জেনেছি ইংল্যাণ্ড যাবার কয়েকদিন আগে মামার মুখ থেকে। আসল কথা কি জানেন —আমি এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখি না।

অর্থাৎ—

তদন্ত যখন হাতে নিয়েছেন, তখন বাবার সম্বন্ধে সব কথাই শুনে থাকবেন। প্রাচুর্যের মধ্যে জন্মেও জীবনের বেশির ভাগ সময় অশান্তি আর কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন। শেষে মনের শান্তির জন্যে যদি কাউকে বেছে নিয়ে থাকেন, অত্যন্ত সঙ্গত কাজ করেছিলেন। আমার মতে ;—

মিস গাঙ্গুলীকে দিয়ে তিনি একটা বণ্ড সই করিয়েছিলেন জানতেন ?

মামার মুখে শুনেছি।

সেই বণ্ড পরে তার ড্রয়ার থেকে চুরি গেছে?

এ-বিষয় কিছু শুনিনি।

বেয়ারা-দু-কাপ চা দিয়ে গেল।

নিন, চা খা'ন।

বাসব চা-এর কাপ তুলে নিল।

লণ্ডনে আপনি কেব্‌ল পান ক'টায়?

রাত প্রায় এগারোটার সময়। তখন আমাদের ঘরোয়া বৈঠক হচ্ছিল, পরের দিন গিল্ড হলে ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে কে কোন পয়েণ্টে রেজ করবে, এই নিয়ে। কেব্‌ল পাবার পর আমার মনের অবস্থা কি রকম হল বুঝতে পারছেন। কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তরের কাছ থেকে কেব্‌ল পেলাম মাঝরাত্রে, তাঁরা জানিয়েছেন আরেকজন ডেলিগেটকে না পাঠানো পর্যন্ত আমি যেন না আসি। ভোরে ছুটলাম হাইকমিশনারের অফিসে। ব্যবস্থা করে তবে দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতা রওনা হলাম।

বাসব বলল, আপনার বাবা প্রথম যৌবনে নির্মলা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। সংবাদ পেয়েছি, সুপর্ণা দেবী তাঁরই মেয়ে। এ বিষয়ে কোন কিছু জানা থাকলে বলুন।

সংবাদটা আমার কাছেই নতুন। আত্মীয়-স্বজন না থাকার দরুন বাবার প্রথম জীবনের অনেক কথা আমার অজানা রয়ে গেছে। মামার কাছ থেকে ভাসা-ভাসা শুনেছি মাত্র। নির্মলা দেবীর কথা অজানা নয়।

ধরুন মিস্টার মজুমদার, আপনার বাবাকে সুপর্ণা দেবী খুন করেন নি। আর কাউকে সন্দেহ হয়?

কাকে হবে বলুন? আমার দৃঢ় ধারণা, মিস গাঙ্গুলী বাবাকে খুন করেন নি। তাঁর মত মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষকে খুন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আপনি কতদূর অগ্রসর হলেন?

সবে তো কাজে নেমেছি, বলতে গেলে কয়েক পা'র বেশি অগ্রসর হইনি। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। প্রয়োজনবোধে আবার আসতে পারি।

আসবেন।

বাসব মজুমদার-প্যালেস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির সন্ধানে বড় রাস্তায় এল। এখন নির্মলা আর রমেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করে নিতে পারলে সাক্ষাৎ-পর্ব শেষ হয়। তারপর পুরো ব্যাপারটাকে তলিয়ে ভাবব।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দেশবন্ধু পার্ক পৌঁছতে এরপর আর কতক্ষণ লাগে! নম্বর দেখে বাড়িটা খুঁজে বার করতেও সময় নিল না খুব বেশি। বারকয়েক কড়া নাড়তেই দরজা খুলে রমেশ গাঙ্গুলী বেরিয়ে এল।

কাকে চাই ?

রণেশবাবু বাড়ি আছেন ?

আমার নাম রণেশ গাঙ্গুলী। আপনি কে ?

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলল।

অসহিষ্ণু গলায় রণেশ বলল, আমার যা বক্তব্য পুলিশকে বলেছি, আর কিছু বলবার নেই।

আপনার স্টেটমেণ্ট আমি দেখেছি। ও ছাড়াও গোটাকতক প্রশ্ন আমার আছে।

আপনার প্রশ্ন থাকলেও আমার মনের অবস্থা উত্তর দেবার মত নয়। আচ্ছা, নমস্কার।

বাসব দৃঢ় গলায় বলল, আপনি একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন মিস্টার গাঙ্গুলী। আমাকে ফিরিয়ে দিলেই যে সব চুকে যাবে, তা নয়। বাধ্য হয়ে আমাকে বাঁকা পথ ধরতে হবে। পুলিশ আপনাকে জোর করে থানায় নিয়ে যাবে, সেখানে আমার কথার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন। তাছাড়া মনের অবস্থার যে কথা বলছিলেন, তা কোন জোরাল যুক্তিই নয়। মেয়েকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টায় আপনি করেন নি। আমাকে নিযুক্ত করার কথা আপনার, সুবীরবাবুর নয়।— আবার তদন্তে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন।

ওঁকে ভেতরে আসতে দাও—দরজার ওপাশ থেকে নির্মলা বলল।

রণেশ আর কিছু বলল না। অপ্রসন্ন মুখে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বাসব ভেতরে গেল, অনুরোধের অপেক্ষা না করে বসল চেয়ারে। নির্মলা গম্ভীর মুখে বসেছিল আরেকটা চেয়ারে।

বাসব বলল, আপনারা কেন যে আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন, মোটেই বুঝতে পারছি না। মেয়ে আপনাদের—তাঁর বিপদ কেটে যাক, এই আপনাদের কাম্য হওয়া উচিত ছিল।…যাক, গোটা কয়েক প্রশ্ন আছে, অনুগ্রহ করে সঠিক উত্তর দেবেন। রণেশবাবু, আপনাকে প্রথমে প্রশ্ন করছি। দুর্ঘটনার দিন সকাল থেকে বিকেল অবধি কোথায় ছিলেন আপনি ?

সকালে বাড়িতে ছিলাম। দুপুরবেলা ধর্মতলা স্ট্রীটের ভোরা ডিস্ট্রিবিউটার্সের ওখানে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম।

আপনারা সুপর্ণা দেবীর সাহায্যে রাজীব মজুমদারকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলেন, একথা সত্যি ?

একথা কে বলেছে আপনাকে ?

আপনার মেয়ে।

এর উত্তর আমার চেয়ে আমার স্ত্রী ভাল ভাবে দিতে পারবেন।

হুঁ। দুজন গুণ্ডা কি মিস গাঙ্গুলীকে বিরক্ত করছিল ?

হ্যাঁ, আমি পুলিশকে সংবাদ দিয়েছিলাম। ছুটো গুণ্ডাই খুব নাম করা—টেরিটি বাজারের যতীন আর লালু।

আপনি রাজীব মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন?

সুপর্ণার ব্যাপারে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমাকে অপমানিত করেছিলেন।

ভদ্রলোকের ওপর আপনি তাহলে সদয় ছিলেন না?

মোটেই না। আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি তাঁকে খুন করে মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছি নাকি? গোয়েন্দাদের চিন্তাধারা একটু আলাদা ধরনের শুনেছি।

আমাকে বিদ্রূপ করে লাভ নেই রণেশবাবু। আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। নির্মলা দেবী...

নির্মলা প্রশ্ন করবার আগেই বলল, রাজীব মজুমদারকে আমরা কেন হ্যারাস করতে চেয়েছিলাম, তার উত্তর আগে দিয়ে নিচ্ছি। আপনি এত কথা যখন জানেন, তখন একথাও নিশ্চয় শুনেছেন, যৌবনে রাজীবের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। সেই সময় সে একবার আমাকে প্রচণ্ড অপমান করেছিল। সুপর্ণার সাহায্যে সেই অপমানের প্রতিশোধ আমি নিতে চেয়েছিলাম।

এতদিনের মধ্যে সুযোগ ঘটে ওঠে নি?

না। ও জেলে ছিল।

আপনি ওঁৎ পেতেছিলেন বলুন? জেল থেকে বেরোবার পরই...

ঠিক তা নয়। আমি জানতাম না সুপর্ণা যেখানে কাজ করছে, সেই মিলের মালিক রাজীব। হঠাৎ জানতে পারলাম একদিন টেলিফোনের মাধ্যমে।

টেলিফোনের মাধ্যমে! কি রকম?

একজন ফোনে আমায় জানালেন, সুপর্ণা রাজীবের কনসার্ণে কাজ করে। সংবাদদাতা নিজের পরিচয় দেন নি।

বিচিত্র ব্যাপার! আপনার বিস্ময়বোধ হয়নি?

হয়েছিল, অনেক ভেবেও আমি স্থির করতে পারিনি সংবাদদাতা কে হতে পারে।

সুবীর ব্যানার্জীর সঙ্গে আপনার মেয়ের প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক আছে—কবে থেকে আপনি একথা জানতেন?

রাজীব মারা যাবার মাত্র ছ-সাত দিন আগে আমি জানতে পেরেছিলাম। ওর কাপড়ের আলমারির মধ্যে একটা ছবি আর গোটা কয়েক সুবীর ব্যানার্জীর লেখা চিরকুট পাই। তখন আঁচ করে নি ব্যাপারটা।

চিরকুটগুলোয় কি ধরনের কথা লেখা ছিল?

এই যেমন, অমুক সময় অমুক জায়গায় দেখা করবে বা অমুক দিন দেখা হবে না, অফিসের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকব—

বাসব গোটা কয়েক গতানুগতিক প্রশ্ন আওড়াল এরপর। উত্তর পাওয়া গেল ওই ধরনের। বিদায় নিল তারপর।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

শৈবাল আর সোমা চুপচাপ বসে সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ও ঘরে ঢুকতেই শৈবাল প্রশ্ন করল, কিহে, কোথায় ছিলে?

সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলাম।

কি রকম বুঝলে?

ঘণ্টা তিনেক পরে তোমায় বলছি। এখন ভাবতে চাই। সোমা, এক কাপ চা আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

বাসব নিজের ঘরে চলে গেল।

সোমা চা করে নিয়ে দিতে গিয়ে দেখল, বাসব দ্রুত পায়ে পায়চারি করছে ঘরময়। কিছু না বলে, টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে চলে এল।

বাসব ঘর থেকে বেরোল নটার পর। ওর মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়, এতক্ষণ চিন্তা করেও আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। শৈবালের কাছে এসে বসল একটা কোচে। হাই তুলে বলল, বড ভাবিয়ে তুলল হে!

কোন দিকে আলো দেখতে পাচ্ছো না।

উঁহু, তবে গোটা কয়েক জোরাল সূত্র আমার হাতে আছে। সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। একটা চার্ট তৈরি করলাম—পড়ে দেখো!

বাসবের হাত থেকে দুটো ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে শৈবাল পড়তে লাগল—

১। সুবীর ব্যানার্জী—সুপর্ণা গাঙ্গুলীকে ভালবাসেন। বণ্ডের ব্যাপারে রাজীব মজুমদারের ওপর বোধহয় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাছাড়া ধনী প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঈর্ষা থাকা স্বাভাবিক। দুর্ঘটনার দিন ডায়মণ্ড-হারবারে উপস্থিত ছিলেন—আমার কাছে সেকথা বেমালুম চেপে গেলেন। বণ্ড কেউ চুরি করেছে—বিষয়টা লক্ষ্যণীয়।

২। সুপর্ণা গাঙ্গুলী—মানুষ খুন করবার মত মানসিক জোর তাঁর নেই বলে মনে হল। তাছাড়া রাজীবকে খুন করবার অবকাশ তাঁর আগেও ছিল। ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে অপকর্ম করে যেচে নিজের ঘাড়ে দোষ নিশ্চয় চাপাবেন না। সুবীরকে ভালবাসেন বলেই রাজীবের এত টাকা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলেন না। কিছু অস্থিরতার মধ্যে নিশ্চয় ছিলেন। দুজন গুণ্ডা তাঁর পিছু নিয়েছিল। তিনি যখন চাকরির সন্ধান করছিলেন—রাজীব মজুমদারের মিল-এ চাকরি খালি আছে, কোন অজ্ঞাতনামা লোক ফোনে তাঁকে জানিয়েছিল একথা।

৩। রাজেশ মজুমদার—রাজীবের ছেলে। অল্প বয়সেই বিরাট ব্যবসা

চালাচ্ছেন। সম্পত্তি সব তাঁর। রাজীব হাজার টাকা মাসোহারা নিতেন মাত্র। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত, তিনি দুর্ঘটনার সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। একটু বেশি কথা বলেন। বাপের মৃত্যু হলে যে তিনি লাভবান হবেন, এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।

৪। দেবেনবাবু—রাজীবের শালা। মিল-এ কাজ করেন, থাকেন একই বাড়িতে। রাজীবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কারণ বিদ্যমান।

ক) রাজীব বহু বছর আগে তাঁর বোনকে খুন করেছিলেন।

খ) নিজের এক পয়সা তাঁকে দেন নি।

গ) সুপর্ণার সঙ্গে মেলামেশাটা দেবেনবাবু ভাল চোখে দেখেন নি। এই নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা হয়েছিল। রাজীব শালাকে অপমানিত করেছিলেন।

এই তিনটি কারণে দেবেনবাবুর রাগ রাজীবের বিরুদ্ধে দুর্বার হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

৫। রণেশ গাঙ্গুলী—সুপর্ণার বাবা। একটু তিরিক্ষি মেজাজের। মেয়েকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করবার কোন আগ্রহ নেই। তাছাড়া তদন্তে বাধা দিতে চান মনে হল। মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে পরে রাজীব মজুমদারকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলেন। রাজীব তাঁকে অপমানিত করেন। অপমান এবং তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে অসমর্থ হওয়া—এই দুই কারণে মজুমদারের ওপর অত্যন্ত রাগ হওয়ারই কথা।

৬। নির্মলা গাঙ্গুলী—রণেশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারকে ইনি যেন একটু বেশি মাত্রায় থমথমে করে রেখেছেন। যৌবনে রাজীবের সঙ্গে ভালবাসা ছিল। কোন কারণে রাজীব তাঁকে প্রচণ্ড অপমান করেছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ এতদিন পরে তিনি মেয়েকে দিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, এই তাঁর বক্তব্য। ব্ল্যাকমেলিং-এর বিষয়কে কোন গুরুত্বই তিনি দিতে চান না। রাজীব জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এবং তাঁরই মিলে সুপর্ণা কাজ করে, একথা অজ্ঞাতনামা কোন লোক নির্মলাকে ফোন করে নাকি জানিয়েছিল।

৭। যতীন ও লাল্লু—টেরিটি বাজারের দুজন বিখ্যাত গুণ্ডা। নিয়মিত ভাবে সুপর্ণা গাঙ্গুলীর পিছনে লেগেছিল। গায়ে হাত দেয় নি বা কোন কিছু কেড়ে নেয় নি। আদি রসের মিশ্রচার করা টিটকারি মেরেছে। রণেশ গাঙ্গুলী ওদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ওরা দুর্ঘটনার দিন ডায়মণ্ডহারবারে উপস্থিত ছিল।

৮। রাজীব মজুমদার—মৃত। নিজের স্ত্রীকে খুন করে জেলে গিয়েছিলেন।

নির্মলা দেবীর সঙ্গে প্রেম করতেন অথচ তাঁকে বিয়ে করেন নি। জেল থেকে বেরিয়ে প্রৌঢ় অবস্থায় নির্মলা দেবীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেন। জল ঘোলা করেছেন তিনি বেশি।

শৈবাল পড়া শেষ করে বাসবের দিকে তাকাল।

বাসব সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। ধরিয়ে নিয়ে বলল, পড়ে দেখলে তো, এই হল মেন ফিগার। আমার বিশ্বাস এদেরই মধ্যে কেউ একজন হত্যাকারী; কিন্তু সকলেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কি ভাবে মজুমদার খুন হয়েছেন বুঝতে পারা গেলে কেসটা অনেক সহজ হয়ে যেত।

এমনও তো হতে পারে, তিনি নিজেই নিজের আঙুলে সায়নাইড ইঞ্জেক্ট করেছিলেন।

অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ছেলেমানুষের মত কথা বলো না ডাক্তার! আত্মহত্যাই যদি করবেন, তবে নিজের বাড়িতে না করে স্বপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে করবেন কেন? দ্বিতীয়ত, তাঁর মত দায়িত্বশীল লোক চিঠি লিখে না রেখে কখনই আত্মহত্যা করবেন না। অত্যন্ত মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করে কেউ তাঁকে মেরেছে।

কিন্তু মোটিভ তো একটা থাকবে।

আছে বৈকি, আমরা ধরতে পারছি না। চার্টটা তুমি পড়লে, ওতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ল না?

মা ও মেয়েকে টেলিফোনে অজ্ঞাতনামা লোকের সংবাদ দেওয়া আমার অদ্ভুত লেগেছে।

এর কোন গূঢ় রহস্য নিশ্চয় আছে ডাক্তার। ধরে নিতে হবে, দুই-সংবাদদাতা একই ব্যক্তি। আমার মনে হয়, সে চেয়েছিল স্বপর্ণা রাজীবের মিলে চাকরি করুক; এবং সে জানত, নির্মলা রাজীবের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, কাজেই সংবাদটা দিয়ে নির্মলাকে রাজীবের বিরুদ্ধে চালিত করবার চেষ্টা করেছিল। তাই যদি হয় তবে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রাজীবের অনিষ্ট চেয়েছিল।

বেশ তোমার কথা মেনে নেওয়া গেল। তবে সে রাজীব মজুমদারের মিলে স্বপর্ণার চাকরি হোক, কেন চেয়েছিল?

তোমার এই কেন চেয়েছিলর উত্তরে একটা ধোঁয়াটে সন্দেহের কথা তোমায় বলতে পারি কিন্তু থাক; আরও একটু অনুসন্ধান করে নিয়ে বলব। এবার গুণ্ডা দুটোর কথায় আসা যাক, ওরা আমার মনে সবচেয়ে বেশি খটকা লাগিয়েছে। মেয়েদের পিছু লাগে কারা, পাড়ার বা বেপাড়ার বখাটে ছেলেরা। গুণ্ডাদের কাজ হল, দামী জিনিস কেড়েকুড়ে নেওয়া, কিম্বা সুবিধামত সুন্দরী মেয়ে পেলে তাকে লোপাট করে দেওয়া। তা নয়, টেরিটি বাজারের দুই

বিখ্যাত গুণ্ডা দিনের পর দিন সুপর্ণাকে দেখলে ইয়ার্কি মারছে, অথচ তার আর কোন ক্ষতি করছে না—ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না ডাক্তার, নিশ্চয় কোন মার-প্যাঁচ আছে।

কথাবার্তা আর এগুলো না। সোমা এসে তাড়া দিল, রাত যে বেড়ে চলেছে, দক্ষিণ হাতের কাজটা সেরে নিলে হত না?

ওরা উঠে খেতে চলল।

পরের দিন বেলা ন'টার সময় বাসব বাড়ি থেকে বেরুল।

প্রথমে গেল সুবীরের ফ্ল্যাটে।

সুবীর অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বাসবকে দেখে অত্যন্ত অবাক হল।

কোন ভূমিকা না করেই বাসব বলল, সুপর্ণা দেবীর ট্রায়েল স্টার্ট করে?

সামনের সপ্তাহ থেকে।

কেস তুললেই আপনি বেল-এর জন্যে অ্যাপ্লাই করে দেবেন। আমি বলে রেখে দেব, পুলিশপক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হবে না।

বেশ।

আরেকটা কথা, সুপর্ণা দেবীর যখন চাকরি হয়, তখন আর কতজন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল বলতে পারেন?

আমি কিভাবে বলব বলুন। হত্যাকারীর কোন সন্ধান পেলেন?

পাই নি; পাব। এখন চলি।

ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠল বাসব। নামল লালবাজারের মোড়ে। লালবাজারের মোড় থেকে টেরিটি বাজার আর কতটুকু, হেঁটেই এই পথ অতিক্রম করল। চিৎপুর আর রাধাবাজারের উল্টোদিকের কসিংয়ে বিরাট ইমারত গড়ে উঠেছে, এই ইমারতের নিচের অংশটা এখন নতুন টেরিটি বাজার।

আগে পুরনো বাজার নোংরা অলিগলিতে ছেয়েছিল। চীনেম্যান আর মুসলমানের আড্ডা সেখানে। চামড়ার ভেপসা গন্ধে বেশ কষ্টকর হত সেই জায়গায় যেতে। পুরনো ও নতুন দুই বাজার গায়ে গায়ে। বাসব চলেছে এনায়েত হোসেনের কাছে। এনায়েত আগে নামজাদা পকেটমার ছিল, পর পর কয়েকবার জেল খেটে তার চৈতন্য হয়েছে। পকেটমারার ব্যবসা এখন আর সে করে না, টেরিটি বাজারের নতুন অংশে মাংসের দোকান নিয়েছে। একবার একটা কেসের সূত্রে তার সঙ্গে বাসবের আলাপ হয়েছিল।

দোকানে ক্রেতার ভিড়। এনায়েত মাংস ওজন করছিল।

বাসবকে দেখে একমুখ হেসে বলল, আদাব। নিউমার্কেট ছেড়ে আমার

দোকান থেকে মাংস নিতে এলেন ?

বাসব বলল, মাংস কিনতে আসি নি, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে।

একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের ক্রেতাদের মাল দিয়ে সিমেন্টের বাঁধানো চাতালের ওপর থেকে নেমে এল।

বলুন ?

দুজন লোকের সন্ধান তোমায় দিতে হবে। এই অঞ্চলে যখন থাক, তারা তোমার কাছে অপরিচিত নাও হতে পারে।

কাদের কথা বলছেন ?

যতীন আর লাল্লুকে চেনো তুমি ?

এনায়েত হোসেন কোমরে হাত দিয়ে দীর্ঘসুরে হাসল।

আমি ভাবলাম, না জানি কার নাম করবেন। এ অঞ্চলের যে-কেউ ওদের চিনবে। তাছাড়া ওরা আমার বন্ধু লোক। লাল্লু একটু রগচটা। কাউকে খুন টুন করে বসে আছে নাকি ?

না—না। এবার যে একটা কাজ করতে হয় এনায়েত মিঞা, তোমার বন্ধু দুজন কাছাকাছি কোথাও থাকে বোধ হয় ? ওদের একবার ডেকে পাঠাও ? গোটা কয়েক প্রশ্ন করব।

এনায়েত একটু চিন্তা করে বলল, লাল্লুকে এখন পাওয়া যাবে না, কি কাজে যেন কাল বনগাঁ গেল। যতীন আছে, তাকে ডেকে দিচ্ছি। আপনি কোণের চায়ের দোকানে গিয়ে বসুন।

দোকানে একটা ছোকরা ছিল, তাকে সময়োচিত উপদেশ দিয়ে লুঙ্গি ঠিক করতে করতে এনায়েত বাজারের মধ্যে দিয়ে চলল। বাসব চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। এনায়েত হোসেনের দল ভদ্রসমাজের চোখে ঘৃণ্যজীব। বাসব জানে, এদের মত হৃদয় আবার ভদ্রসমাজে পাওয়া যায় না। এমন কোন হৃদ্যতা বা বাধ্যবাধকতা বাসবের সঙ্গে এনায়েতের নেই, তবু সে স্বচ্ছন্দে নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে যতীনকে ডাকতে ছুটল।

চায়ের কাপ শেষ হয়েছে সবে, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে এনায়েত এল। বলল, আমি দোকানে আছি, যাবার সময় দেখা করে যাবেন।

এনায়েত চলে যাবার পর যতীন বলল, আমায় ডাকলেন কেন ?

বাসব জানে ওর সম্পর্কে যতীনের কিছু অজানা নেই—এনায়েত বলেছে।

তুমি এনায়েতের মুখে শুনে থাকবে আমি পুলিশের লোক নই। খুনী, চোর এদের ধরা আমার পেশা। তবে পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। রাজীব মজুমদার খুন হয়েছেন শুনেছ ?

যতীনের গলা কেঁপে গেল।

কোন রাজীব মজুমদার ?

বোকা সাজবার চেষ্টা কোরো না যতীন, কতবড় বিপদ তোমাদের দুজনের জন্যে অপেক্ষা করছে জানো না, পুলিশ শিগগিরই তোমাদের গ্রেপ্তার করবে।

কেন, আমরা কি করেছি ?

কি করো নি! রাজীব মজুমদারের মনের-মানুষের পিছনে দিনের পর দিন লেগেছিলে! তিনি যখন খুন হন, তখন তোমরা দুজন ডায়মণ্ডহারবারে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলে। দু-চার মাস জেলখাটা তোমাদের গা-সওয়া জানি, এবার পুলিশের হাতে পড়লে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যাবে মনে রেখো।

যতীন একটু চুপ করে থেকে বলল, আমরা মেয়েটার পিছু নিয়েছিলাম অন্য কারণে, খুনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক যে নেই পুলিশকে বোঝাবে কি ভাবে, সুপর্ণা গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে। আমার কথা শোনো যতীন, আমি এই কেসটা হাতে নিয়েছি, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমার। তুমি যদি পরিষ্কার করে সমস্ত কথা বলো, তাহলে আমারও সুবিধা হয় আর তোমরাও পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাও।

এনায়েত আবার এসে উপস্থিত হল ; দোকানে মন বসছে না বোধহয়।

বল না রে শালা!—এনায়েত বলল, এ বাবুকে হাতে রাখলে অনেক কাজ হবে, বুঝলি ? যা জানিস, বলে ফেল।

ইতস্তত করে যতীন বলল, বিশ্বাস করুন, যে ভদ্রলোক খুন হয়েছে রাজীব মজুমদার না কি নাম বললেন, তাকে আমরা চিনতাম। আসলে ওই মেয়েটা …বুঝলেন না…ওই মেয়েটার জন্যেই…

থামলে কেন, বলো ?

ব্যাপারটা বাবু এমন ঘোরাল যে, আমরা এখনও কিছু বুঝতে পারি নি। এক ভদ্রলোক মাসে আটশো টাকার কড়ারে আমাদের ওই মেয়েটার পেছনে নিযুক্ত করেছিলেন।

একটু পরিষ্কার করে বলো।

আমি আর লাল্লু একদিন বাগবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, মোটর থামিয়ে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। আমাদের অপরিচিত হলেও ভদ্রলোক আমাদের পরিচয় বেশ ভালভাবেই রাখেন দেখলাম। তিনি সরাসরি আমাদের কাছে প্রস্তাব করলেন, আমরা যদি একটি মেয়েকে আর কিছু নয়, শুধু বিরক্ত করতে পারি—মাঝে মাঝে তাকে অনুসরণ করি, তাহলেই তিনি প্রতি মাসে আমাদের চারশো চারশো করে টাকা দেবেন।

তারপর ?

যতীন গুণ্ডা হলেও কথাবার্তায় বেশ চোস্ত। বলল, টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছিল বাবু, রাজি হয়ে গেলাম! পরের দিন বিকেলবেলা ভদ্রলোক দেশবন্ধু পার্কের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমরা তাকে বিরক্ত করেছি, ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলাম ওই কারণে। বুড়ো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটাকে। পরের দিন কাগজে ছবি দেখে চিনতে পারলাম, ওই বুড়ো রাজীব মজুমদার খুন হয়েছে।

বাসব এনায়েত আর যতীনকে দুটো সিগারেট দিল। নিজে একটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, যে তোমাদের কাজে নামিয়েছিল, তার চেহারা কেমন?

মাঝ বয়সী লোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ধার্মিক মুসলমানদের মত মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ।

গাড়ির নম্বর মনে আছে?

না বাবু। তবে পরিষ্কার মনে আছে, নম্বর লেখা প্লেটটা টিনের নয় পিজবোর্ডের।

গাড়ির রঙ কি রকম?

কালো কি গাঢ় নীল এই রকম কিছু হবে।

ঠিক কত দিন আগে তোমাদের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল?

ধরুন মাস দুয়েক হবে।

এবার একটু ভেবে বলো তো, ডায়মণ্ডহারবারে তুমি কি দেখেছিলে?

ভাববার কিছু নেই বাবু, সব পরিষ্কার মনে আছে। সকালের শো দেখব বলে আমি আর লাল্টু থামায় লাইন দিয়েছিলাম। হঠাৎ নজর পড়ল, রাস্তার অপর পারে পেট্রোল স্টেশনে বুড়ো গাড়ি থেকে নামল। আরেক দিন আমরা ওকে মেয়েটার সঙ্গে দেখেছিলাম। লাল্টু বলল, ছুঁড়িটা রয়েছে গাড়িতে। চল, দেখা যাক। রাস্তার এপারে আসতেই শুনলাম, বুড়ো তেলের দাম দিতে দিতে বলছে, এক গ্যালনেই ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসা যাবে। আমাদের কি খেয়াল হল, আমরাও শিয়ালদা ছুটলাম। ট্রেন পাওয়া গেল একটা। বুড়ো যে ছুঁড়িটাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে মৌজ করতে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম।

ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় এসো।

এই যে আসি! ওখানে গিয়ে দেখি, ঝোপের আড়ালে বসে ওরা খাওয়া-দাওয়া লাগিয়েছে। এদিকে একজন ইসারা করে ডাকছে ছুঁড়িটাকে। উঠে এল। জলের ধারে বসে গল্প হল দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ। ওই সময় ওরা আমাদের দেখে ফেলল।

মেয়েটা উঠে যাবার পর বুড়ো কি করছিল দেখেছিলে?

না। দূর থেকে শুধু বাজনার আওয়াজ পাচ্ছিলাম; রেডিও বাজছিল

বোধহয়।

মেয়েটা উঠে যাবার পর, বুড়োর কাছে কেউ এসেছিল ?

কেউ না।

কেউ আসে নি, তুমি বুঝলে কিভাবে ?

আমরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, যেখান থেকে ছুঁড়ি আর তার নতুন নাগরকেও দেখা যাচ্ছিল, আবার বুড়ো যেখানে ছিল সেই ঝোপও দেখা যাচ্ছিল—বুড়োর কাছে কেউ এলে আমাদের চোখে পড়তো।

ধন্যবাদ যতীন! তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করলে। পুলিশ যাতে তোমাদের পিছু না লাগে, সে চেষ্টা আমি করব। এনায়েত মিঞা এবার আমি চললাম।

আসল ব্যাপারটা কি, তা তো বললেন না বাবু ?

আরেক দিন এসে সব কথা বলব। চলি।

চায়ের দাম দিয়ে বাসব স্থান ত্যাগ করল।

দিন কয়েক কেটে গেছে আরও। ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে স্পট দেখে এসেছে বাসব, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে নি। তন্ন তন্ন করে খুঁজে এমন কিছু দেখতে পায় নি, যা দিয়ে হত্যাকারীকে বেকায়দায় ফেলা যায়।

আজ দুপুরে গেল কোন্নগরের মিলে। রাজেশের সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে রেখেছিল। রাজীবের অফিস ঘরখানা একবার দেখতে হবে। রাজেশ নিজে তাকে সে-ঘরে নিয়ে গেল, বাসব খুঁটিয়ে দেখল ঘরখানা। কিন্তু সেখানেও সাহায্যযোগ্য কোন কিছু পাওয়া গেল না।

দেবেনবাবু মিলে ছিলেন, এলেন না বাসবের কাছে।

রাজেশ বলল, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে মিস্টার ব্যানার্জী কোন মেয়েমানুষের পক্ষে বাবার মত জাঁদরেল লোককে খুন করা সম্ভব নয়।

আমি তো সে কথা আপনাকে আগেই বলেছিলাম। দু-একটা সূত্র আমার হাতে এসেছে, আশা করছি হত্যাকারীকে ধরতে পারব।

হত্যাকারী ধরা পড়লে আমাদের তরফ থেকে একটা বিগ-প্রাইজ আপনাকে দেওয়া স্থির করেছি।

এই সময় হেড অফিস থেকে ফোন এল, রাজেশকে এখুনি যেতে হবে।

আমাকে যেতে হচ্ছে মিস্টার ব্যানার্জী! আপনি—

আমার কোন অসুবিধা হবে না, আপনাদের ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে যাব।

রাজেশ চলে যাবার পর বাসব ওয়ার্কস ম্যানেজার কল্যাণ সেনের কাছে গেল। কল্যাণ সেনের বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে। বুদ্ধিমান লোক, মুখ-চোখ

দেখে বোঝা যায়। বাসবের পরিচয় এবং আগমন সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন।

আপনাকে একটু কষ্ট দেব মিস্টার সেন, গোটা কয়েক ইনফরমেশন নেবার ছিল?

বেশ তো; আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।

চা এল। কিছুক্ষণ আগে রাজেশের সঙ্গে এক প্রস্থ চা হয়েছিল।

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে বাসব বলল, সুবীর ব্যানার্জী ছেলেটি কেমন?

কাজ-কর্মে সুনাম আছে, স্বভাব-চরিত্রের কথা বলতে পারব না। গতকাল ও তো রেজিগনেশন দিয়েছে।

তাই নাকি!

অন্য ফার্মে চলে যাচ্ছে। মাইনে সেখানে বেশি।

মিস্টার সেন, মিস গাঙ্গুলী এখানে কতদিন ধরে কাজ করছিলেন?

বছর খানেক হবে।

অনেক উমেদারের মধ্যে থেকে ওঁকে নেওয়া হয়েছিল বোধহয়?

জন চল্লিশ অ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল। ওঁকে নেওয়া হয়েছিল বটে, তবে উনি যে খুব এক্সপার্ট হ্যাণ্ড, তা আমার মনে হয়নি; স্পিড মোটেই উচ্চমানের নয়।

আরও মিনিট দশেক কল্যাণ সেনের সঙ্গে কথা বলে ওখান থেকে বাসব বিদায় নিল।

বাসব বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে শৈবাল বাড়ি ফিরল।

তোমার অপেক্ষায় বসে আছি ডাক্তার, তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে এসো।

শৈবাল অফিসের কাপড় বদলে এল।

তোমাকে এখন বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে!

কাজ বেশ এগিয়েছে। কেসটা সম্বন্ধে কয়েক দিনের মধ্যে তোমাকে কিছু বলা হয়নি। গুণ্ডা যতীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে যা বললে, আমি তাতে প্রচুর আলোর সন্ধান পেয়েছি।

বাসব যতীনের বলা গল্প বলল।

এতে তুমি আলোর সন্ধান কোথায় পেলে? বরং আরো জটিল হয়ে উঠল বলা চলে।

কিছুটা জটিল যে হয়ে পড়ে নি, অস্বীকার করি না। আলোর সন্ধান পেয়েছি, যতীনদের যে নিযুক্ত করেছিল তার গাড়ির নম্বর প্লেটে!

সোমা এল। বাহাদুরের হাতের ট্রেতে ওদের জলখাবার।

নম্বর তো যতীন দেখেনি।

নম্বরের কথা তো বলছি না, বলছি নম্বর প্লেটের কথা। যতীন বলেছিল, প্লেটটা টিনের নয়—পিজবোর্ডের। পিজবোর্ডের প্লেট গাড়িতে কখন লাগানো থাকে ডাক্তার?

সোমা বলল, কথা বলতে বলতে তোমরা খেতে ভুলে যেও না যেন।

বাসব বলল, খাবারের সৎকার আগে করে নেওয়া যাক। আমার প্রশ্নের উত্তর দিও তারপর।

জলখাবার পর্ব সাঙ্গ হল।

শৈবাল বলল, নতুন গাড়ি কেনার পর নম্বর প্লেটে না লেখানো পর্যন্ত অনেকে পিজবোর্ড বা ওই জাতীয় কিছুর ওপর নম্বর লিখে গাড়ি চালিয়ে থাকেন।

টো টো কারেক্ট। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, মাস দুই আড়াই আগে ওই গাড়িখানা সেই রহস্যময় ব্যক্তি নতুন কিনেছিল। লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মত কলকাতায় হাজার খানেক মোটর-ডিলার নেই, আছে গুটি কয়েকমাত্র। সেই গুটি কয়েকের কাছে আমি একে একে যদি যাই, এবং দু থেকে আড়াই মাস আগে যারা গাড়ি কিনেছে, তাদের নামের লিস্ট যদি চেয়ে নি।

সে তো অনেক নাম হবে।

স্বাভাবিক। সেই নামের অরণ্য থেকে যদি কোন পরিচিত নাম বেরিয়ে পড়ে, তাহলে সমস্ত বিষয়টা সহজ হয়ে আসবে।

যতীনদের যে নিযুক্ত করেছিল, তার চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হয় ছদ্মবেশ। তোমার কি মত?

ছদ্মবেশ বৈকি!

শৈবাল বলল, আহত না করে রাজীব মজুমদারকে কিভাবে আঙুলে বিষ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল, এ বিষয়ে কিছু ভেবেছ?

ক্রমাগত ভাবছি, সবচেয়ে বড় মারপ্যাঁচ ওখানে। খুব সহজ কোন পন্থার মাধ্যমেই ব্যাপারটা ঘটেছে, আমরা ধরতে পারছি না। তারপর আরেকটা কথা, সুপর্ণা এসে দেখেছে ট্রানজিস্টার বাজছে—যতীনরাও দূর থেকে বাজনার আওয়াজ পেয়েছে। তার অর্থ হল, মজুমদার মোটেই কোন ভীতিপ্রদ ঘটনার মুখোমুখি হয়নি। সুপর্ণা চলে যাবার পর বেশ আয়েস করে ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছিলেন, মৃত্যু হঠাৎ এসে পড়েছে। হঠাৎ কিভাবে সে এল প্রধান প্রশ্ন হল এটা।

আমার মনে হয়, মজুমদার ট্রানজিস্টারের বোতাম ঘুরিয়ে সবে বাজাতে আরম্ভ করেছেন, আর হত্যাকারী এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর ··

বাসব বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত কোচ থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাসল গলা ফাটিয়ে। হাসি থামলে বলল, উঃ, আমি কোথায় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম ডাক্তার, অথচ চোখের পাশে নাক ঠিক রয়েছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,

তোমার একটা কথায় সমস্ত অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেল।

শৈবাল অবাক হয়ে বলল, কথাটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে ···

এখুনি আসছি। স্যাঙ্গুইন হয়ে নিতে দাও, তারপর তোমাকে সব বলব। মিস্টার সামন্তকে বোধহয় এখন তাঁর অফিসেই পাওয়া যাবে।—বাসব দ্রুত অদৃশ্য হল।

বাসব ফিরল আধঘণ্টা পরে। হাতে একটা ট্রানজিস্টার। শৈবালের সামনে দিয়ে ও ঢুকল নিজের ল্যাবরেটরি ঘরে।

আধ-ঘণ্টাটাক আরো কাটল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাসব; মুখে হাসির ঝিলিক। ট্রানজিস্টারটা হাতে নিয়ে এসে বসল।

শৈবাল ওর কাণ্ডকারখানায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, সব কিছু খুলে বলবে কি এবার?

রহস্যের ওপরকার যবনিকা উঠতে বোধহয় আর দেরি নেই ডাক্তার। তোমার একটা কথা আমাকে এমনভাবে সচেতন করে তুলল, যার দাম লাখ টাকার বেশি।

আহা, কথাটা কি তাই বলো না। আমার তো তাই মনে পড়ছে না কি এমন বললাম, যার দাম লাখ টাকার বেশি।

তুমি বললে না, আমার মনে হয় মজুমদার ট্রানজিস্টারের বোতাম ঘুরিয়ে সবে···ইত্যাদি। ওই বোতাম ঘুরিয়ে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের বন্ধ দরজা খুলে গেল। আমরা আগেই স্থির করে ফেলেছি, এবং খুব স্বাভাবিক মজুমদার নিজের আঙুল বাড়িয়ে দেন নি হত্যাকারীর দিকে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবার জন্যে। এমন কি হতে পারে না, ট্রানজিস্টারের বোতামে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙুলে বিষ পাংচার হয়েছে!

ট্রানজিস্টারটা সামন্তর কাছ থেকে নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। বোতাম নয় পুসার লাগানো আছে, মাঝের আঙুল দিয়ে পুসারে চাপ দিতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন।

তাই যদি হবে, তবে পুলিশ এসে যখন ট্রানজিস্টার বন্ধ করল, তখন কেউ মরল না কেন?

সাবাস ডাক্তার! ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন করেছ, হত্যাকারীও নিশ্চয় সে কথা ভেবেছিল। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে প্রশংসা করতে হয়। এমন সিস্টেম করেছে যে, বাজনা বন্ধ করার সময় কারুর ক্ষতি হবে না। তুমি এখনও বোধহয় বুঝতে পারছ না? আগে ট্রানজিস্টারটা ভাল করে দেখে নাও, বুঝিয়ে বলছি তারপর।

শৈবাল ভাল করে দামি যন্ত্রটা দেখল।

দুটো পুস, আর একটা নব আছে। পুস দুটো হল টোন আর এরিয়ালের। নবটা স্টেশন অ্যাডজাস্ট করবার জন্যে।

বাসব বলল, এরিয়ালের পুসটা ভাল করে দেখো, ছুঁচের অতি সূক্ষ্ম আগা দেখতে পাচ্ছো? হত্যাকারী বুদ্ধির খেল দেখিয়েছে এখানেই! টোনের পুসে ছুঁচ লাগায় নি। কাজেই পুলিশের লোক যখন ট্রানজিস্টার বন্ধ করেছে, তখন কেউ মারা যায় নি। জলের মত সোজা হয়ে গেছে ঘটনা। সুপর্ণা সুবীরের সঙ্গে চলে যাবার পর রাজীব মজুমদার ট্রানজিস্টার বাজাবার মনস্থ করেন। উনি টোনের পুসারে চাপ দেন; যন্ত্র বেজে ওঠে। লোকাল স্টেশনের জন্যে এরিয়াল দরকার হয় না। তবে শব্দকে উচ্চগ্রামে তুলতে গেলে এরিয়ালের দরকার হবে। মজুমদার বোধহয় খুব উচ্চগ্রামে বাজনা শুনতে চেয়েছিলেন। এরিয়ালের পুসে আঙুল দিয়ে যেই চাপ দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচ তার কাজ করেছে। পৃথিবীর হিসেব চুকিয়ে সেই মুহূর্তে মজুমদার বিদায় নিয়েছেন।

জিনিসটা একই রকম দাঁড়াচ্ছে বাসব, স্টেশন পুলিশের লোক বন্ধ করবার পর, এরিয়ালটাও পুসারের সাহায্যে ফোল্ড করে নিয়েছিল। এখনও ফোল্ড করা অবস্থাতেই দেখা যাচ্ছে, তবে আর কেউ মরল না কেন?

মরল না কারণ পুলিশের লোকের এরিয়াল ফোল্ড করার দরকার পড়ে নি। মজুমদার এরিয়ালের পুসে চাপ দিয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু এরিয়াল বেরোয় নি। পরীক্ষা করে দেখলাম, এরিয়াল যাতে বেরিয়ে না আসে, হত্যাকারী সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

শৈবাল বলল, দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখে নি। ছুঁচটা ফাঁপা নিশ্চয়? চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মত কাজ করেছে। আরেকটা প্রশ্ন আমার রয়েছে।

বলো?

ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে মজুমদার যে ট্রানজিস্টার বাজাবেনই, এ সম্পর্কে হত্যাকারী নিশ্চিত হল কি করে?

সে ট্রানজিস্টারে কারচুপি করে রেখেছিল। ট্রানজিস্টারটা মজুমদারের—তিনি কখনো না-কখনো বাজাবেন। হত্যাকারী কারচুপি করে রাখার পর মজুমদার প্রথম বাজাতে গিয়েছিলেন ডায়মণ্ডহারবারে, কাজেই ওখানে মারা গেলেন। ডায়মণ্ডহারবারের ওপর হত্যাকারীর কোন দুর্বলতা ছিল না।

সোমা এল।—রাত হয়েছে, খেতে চলো তোমরা।

বাসব হেসে বলল, তুমি ভাগ্যবান ডাক্তার! এরকম সর্বগুণসম্পন্না এবং ঘড়ির কাঁটার মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্য ছাড়া কি!

সোমা ঈষৎ শব্দ তুলে হাসল। শৈবাল বলল, তোমারও ভাগ্যবান হতে বাধা নেই—বিয়েটা করেই ফেলো না!

দল ভারি করবার জন্যে অমনি উঠে পড়ে লাগলে!

সুপর্ণা বেলে খালাস পেয়েছে।

বাসবের কথায় পুলিশ কোন আপত্তি তোলে নি। সুপর্ণা সবিশেষ বিরক্ত ও দুঃখিত হয়েছে নিজের মা-বাপের ওপর। দুঃসময়ে নির্মলা ও রণেশ বিন্দুমাত্র সাহায্য ওকে করল না। বেলে খালাস পাবার পর পুলিশকে সুপর্ণা জানালো, ও নিজের বাড়ি যেতে চায় না। কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিক।

নির্মলা মেয়ের কথা শুনে অবাক হল। সেকি, তুমি বাড়ি যাবে না কেন?

কেন যাব? আমার ওপর এতটুকু ভালবাসা তোমাদের আছে? ফাঁসির দড়ির দিকেই তো এগিয়ে দিয়েছ, আবার দরদ দেখাচ্ছো কেন এখন?

আমরা তোমার বিরুদ্ধে পুলিশকে কিছু বলেছি?

না বলেও অনেক ক্ষতি করা যায় মা। আমাকে বাঁচাবার তো কোন চেষ্টা করো নি! সুবীরের ফ্লাটে গিয়েই উঠতাম, বিয়ের আগে তা উচিত হবে না বলে যাচ্ছি না।

পুলিশ বেশ ফাঁপরে পড়ল—সুপর্ণাকে কোথায় রাখবে তারা!

সমস্যার সমাধান করে দিল সুবীর। বাসবকে অনুরোধ করল ওকে বাড়িতে থাকতে দিতে। বাসব আপত্তি করল না। সোমা যখন রয়েছে, তখন সুপর্ণার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

এদিকে—

কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। বাসব সামন্তকে বলেছিল, সংশ্লিষ্ট সকলের এক-একখানা করে ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে দিতে। তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মোটর ডিলারদের কাছে ঘুরে এসেছে বাসব।

তারপর সামন্তকে গিয়ে বলেছে, আপনাকে আরেকটু কষ্ট দেব মিস্টার সামন্ত। কলকাতার রেডিও-ডিলারদের একটা লিস্ট আমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

আপনি তো আমায় অবাক করলেন মশাই!

কেন?

কখনো মোটর-ডিলারদের লিস্ট চাইছেন, আবার কখনো চাইছেন রেডিও-

ডিলারদের লিস্ট। কি সমস্ত কাণ্ড আরম্ভ করেছেন ?

শেষ পর্যন্ত দেখবেন ডিলারদের মধ্যে একজন হত্যাকারীর সন্ধান আমাকে দিয়েছে।

দিন দুয়েকের মধ্যে রেডিও- ডিলারদের লিস্ট বাসবকে সংগ্রহ করে দিলেন সামন্ত। বলতে কি দিন তিনেক শৈবাল বাসবের টিকি দেখতে পেল না। এ-দোকান সে-দোকান করে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হাজরা রোডের 'ইউনিক টিউন' রেডিও এবং ক্যামেরার দোকানে পৌঁছে ওর পরিশ্রম সার্থক হল।

সুসজ্জিত মাঝারি গড়নের দোকান। কাউন্টারে একটি সুবেশ যুবক দাঁড়িয়েছিল। বাসব এগিয়ে গিয়ে বলল, দেখুন তো, এই ট্রানজিস্টারটা আপনারা বিক্রি করেছিলেন ?

বাসবের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যুবকটি বলল, প্রচুর ট্রানজিস্টার আমরা বিক্রি করেছি। এর নম্বর একটু মিলিয়ে দেখতে হবে।

মোটা বাঁধানো খাতা বার করে নম্বর মিলিয়ে দেখল। হ্যাঁ ..আরে নম্বর মিলিয়ে দেখবার দরকারই ছিল না। এটা যে আমাদের দোকানের দেখেই বোঝা উচিৎ ছিল। আর কিছু করতে হবে নাকি ?

বাসব সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, দোকানের মালিক কোথায় ?

আমার দোকান।

আমি একটা মার্ডার কেসের তদন্তে আপনার কাছে এসেছি।

দোকানদার বেশ ঘাবড়ে গেল। মার্ডার কেসের তদন্তে আমার কাছে ?

আপনার ভয় পাবার কিছু নেই, আমি পুলিশের লোক নই। আমার নাম বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়, শুনে থাকবেন। গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে আমি করব। উত্তর দেন, ভালই ; নইলে পুলিশের সাহায্য আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দোকানে পুলিশ চড়াও হলে আপনার রেপুটেশন ড্যাম্পার্ড করবে স্মরণ রাখবেন।

কি জানতে চান বলুন ?

এরিয়ালের পুসারে একটা সূক্ষ্ম গর্ত রয়েছে, ও বিষয়ে কিছু জানেন ?

ওটা আমরাই করে দিয়েছিলাম।

কেন ?

রেডিওটা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন এক বুড়ো ভদ্রলোক। ধনী বলে মনে হয়। কিছুদিন পরে আরেকজন এটা আমার কাছে নিয়ে আসে। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, বুড়ো ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। আমাকে এরিয়ালের সার্টারের ওপর একটা ছেঁদা করে দিতে বলেছিল। আমি করে দিয়েছিলাম।

সেই লোকের চেহারাটা কেমন ?

মন্দ নয়, তবে পরনের জামা-কাপড় অতি সাধারণ।

দেখলে তাকে চিনতে পারবেন ?

কেন পারব না ?

বাসব পকেট থেকে কতকগুলো ফটোগ্রাফ বার করল।

দেখুন তো, এর মধ্যে সে আছে ?

দোকানদার ফটোগ্রাফগুলো দেখতে দেখতে একটা তুলে ধরে বলল, এই লোক।

বাসব ফটোগুলো আবার পকেটে রাখল।

আপনাকে সার্টারের ওপর ছেঁদা করে দিতে বলায় আপনি তাকে কোন প্রশ্ন করেন নি ?

করেছিলাম। কি সমস্ত করবে যেন বললে—সে-সমস্ত ঘোরাল কথা আমি বুঝতে পারি নি। আমার মাথা ব্যথার দরকারটা কি ? কাজ করে টাকা পাব, হয়ে গেল।

ছেঁদা করা ছাড়া আর কিছু বলেছিল !

স্প্রিং খুলে দিতে বলেছিল, যাতে সার্টার টেপবার পরও এরিয়াল বেরিয়ে না পড়ে।

ধন্যবাদ। অনেক সাহায্য করলেন আমাকে। আচ্ছা আপনি থাকেন কোথায় ?

দোকানের পিছনে ঘর আছে। ব্যাচেলার লোক। থাকতে অসুবিধা হয় না।

আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

মনোজ ঘোষ।

আর আপনার ব্যবসার ক্ষতি করব না, চললাম।

মনোজ ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, যা জানি বললাম। দেখবেন মশাই, পুলিশ আমাকে নিয়ে আবার যেন টানাটানি না করে।

ভয় নেই। তবে প্রয়োজন পড়লে পুলিশের সামনে আপনাকে এই সমস্ত বলতে হবে, নইলে বিপদে পড়ে যাবেন।

বাসব 'ইউনিক টিউন' থেকে বেরিয়ে পড়ল।

হোমিসাইড স্কোয়াডের মিস্টার সামন্ত নিজের বাড়িতে ক্রমাগত ভেতর-বাইরে করছেন। আর দশ-পনেরো মিনিট পরে সকলে এসে পড়বেন। বাসবের অনুরোধেই সকলকে ডেকেছেন সন্ধ্যের পর এখানে।

আবার আমার বাড়িতে কেন ? তিনি প্রতিবাদ তুলেছিলেন।

আপনার বাড়ি হল উপযুক্ত স্থান ; পক্ষপাতহীন কেন্দ্র। সুপর্ণা দেবী যে খুন করেননি, প্রমাণ করে দেব সেই সময়। তবে হত্যাকারীর নাম তখন বলা যাবে না।

কেন ?

বাসব মুচকি হেসে বলল, আমি তো আপনার মত সরকারি লোক নই, বেসরকারি গোয়েন্দা। আমাদের কাজ একটু ঢিলে-ঢালা ধরনের।

সামন্ত বিরক্ত হল ; কিছু বলল না।

বাসবের কাণ্ড-কারখানা সব সময় বুঝে ওঠা কষ্টকর।

প্রথমে সুবীর এল। নির্মলা ও রণেশ এল তারপর ; প্রায় একই সঙ্গে দেবেনবাবু এলেন রাজেশকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে লালু আর যতীন এল ; পুলিশের বাড়িতে আহ্বান তাদের বিশেষ মনঃপুত হয়নি। সব শেষে এল সুপর্ণা ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাসব।

সকলে এক একটি চেয়ার অধিকার করেছেন, শুধু যতীন আর লালু দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কেষ্ট-বিষ্টুদের মাঝে ওরা নিজেদের অত্যন্ত নগণ্য মনে করছে।

বাসব বলল, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন ?

আজ্ঞে—

বস—বস—

লালু আর যতীন সঙ্কুচিতভাবে বসল।

বাসব বলল, আপনারা অনেকেই আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারছি। কিছু সময় আপনাদের নিশ্চয় নষ্ট করেছি, ক্ষমা করবেন। কাজের কথা আরম্ভ করা যাক এবার। আপনারা জানেন, সুপর্ণা দেবীকে নির্দোষ প্রমাণিত করবার জন্যে, আমি এ কেস হাতে নিয়েছি। সেই কাজ করতে গেলে আরেকটি কাজ আমাকে করতে হবে, নইলে তিনি কখনই নির্দোষ প্রমাণিত হবেন না—তা হল, হত্যাকারীকে ধরা। আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন, সেই দুরূহ কাজে আমি সাফল্য লাভ করতে চলেছি। আপাতঃ দৃষ্টিতে রাজীব মজুমদারের খুনের ঘটনাকে যত হালকা চোখে দেখা যাক না, প্রকৃত ঘটনা তা নয় ; অনেক জটিল। কিছুক্ষণ সময় আপনারা আমায় দিন, সেই জটিল কাহিনী আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করি।

বাসব কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সিগারেট ধরাল।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ডান হাতের মাঝের আঙুলে পাংচার করে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল মিস্টার মজুমদারকে। এ-কথা সহজেই মেনে নেওয়া যায়, তিনি নিশ্চয় হত্যাকারীর দিকে আঙুল পেতে দেন

নি নিজের মৃত্যু ডেকে আনবার জন্যে। তবে তিনি কিভাবে মারা গিয়েছিলেন? অনেক মাথা ঘামিয়ে আমি আসল সত্যের সন্ধান পেয়েছি। হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর; নিজের পরিকল্পনাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখবার জন্যে চমৎকার চাল চেলেছিল। ট্রানজিস্টারের সার্টারে বিষযুক্ত ছুঁচ এমনভাবে যুক্ত করে রেখেছিল, যাতে আঙুলের চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সিরিঞ্জের কাজ করবে। মিস্টার মজুমদার এরিয়ালের সার্টারে চাপ দিতে গিয়েই মারা গেলেন। এই তো গেল, তিনি কিভাবে মারা গেলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তিনি মারা গেলেন কেন? অর্থাৎ হত্যার মটিভ কি! আমি সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি, মটিভ আমি বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি বলেই হত্যাকারীকে চোখের ওপর পেতে আমার বিলম্ব হচ্ছে।

বাসব থামল। সকলেই একাগ্রভাবে ওর কথা শুনছে।

ও আরম্ভ করল আবার, মটিভ বুঝতে না পারলেও হত্যাকারীর মনোভাবের কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি। যতীন ও লাল্লু টেংরি বাজারের বিখ্যাত গুণ্ডা। তারা মিস গাঙ্গুলীর পিছনে লেগেছিল; তাঁকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু আর কোন ক্ষতি তাঁর করে নি।

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, একজন লোক মোটা টাকা দিয়ে ওদের মিস গাঙ্গুলীর পিছনে লাগিয়েছিল। ইন্সট্রাক্সন দিয়ে রেখেছিল, বিরক্ত ছাড়া আর কিছু যেন না করা হয়। আর আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে, মিস গাঙ্গুলী যখন চাকরি খুঁজছিলেন, সেই সময় উপযাচক হয়ে একজন অজ্ঞাতনামা লোক তাঁকে ফোন করে চাকরির সন্ধান দিয়েছিল। আবার বোধহয় সেই অজ্ঞাতনামা লোক নির্মলা দেবীকে জানিয়েছিল, মিস গাঙ্গুলী যেখানে কাজ করছেন, সেই ফার্ম হল অনেক দিনের শত্রু রাজীব মজুমদারের।

আমি গভীরভাবে চিন্তা করবার পর হত্যাকারীর প্রকৃত মনোভাব বুঝতে পেরেছি। অনেক দিন থেকে জটিল রহস্য ঘেঁটে ঘেঁটে মনের গঠন এমন হয়ে গেছে, যাতে সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারি অনেক কিছু।

ফোন করে চাকরির সংবাদ দিয়ে হত্যাকারী সুপর্ণা দেবীকে রাজীব মজুমদারের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর নির্মলা দেবীকে সে-কথা ফোনে জানিয়ে তাঁকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছিল, এবং সুপর্ণা দেবীর পিছনে যতীন আর লাল্লুকে লাগিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তোলা হয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য হল, মজুমদারের হত্যাকাণ্ডকে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া। পুলিশ স্বাভাবিকভাবে ডাইভার্টেড হবে।

মজুমদার সুপর্ণা দেবীর প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছিলেন। আবার আগে থেকেই সুপর্ণা দেবী ও সুবীরবাবু দুজনে দুজনের প্রতি ইন্টারেস্টেড। তারপর গুণ্ডাচক্র এবং নির্মলা দেবীর নতুন করে রাজীব মজুমদারের বিরুদ্ধে

অভিযান চালানো—এতগুলি ঘটনার সমাবেশে পুলিশ বিপথগামী হতে বাধ্য; হত্যাকারীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই। নিজে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে, পুলিশকে অন্য পরিবেশে চালান করে দিয়ে সম্ভবত মজা উপভোগ করেছে।

তবে সেই ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যা নয়। হাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেও সাকসেশফুল ক্রাইম হয় না। কোথাও না কোথাও খোঁচ থেকে যায়। প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির চোখে সে-খোঁচ কখনই এড়িয়ে যাবে না।

এক্ষেত্রেও সেই প্রবাদ-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ভুটো বড় গোছের খোঁচ আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তার মধ্যেকার একটা আপনারা শুনে রাখুন। আমি আগেই বলেছি, ট্রানজিস্টারের সার্টারে গর্ত করে ছুঁচ আটকে রাখা হয়েছিল। সার্টারে সূক্ষ্ম গর্ত করা সহজসাধ্য নয়। কোন দোকানের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল নিশ্চয়। আমি রেডিওর দোকানগুলোতে অনুসন্ধান আরম্ভ করলাম। ভেবে দেখুন, এই বিরাট শহরে অসংখ্য রেডিওর দোকান আছে। তার মধ্যে থেকে আমার যে দোকানের প্রয়োজন, তা খুঁজে পাওয়া কত শক্ত; তবু আমি খুঁজে পেলাম। হত্যাকারীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে, বিশেষ পরিশ্রম না করেই পেলাম। দোকানের নাম 'ইউনিক টিউন', দোকানের মালিকের নাম মনোজ ঘোষ। আমি যখন ইউনিক-টিউনে পৌঁছলাম, তখন মনোজ ঘোষ দোকানে ছিল না। আমার হাতের ট্রানজিস্টার পরীক্ষা করে বলল, সার্টারের ওপরকার ফুটো এখানেই করা হয়েছে। যে লোক ফুটো করাতে নিয়ে এসেছিল, তার বিষয়ে সে কিছু জানে না। তবে দোকানদার মনোজ ঘোষ সব কিছু জানে; আমি কাল সকালে পুলিশ নিয়ে 'ইউনিক-টিউনে' যাব। মনোজ ঘোষ হত্যাকারীর নাম বলতে বাধ্য হবে।

একনাগাড়ে এতক্ষণ কথা বলার পর বাসব থামল।

ঘরে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

মিনিট তিনেক এই ভাবে কাটল বোধহয়। নির্মলা বলল, আপনার বক্তব্য বোধহয় শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমার ধারণা ছিল, আপনি হত্যাকারীকে ধরে ফেলেছেন। আমাদের সামনে তার নাম প্রকাশ করে দেবেন···এবার আমি যেতে পারি কি?

সকলেই যেতে পারেন। কাল সকালেই হত্যাকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। ডাক্তার, তুমি সুপর্ণা দেবীকে বাড়ি নিয়ে যাও। আমি মিঃ সামন্তর সঙ্গে একটু পরামর্শ সেরে যাচ্ছি।

কেউ কোন কথা না বলে একে একে বিদায় নিলেন।

রোজকার মত 'ইউনিক টিউন' বন্ধ হয়েছে সাড়ে আটটার সময়। দোকানের দরজা ভেজিয়ে মনোজ ঘোষ একটা এনলার্জমেণ্টে রিটাচ দিচ্ছিল। একাস্তে ঘণ্টা দেড়েক ধরেও কাজ করছে।

ধীরে ধীরে ফাঁক হচ্ছে দরজা। মনোজের খেয়াল নেই। কাজে তন্ময়। দরজা বেশ কিছুটা ফাঁক হবার পর একজন ঘরে প্রবেশ করল। বন্ধ করে দিল দরজা আবার। আগন্তুকের গায়ে গাঢ় ছাই রঙের ওভারকোট। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। ওভারকোটের কলার ও নিচু ফেল্ট হ্যাটের অন্ধকারে আগন্তুকের মুখ ডুবে রয়েছে।

পায়ের শব্দে চমকে উঠল মনোজ। মুখ তুলে বলল, কে?

আগন্তুক কাউণ্টারের কাছে চলে এসেছে।—আমি—।

তুমি! আমি চমকে উঠেছিলাম। তুমি এ-সময় এলে যে?

আগন্তুক কাউণ্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।—তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এলাম।

বোঝাপড়া!

হ্যাঁ তোমার দোকানে পুলিশের লোক এসেছিল। তোমার কর্মচারি অনেক কথাই ফাঁস করে ফেলেছে। আমাকে চিনত না, তাই আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে নি। কাল সকালে তোমার কাছে পুলিশ আসবে? ট্রানজিস্টারের সার্টারে ছোট্ট একটা ফুটো করে দেওয়ার বিনিময়ে তুমি আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছ, তা সত্ত্বেও পুলিশের কাছে আমার নাম প্রকাশ করে দিতে তোমার দ্বিধা হবে না জানি।

কি সমস্ত বলছ? আমার কর্মচারি—! এক সপ্তাহ হল আমার দোকানে কোন কর্মচারি নেই। ঝগড়া করে ভেগেছে। বিখ্যাত গোয়েন্দা বাসব বন্দোপাধ্যায় আমার কাছে এসেছিল। কথাবার্তা যা হয়েছে, আমার সঙ্গে হয়েছে! সার্টারে ফুটো করে দেওয়ার কথা আমায় স্বীকার করতে হল। ছবি দেখিয়ে আমায় যখন চিনিয়ে দিতে বলল, তখন আমি অন্যের ছবি দেখিয়ে দিয়েছি।

আমাকে ব্লাফ দেওয়া হয়েছে! কিন্তু তুমি যে আমার ছবি চিনিয়ে দাও নি, তার প্রমাণ কি?

সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ। চিনিয়ে দিলে পুলিশ অনেক আগেই য়্যারেস্ট করত।

আগন্তুক কাউণ্টারের কাছ থেকে সরে এল। গম্ভীর গলায় বলল, হয়তো চিনিয়ে দাও নি। কাল তুমি দেবে, পুলিশ তোমাকে বাধ্য করবে চিনিয়ে দিতে। অবশ্য সে সুযোগ পুলিশকে আমি দেব না।...তৈরি হয়ে নাও মনোজ।

তৈরি হয়ে নেব। কোথায় যেতে হবে ?

আগন্তুক আর কিছু বলল না। দ্রুত হাতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে ট্রিগার টিপলো। মনোজ ঘোষ আগন্তুকের অভিসন্ধি বোধহয় বুঝতে পেরে বিদ্যুৎবেগে এক পাশে সরে গেল—কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারল না। সাইলেন্সার থেকে চাপা শব্দ তুলে গুলি ছুটে গিয়ে বাঁ-কাঁধের মাংস ছিঁড়ে গিয়ে বিঁধল দেওয়ালে। মনোজ হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাউন্টারের ওপর।

এক লহমার মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল।

আগন্তুক আবার গুলি করতে যাচ্ছিল, সে বুঝতে পেরেছিল মনোজ ঘোষ আহত হলেও মরে নি। দ্বিতীয়বার গুলি করা গেল না—বাসব ও মিঃ সামন্ত ঢুকে পড়েছেন ঘরে। বাসব বলল, রিভলবারটা ফেলে দিন রাজেশবাবু।

তড়িৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল রাজেশ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

যে জাল আমি পেতেছিলাম, তাতে আপনি ধরা পড়েছেন। আসতে সামান্য দেরি হয়ে গেল, নইলে মনোজবাবুকে গুলি খেতে হত না। ভালই হল, রক্তরাঙা হাতে আপনাকে আমরা ধরতে পেরেছি। মিস্টার সামন্ত, রাজীব মজুমদারের হত্যার অপরাধে আপনি রাজেশ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

সামন্ত ও বাসবের আচমকা আগমনে রাজেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। স্থির হয়ে গিয়েছিল যেন রক্তের প্রবাহ। অসীম বলে নিজেকে সংযত করল রাজেশ। পুলিশের হাতে র‍্যারেস্ট হবার আগেই আবার তার সাইলেন্সার চাপা শব্দ তুলল। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল নিয়ন লাইট!

অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর।

এক লাফে কাউন্টারের ওপর উঠে পড়ল রাজেশ। আহত মনোজকে ডিঙিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল। সামন্ত চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। কয়েকজন কনস্টেবল ছুটে এল ঘরে। বাসব দেশলাই জ্বালল।

চা খেতে খেতে বাসব ও শৈবালের মধ্যে পরের দিন সকালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল রাজেশের আত্মহত্যা নিয়ে।

গতকাল মনোজের দোকানে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব করবার পর সে সোজা নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল।

পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল মজুমদার-প্যালেস।

রাত তিনটে পর্যন্ত কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি রাজেশের। ফুটপাথের ওপর ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ সামন্ত ও পুলিশের অন্যান্য কর্মচারিরা। বাসব ছিল না। হত্যাকারীর সন্ধান সে দিয়েছে, আর তার কোন দায়িত্ব নেই।

মনোজের দোকান থেকেই সে বাড়ি চলে এসেছিল।

তিনটের সময় দোতলার ঝুলন্ত বারান্দায় এসে রাজেশ চেঁচিয়ে সামন্তকে ডেকেছিল। অভয় দিয়ে বলেছিল, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার কাছে আসতে পারেন। আর কারুর প্রাণহানী ঘটবে না!

সামন্ত আর কয়েকজনের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে গেলেন।

দেবেনবাবু কিছুই জানতেন না। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলবার পর আন্দাজ করেছিলেন। শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে বসেছিলেন পার্লারে। সামন্ত সদলে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে।

দেবেনবাবু সকলকে নিয়ে চললেন রাজেশের ঘরে।

দরজা বন্ধ।

অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা খুলল না। শেষে ভাঙতে হল দরজা। হুড়মুড় করে সকলে ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাঁদের জন্যে এক মর্মান্তিক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। রক্তাক্ত রাজেশ বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে। স্থির, নিষ্কম্প তার দেহ। রিভলবারটা পড়ে আছে বিছানার আরেক ধারে।

শৈবাল বলল, মানসিক ব্যালেন্স ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলেন না। এই রকমই হয়। মনোজ ঘোষ বলবার আগে কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে হত্যাকারী কে?

পেরেছিলাম বৈকি! একজন মোটর-ডিলার জানিয়েছিল, আমার হিসেব মত সময়ে রাজেশ মজুমদার একখানা কালো রঙের মাস্টারবুইক কিনেছিলেন। আমার মনের সন্দেহ তখনই গুলিয়ে উঠল। মনোজ ঘোষ প্রথমে আমায় সব সত্যিকথা বলে নি। সুবীরবাবুর ছবি দেখিয়ে বলেছিল এই লোক আমার কাছ থেকে ট্রানজিস্টারে ফুটো করিয়ে নিয়ে গেছে। পরে আবার তাকে গিয়ে ধরলাম, প্রচণ্ড ভয় দেখালাম। আবার এ-কথাও জানালাম, সত্যি কথা। বললে, পুলিশের কোন আঁচ তার গায়ে লাগবে না। স্বীকার করল সব কথা। মনোজ আর রাজেশ বাল্যবন্ধু। রাজেশ ট্রানজিস্টারের সার্টারে ফুটো করিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মোটেই বলে নি, কাউকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছে। পরে কাগজে খুন হওয়ার কথা পড়েছে মনোজ ইত্যাদি।

বাপকে খুন করার উদ্দেশ্য কি? সমস্ত সম্পত্তি তার নামে ছিল, অর্থের জন্যে যে খুন করেছে, তা নয়। সুপর্ণাকে নিয়ে বাপে ও ছেলেতে যে প্রতিযোগিতা ছিল—এ-কথা মেনে নিয়ে যে একটা মোটিভ খাড়া করা যাবে, তাও নয়।

আমিও প্রচুর চিন্তা করেছি, বুঝলে ডাক্তার; কোন হদিশ পাই নি।

বাহাদুর এসে একটা বেশ পুরু খাম বাসবের হাতে দিয়ে বলল, থানা থেকে দিয়ে গেল।

বাসব খামখানা তার হাত থেকে নিল। খামের ওপর মিস্টার সামন্তর একটা চিঠি পিন-আপ করা রয়েছে।

সামন্ত লিখেছেন, রাজেশ মজুমদার এই খামখানা আপনার নামে রেখে গেছেন ; পাঠালাম। হাসপাতালে মনোজ ঘোষের অবস্থা উন্নতির দিকে। বহুবারের মত এবারও আপনার বুদ্ধির তারিফ করি ; কাল দেখা করব।

বাসব খাম ছিঁড়ে বার করল একটা চিঠি আর অনেকগুলো একশ টাকার নোট। এত নোট কেন !

ডাক্তার ব্যাপার কি ?

পড়ে দেখ চিঠিখানা।

বাসব চেঁচিয়ে পড়ল :

মান্যবর বাসববাবু,

চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে অসংখ্য বিকার গ্রাস করতে চাইছে। তার মধ্যে একটা হল আপনাকে প্রশংসা জানাবার ইচ্ছা। একেও এখন বিকার ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়, বলুন ? তবু আপনাকে আমি প্রশংসা জানাব। আপনার প্রতিভার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে যাব। নিজের ওপর আমি প্রচণ্ড আস্থাশীল ছিলাম। আমি ভারতের বাইরে, বাবা সেই সময় খুন হবেন—আমার পরিকল্পনায় কোন ফাঁক নেই, এ-বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম। আপনি আমার নিশ্চয়তাকে খানখান করে ভেঙে দিলেন। যে কথা দিয়েছি, তা রাখব। হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে পুরস্কৃত করব। ত্রিশখানা একশ টাকার নোট পাঠালাম। আপনার প্রতিভার মূল্য হিসেবে যত-কিঞ্চিৎ। জানি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন।

হত্যার মোটিভ সম্পর্কে আপনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে বাবাকে খুন করবার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আসল কথা কি জানেন, আমি আমার মাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। আমার বয়স তখন সাত বছর ! অনেক কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। সেই সময় নিজের চোখের ওপর দেখেছি, বাবা নির্মমভাবে মাকে খুন করলেন। মন আমার বিষিয়ে উঠল ; বয়স যত বাড়তে লাগল বাবার প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়তে লাগল তত বেশি। চোদ্দ বছর বয়সেই আমি স্থির করে ফেললাম, জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর বাবাকে খুন করব। আরো কয়েক বছর পরে, মামার মুখে মার সম্পর্কে সমস্ত কথা শুনেছিলাম। তবু নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হলাম না। আমার শিশুমনে যে গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে, তা কিভাবে মুছে ফেলব ? অত্যুগ্র ইচ্ছেটাকে সুযোগের অপেক্ষায় মনের মধ্যে লালন করে চললাম। তারপর কিভাবে প্ল্যান সাজিয়েছিলাম আপনি খুব ভালভাবেই জানেন, সুতরাং ও বিষয়ে আর কিছু লিখলাম না।

ধরা পড়ে যাবার পর আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ আমার সামনে খোলা নেই। পুলিশের ভয়ে চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে একাজ অনেক ভাল। আপনার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কার!

রাজেশ মজুমদার

শৈবাল বলল, এই অপকর্ম না করলে রাজেশ একজন সুখী মানুষ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারত?

মানুষের মনের গতি বিচিত্র ডাক্তার! রাজেশ মজুমদারের জন্যে মনের মধ্যে একটু সহানুভূতি জাগছে।

বাসব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোয়াট নটের দিকে এগিয়ে গেল। মোটর থামার শব্দ পাওয়া গেল বাইরে।

দেখতো জানলা দিয়ে কে এল!

শৈবাল জানলার কাছে এগিয়ে বলল, সুবীরবাবু।

হোয়াট-নটের ওপরে রাখা সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বাসব ধরালো। সুবীর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকছে তখন।

ভূজঙ্গ প্রয়াত

এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি যে কোনদিন হতে হবে প্রভাত কল্পনাতেও আনতে পারেনি। যদিও এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কিছু নেই, তবু সে ভাবছে আর মনের মধ্যেটা হু হু করে চলেছে।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। দাঁড়িয়ে আছে ডা: চৌধুরীর শোবার ঘরের দরজার মাত্র কয়েক হাত এধারে। এই রকম অকল্পনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি মানুষকে যখন সময় সময় হতে হয় তখন হতবুদ্ধি না হয়ে উপায় থাকে না।

বিপুল মণ্ডল বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনিই। বিলক্ষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল বড় একটা দেখা যায় না। মাংসর পাহাড়ের উপর খাকি পোশাক বলা বাহুল্য নিদারুণ বেমানান। থানা ইনচার্জ না হয়ে উনি যদি তেল কলের মালিক হতেন তাহলে মানানসই হত।

বিপুল মণ্ডল থমকে দাঁড়ালেন।

—আপনি কে?

—প্রভাত সোম…মানে…

—বুঝেছি। বিস্তারিত পরিচয় দিতে হবে না। চকল চৌধুরীর আপনি যে বন্ধু তা আমার জানা হয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

—না… মানে…

—আমতা আমতা করবেন না। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন বলুন?

প্রভাত কিছুটা বিরক্ত হল।

—কি আবার করব? এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মনের অবস্থা—

—খুব খারাপ।

বিপুল মণ্ডল ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসলেন।

—একটা খুন হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই ধরনের বাঁধা বুলি আওড়ান বরাবর লক্ষ্য করেছি। শুনুন মশাই—

—বলুন?

—আমার অনুমতি ছাড়া এ বাড়ি থেকে বেরুবেন না।

এবার প্রভাতের অবাক হবার পালা।

—তর্ক আমি ভালবাসি না। এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না।

এ বাড়ির প্রত্যেককে আমরা সন্দেহ করি। আপনিও সে লিস্টের বাইরে নন। আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে যান। আপনার এজাহার সময় মত আমি নেব।

আর কিছু না বলে প্রভাত এল।

নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসল চেয়ারে। খুব যে ইচ্ছে হচ্ছে তা নয়, তবু সিগারেট ধরাল। কত-কথা কত-ঘটনা ধারাবাহিকভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বেনারসে। বছর দশেক আগেকার কথা তো বটেই।

প্রভাত মুঙ্গেরের ছেলে।

এম. এস. সি-র পাঠ শেষ করতে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। ফিফ্থ ইয়ার চলেছে তখন। সেদিন কি তারিখ ছিল আজ অবশ্য আর মনে নেই। তবে উত্তরপ্রদেশে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা তখন। সন্ধ্যার মুখে হোটেল ফেরার পথে আচমকা পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা ক্ষতবিক্ষত হল প্রভাতের।

ঘটনাস্থলে সে সময় আরো কয়েকজন ছিল এই যা রক্ষে। সকলে তাকে ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে নিয়ে গেল। চিকিৎসার আশু ব্যবস্থা হল। সেখানেই প্রথম দেখা হল চঞ্চলের সঙ্গে।

চঞ্চল তখন মেডিকাল কলেজের বিখ্যাত ছাত্র ; কি কারণে যেন সে তখন ওখানে উপস্থিত হয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় নার্সকে সাহায্য করল সে। তারপর দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গল্প গুজব হল। চঞ্চলরা প্রবাসী বাঙ্গালী নয়। ওর বাবা কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। নিতান্ত দায়ে পড়েই অর্থাৎ ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে সিট না পাওয়ায় চঞ্চল বাধ্য হয়েই পড়তে এসেছে বেনারসে।

অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব জমে উঠল।

লেখাপড়ার পাঠ শেষ হয়ে যাবার পর দুজনে দুদিকে ছিটকে গেলেও ঘনিষ্ঠতার ছেদ পড়ল না। ভাগ্যক্রমে প্রভাতকে বেশি দিন বেকার অবস্থায় থাকতে হয়নি। জামসেদপুরের টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিলে ভাল চাকরি পেয়ে গেল। চঞ্চল চেম্বার খুলে বসল রাসবিহারী এভিনিউ-এ।

কোন ডাক্তারের পক্ষে—বিশেষ ব্যস্ত একজন ডাক্তারের পক্ষে যখন তখন বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও চঞ্চল মাঝে মধ্যে দু-একদিনের জন্য ঘুরে আসে জামসেদপুর থেকে। প্রভাত অবশ্য প্রতিবছর বেশ কিছুদিন ছুটি নিয়ে ওদের ফার্ণ রোডের বাড়িতে এসে থেকে যেত। এছাড়া ঘনঘন পত্র বিনিময় তো হতই। যথা নিয়মে এবারও প্রভাত এসেছিল ডিসেম্বরের মুখে।

তাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল চঞ্চল।

স্টেশন থেকে ফেরার পথে একথা সে-কথার ফাঁকে প্রভাত বলল, আমাদের

বয়স ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কি বলিস ?

—বাড়ছে বই কি ।

—তোর কত হল ?

স্টিয়ারিং-এ একটু পাক দিয়ে চঞ্চল বলল, আর তিন মাস পরে আমার বত্রিশ কমপ্লিট করবে ! তোর ?

—আগামী মাসে আমি বত্রিশে পড়ছি ।

—ব্যাপার কি ? ট্রেন থেকে নেমেই বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে দিয়েছিস !

মৃদু হেসে প্রভাত বলল, দেখ যাচ্ছে আমরা আর খোকা নেই । এবার বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল ।

বিয়ে !

—আমাদের কুড়েমির জন্য দুটো মেয়ের আইবুড়ো নাম ঘুচছে না এটা কিন্তু ঠিক নয় ।

—কোন্ মেয়ের কথা বলছিস ? আমাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে বসে আছে বলে তো জানি না ।

—শাস্ত্রে না কোথায় বলেছে না, প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে মেয়ে ঠিক হয়ে আছে । আমরা যদি বিয়ে না করি তাহলে তো দুটো মেয়ে আইবুড়ো থেকেই যাচ্ছে । এই সহজ কথাটা বুঝতে তোর দেরি হচ্ছে কেন !

চঞ্চল হেসে ফেলল ।

—তাই বল । কিন্তু—

—আবার কিন্তু কিসের ?

—কিন্তুর একটা হাইফেন আমার বেলায় থেকেই যাচ্ছে । মেজদা আর ছোড়দার এখনও বিয়ে হয়নি । তাদেরই টপকে কোন মেয়ের গলায় কিভাবে মালা দেওয়া যায় বল ? তোর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র । আগে আর পরে কেউ নেই । স্বচ্ছন্দে তুই বিয়ে করে ফেলতে পারিস । জোর একটা ভোজ লাগানো যাবে—কি বলিস ?

—না, তা হয় না ।

—সে কি ! বিয়ে করবি অথচ কাউকে খাওয়াবি না ?

—সে কথা নয় । আমি একা বিয়ে করতে পারব না । তার চেয়ে তোর মেজদা আর ছোড়দার যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় সে চেষ্টাই দেখি । তারপর আমাদের না হয়—

চঞ্চল আবার হেসে উঠল ।

এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই ওরা যথাসময় গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছল । হাল্কা বাদামী রং করা আধুনিক ধরনের চারতলা বাড়িটার দিকে একবার

তাকালেই যে কেউ বুঝতে পারবে, গৃহকর্তার স্বচ্ছলতা সন্দেহাতীত। সেই সঙ্গে আছে ঝক্‌ঝকে রুচি।

অবশ্য আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ডাঃ সরল চৌধুরী বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসে প্রায় ফাঁকা এই জায়গায় চেম্বার খুলে বসেছিলেন। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা প্রকৃত অর্থেই একেবারে ভাল ছিল না। স্ত্রীর সামান্য যা গয়না ছিল তাই বিক্রি করে তাঁকে চেম্বারের খেলো আসবাব আর ওষুধপত্র কিনতে হয়েছিল।

তবে তিনি যে প্রবল ভাগ্যের অধিকারী তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল। অতি দ্রুত তাঁর পসার জমে উঠল।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন, বন্ধ দরজার চাবিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা হাতে পেয়ে যাবার পরই সোনায় মোড়া সিঁড়ি দিয়ে চৌধুরী দ্বিধাহীনভাবে উপরে উঠে চলেছে।

এখন ডাঃ সরল চৌধুরী একজন সুখী মানুষ। প্রচণ্ড পসার। ব্যাঙ্কে অপর্যাপ্ত টাকা, এছাড়া চারটি কৃতি পুত্রের জনক তিনি। মেয়েটির ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। সে এখন স্বামীর সঙ্গে রয়েছে নিউইয়র্কে। অবশ্য একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেছে। বছর পাঁচেক হল গত হয়েছেন স্ত্রী।

ডাঃ চৌধুরীর বড়ছেলে কমল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ম্যানেজার। তার বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়জন নির্মল এটর্নী। ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে তার অফিস আছে। তৃতীয় অচল ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মচারি। ছোট ছেলে চঞ্চলকে তিনি ডাক্তারি পড়িয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সেও তাঁর মত একদিন পসারের চূড়ান্তে পৌছাবে।

সারাটা দুপুর চঞ্চল আর প্রভাত গল্প করেই কাটিয়ে দিল। বিকেলেও চেম্বারে গেল না চঞ্চল। পাঁচটার পর দুজনে লেকের ধারে একটু নির্জন জায়গা খুঁজে নিয়ে গিয়ে বসল। চিনেবাদাম খেতে খেতে ভবিষ্যত নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হল।

একসময় প্রভাত বলল, আমি যে কদিন থাকব, তুই বোধহয় চেম্বারে না যেতে পারলেই বাঁচিস।

—তাহলে তো ভালই হয়। কিন্তু সে রকম ভাল তো রোগীরা হতে দেবে না। তবে অন্যান্যবারের মত এবারও চেম্বারে বসার সময় একটু কমিয়ে আনবো।

—সন্ধ্যা হয়ে গেল। একেবারেই শীত করছে না দেখছিস! ডিসেম্বরের পক্ষে এ একটু বাড়াবাড়ি, কি বলিস।

কলকাতাটা ক্রমেই অখাদ্য হয়ে উঠছে। অসহ্য গরম পড়বে, বর্ষাকালে

নাজেহাল অবস্থা, অথচ শীতকালে ঠাণ্ডা পড়বে না!

প্রায় আটটার সময় ওরা লেকের ধার থেকে উঠল।

সারাদিনের মধ্যে একবারও ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে প্রভাতের দেখা হয়নি। এই বয়সেও তিনি নিজের ব্যস্ততাকে ঠিক আগের মতই জীবন্ত রেখেছেন। বিশ্রামের কথা চিন্তাই করতে পারেন না।

দেখা হল ডিনারের টেবিলে।

বাড়ির সকলেই ডাইনিং হলে উপস্থিত। খাওয়ার-দাওয়া তদারকে ব্যস্ত রয়েছে বাড়ির বড়বৌ অলকা। রূপসী বলতে যা বোঝায় তা না হলেও, শরীরে এমন একটা আলগা শ্রী আছে যা দেখতে ভাল লাগে। শাশুড়ি না থাকায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এখন তার।

প্রভাতের কুশল প্রশ্ন করলেন ডাঃ চৌধুরী।

ভারি গঠনের গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তিনি। উপর থেকে মোটেই বুঝতে পারা যায় না, মনের মধ্যে স্নেহ আর দয়ামায়ার স্রোত বয়ে চলেছে। পরিচিতরা সকলেই অবশ্য তাঁর এই স্বভাবের কথা জানে।

ছাড়া ছাড়া কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ডিনার শেষ হল।

ডাঃ চৌধুরী সিগার ধরালেন।

প্রভাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে যেন একটু শুকনো দেখছি?

প্রভাত মাথা একটু নত করে বলল, কাল সারারাত ট্রেনে কেটেছে। ভাল ঘুম হয়নি, তাই বোধহয়—

—হতে পারে। আমার ঘরে একবার এসো। একটা ওষুধ দিচ্ছি। বেশ ঝরঝরে বোধ করবে।

—আজ্ঞে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

—ডাঃ চৌধুরী ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরে প্রভাত তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। চঞ্চলও অবশ্য সঙ্গে আছে। তিনি তখন সোফায় বসে একটা মোটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বই হবে বোধহয়। প্রত্যহ এই সময় কিছুক্ষণ পড়াশুনা করা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস।

ওরা ঘরে প্রবেশ করতেই মুখ তুলে তাকালেন।

সেণ্টার পিসের উপর রাখা কাচের গেলাসে হাল্কা লাল রংএর কোন বলকারক ওষুধ ঢালা ছিল। সেদিকে আঙুল নির্দেশ করে স্বাভাবিক ভারি গলায় বললেন, জল মিশিয়ে খেয়ে নাও।

প্রভাত ওষুধটা খেয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

—ওহে, শোনো—

প্রভাত ঘুরে দাঁড়াল।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, চঞ্চল, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। প্রভাতের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

চঞ্চল চলে যাবার পর তিনি আবার বললেন, বসো। অবাক হচ্ছ বোধহয়? কথাটা তোমার বন্ধুকে নিয়েই। ওর মতিগতি সম্পর্কে তোমার কাছে থেকে কিছু জেনে নিতে চাই।

প্রভাত কিছুই আঁচ করতে পারল না।

ইতস্ততঃ করে বলল, বলুন?

—চঞ্চলের আমি বিয়ে দিতে চাই। বিয়েতে ওর আপত্তি আছে কিনা বলতে পারো?

অভাবনীয় প্রশ্ন—

একটু থেমে থেকে প্রভাত বলল, মেজদা, ছোড়দা, থাকতে···মানে··· তাঁদের আগে···

—নির্মল বিয়ে করবে না আমায় জানিয়েছেন। ওর এ্যাজমার টেণ্ডেন্সি আছে জানো বোধহয়? অচল আর চঞ্চলের বিয়ে আমি একসঙ্গে দিতে চাই।

একটু থেমে বললেন, বয়স আমার কম হল না। সমস্ত দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভাল।

—আপনার কথা তো চঞ্চল কখনও অমান্য করেনি।

—তবুও তোমরা আজকালকার ছেলে—তোমাদের মতামতের উপর এখন আমাদের চলতে হয়।

—আমার তো ধারণা আপত্তি করবে না।

—বেশ। তুমি এই সময়ে এসে পড়ে ভালই করেছ। মেয়েটিকে তোমরা কালই দেখে এসো। দুর্গা প্রতিমার মতো চেহারা। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

—আমরা দেখে কি করব। আপনার যখন পছন্দ—

—তা হোক। তবু তোমাদের যাওয়া দরকার। মেয়েটি আমার এক বন্ধুর কাছেই থাকে। আমি ওদের খবর দিয়ে রাখব। কাল সন্ধ্যার সময় তোমরা যাবে। যাও, এখন শুয়ে পড় গিয়ে।

প্রভাত খুশি মনে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফেরার পথে আলোচনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ডাঃ চৌধুরী আবার বই-এ মন দিলেন। আর পড়বেন ঘণ্টা খানেক, শুয়ে পড়বেন তারপর।

মিনিট দশেক কাটেনি বোধহয়, বেয়ারা এসে উপস্থিত হল।

—কি চাই?

—কপিলবাবু দেখা করতে এসেছেন।

বেশ বিরক্ত হলেন ডাঃ চৌধুরী।

রাত দশটার সময় কেউ যে কারুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে এ তাঁর চিন্তার বাইরের ব্যাপার। সময় জ্ঞান সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই সচেতন নয়—আশ্চর্য তবুও ঘর থেকে বেরুলেন। শোনা যাক কপিল শীল এই অসময়ে কি বলতে এসেছে।

কপিল শীল ড্রইংরুমে বসে চারমিনার টানছিল। তার বয়স চল্লিশের কম হবে না। ঘিয়ে ভাজা চেহারা। মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, এই বয়সেই অনেক ঘাটের জল সে ঘোলা করেছে। এরা সেই শ্রেণীর লোক যারা মোসায়েব নয়, অথচ অর্থশালীদের আশে পাশেই ঘুর ঘুর করে। লাভের বিনিময়ে তাঁদের অনেক উপকার করে দেয়। আবার স্বার্থে ঘা লাগলে অপকার করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

ডাঃ চৌধুরীকে দেখে কপিল উঠে দাঁড়াল।

বিনীতভাবে বলল, আপনাকে এই সময় বিরক্ত করার জন্য স্যার আমি সত্যি লজ্জিত। কি করব— রণেনবাবু বললেন—

—তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না। যা বলতে এসেছ তাই বলে ফেল তাড়াতাড়ি।

—এই যে বলি।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে, মোলায়েম হেসে কপিল শীল বলল, বিয়ের ব্যাপারটা নিয়েই এসেছিলাম। রণেনবাবু বলছিলেন—

—থামলে কেন ?

—উনি টাকার অঙ্কটা আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে পারেন। আপনি তো বুঝতেই পারছেন স্যার, ওঁর চঞ্চলবাবুকে পছন্দ।

বিরক্তির স্বরে ডাঃ চৌধুরী বললেন, একই আলোচনার মধ্যে আমার বারবার যেতে ভাল লাগে না। রণেনবাবুকে গিয়ে বলবে, টাকার অভাব আমার নেই। কোন্ ছেলের বিয়ে কোথায় দেব তা নির্ভর করবে আমারই ইচ্ছার উপর।

—সে তো নিশ্চয়। একশ'বার। তবে কি জানেন স্যার মানী কুটুম্ব কে না চায়।

ওদিকটা মনে রাখলে—

—মনে রেখেছি তো। অচলের সঙ্গে তাই তো রণেনবাবুর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছি। অচল কি পাত্র হিসাবে খারাপ ?

কপিল জিভ কাটল।

—সে কি কথা। এমন ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায়। তবে সবই

হল মনে ধরার ব্যাপার। রণেনবাবুর মনে ধরেছে আপনার ছোট ছেলেকে। তাই বলছিলাম বিষয়টা যদি আরেকবার বিবেচনা করে দেখেন।

—আর বিবেচনা করার কিছু নেই। কোন সিদ্ধান্তে আসার পর সরে আসা আমি পছন্দ করি না। আর নিশ্চয় তোমার কিছু বলার নেই? রাত বাড়ছে। এবার আমি শোবার ঘরে যেতে চাই।

—কিন্তু স্যার—

—আর কথা বাড়িও না। বাড়ি যাও। রণেনবাবুকে বলবে, কোনমতেই আমার পক্ষে রাজি হওয়া সম্ভব নয়। তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র মেয়ের জন্য ছেলে দেখতে পারেন।

অচলের জন্য ভাল মেয়ের অভাব হবে না।

—অভাব! কি যে বলেন স্যার। শ'য়ে শ'য়ে পাওয়া যাবে। তবু আরেকবার যদি—

—আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও।

ডাঃ চৌধুরীর গলায় এমন কিছু ছিল যাতে সিঁটিয়ে গেল কপিল।

—আমি তাহলে আসি স্যার—

সে দ্রুত পায়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকের দিনটা বিশেষ সুবিধায় কাটল না। এই একরোখা বড়লোকদের নিয়েই হয় যত ঝামেলা। একটু হেরফের করতে যে কি অসুবিধা বোঝা মুস্কিল। তিক্ত মনে বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে পা দিয়েছে সবে—

—কি হল মশাই?

কপিল চমকে মুখ ফেরাল।

প্রশ্নকর্তা অচল।

—কিছু সুবিধা করতে পারলেন?

—কিছুই হল না। আপনার বাবা সেই জবর গোঁ নিয়ে বসে আছেন।

—আপনি বোধহয় ঠিক মত কথাটা পুট করতে পারছেন না।

—কি যে বলেন। আমি বলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পেরেছি। অন্য কেউ হলে ওর সামনে মুখ খুলতে পারতো না।

অচল সিগারেট ধরাল।

—আপনি খুব বাহাদুর বুঝলাম। কিন্তু এই বাহাদুরী দেখিয়ে কি লাভ হল বলুন?

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এ কথা আপনাকে মানতেই হবে।

—মানলাম না হয়। কি লাভ হল?

—এই পথ ধরে এগুলে কোনকালেই কিছু হবে না। কপিল শীল বলল, আপনি বরং এক কাজ করুন।

—কি কাজ ?

—আপনাকে এবার আসরে নামতে হবে।

অচল অবাক হল।

—আমাকে !

—আপনার বাবার সেই বাল্যবন্ধুর কি যেন নাম ? হাঁ, মনে পড়েছে, প্রশান্ত মুখার্জী। আপনি প্রশান্তবাবুর বাড়ি যাওয়া আসা আরম্ভ করে দিন না। মেয়েটির সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হতে থাকবে। তার মন গলিয়ে ফেলতে তখন আর কোন অসুবিধা হবে না। তারপর আর আপনাকে পায় কে ?

—হুঁ। দেখি।

অচল আর কিছু না বলে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ওদিকে—

ডাঃ চৌধুরী ড্রইংরুমে বসে আছেন। সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছেন তিনি। পাঁশুটি রংএর ধোঁয়া ক্ষণেক্ষণে তাঁর মুখ আড়াল করে যাচ্ছে। তিনি কিছুটা চিন্তিত বুঝতে পারা যায়। চিন্তার সঙ্গে বিরক্তি যে মিশে নেই তা নয়। ছেলেদের বিয়ে দিতে গিয়ে যে এমন উটকো ঝামেলা দেখা দেবে তাঁর চিন্তার অতীত ছিল।

বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই বললেন, মামাবাবু কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

—আজ্ঞে না। তাঁর ঘরে এখনও আলো জ্বলছে।

—তাঁকে একবার এখানে আসতে বল।

মাসখানেক আগে প্রতাপাদিত্য রোডে কলে গিয়েছিলেন। রুগী দেখা শেষ করে তখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন তখনই মনে পড়ল এই পাড়াতেই প্রশান্ত থাকে। এই সঙ্গে আরো মনে পড়ল বছর দশেকের মধ্যে দুজনের দেখাসাক্ষাত ঘটেনি।

প্রশান্ত মুখার্জী ডাঃ চৌধুরীর বাল্যবন্ধু।

বি. এস. সি. পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছিলেন দুজনে। তারপর প্রশান্ত ঢুকে পড়লেন এক কারখানায় কেমিষ্ট হিসাবে। চৌধুরী নাম লেখালেন মেডিক্যাল কলেজে। তাঁদের দেখাসাক্ষাত অবশ্য নিয়মিত হত। দুজনে দুজনের বিয়েতে খুব হৈ চৈ করেছেন।

পরবর্তীকালে দুজনের আর্থিক সঙ্গতির ব্যবধান বিরাট হলেও বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরেনি। তবে শেষপর্যন্ত যা হয়। কাজের চাপ ক্রমেই বেড়ে যেতে থেকেছে। দুজনেরই ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। নানা রকম সাংসারিক

ঝামেলাও এসে জুটেছে। দেখা সাক্ষাত বলতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে একদিন।

তারপর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে।

গাড়িতে আর ওঠা হল না।

এ পাড়ায় যখন এসেই পড়েছেন প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাক। মন্থরপায়ে ডাঃ চৌধুরী বন্ধুর বাড়ির দিকে এগুলেন। প্রশান্তর অবসর জীবন এখন নিশ্চয় ভালই কাটছে। ছেলেরা তো মানুষ হয়ে গেছে—ভাল ভাল চাকরি করছে বলেই শুনেছেন।

এগুতে এগুতে ডাঃ চৌধুরীর হঠাৎ মনে হল, তিনি না হয় দেখা করেন নি। খোঁজখবর নেননি। প্রশান্ত চুপচাপ বসে থাকছে কেন? সে কেন যায়নি তাঁর কাছে। সময়ের অভাব এ অজুহাত তো আর দেখাতে পারবে না।

বাড়ির ঝকঝকে রূপ এখন আর নেই। বড় বেশি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কতকাল দেওয়ালে রং ফেরানো হয়নি কে জানে। এখানে ওখানে আবার শ্যাওলার চাঙড়া জমাট বেঁধে রয়েছে। ডাঃ চৌধুরী অবাক না হয়ে পারলেন না। এমন তো হবার কথা নয়।

আবার কড়া নাড়তেই দরজার পাল্লা দুটো অল্প শব্দ তুলে খুলে গেল ধীরে ধীরে। সামনেই দাঁড়িয়ে বাইশ-তেইশ বছরের অতি সুশ্রী একটি মেয়ে। তার মুখে ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। একজন সম্ভ্রান্তদর্শন আগন্তুককে সে বোধহয় আশা করেনি।

তাকে দেখে ডাঃ চৌধুরী হাসলেন।

—কাকে চাইছেন?

—প্রশান্ত মুখার্জী বাড়ি আছেন?

—আছেন।

ডাঃ চৌধুরী আর কিছু বলতে যাওয়ার আগেই গৃহকর্তা দেখা দিলেন।

—একি চৌধুরী!

প্রশান্ত মুখার্জী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো? এসো, এসো, ভেতরে এসো—

ডাঃ চৌধুরী দেখলেন, প্রশান্তর সে কান্তি আর নেই। জীর্ণশীর্ণ চেহারা। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, মাথায় সেই বাহারে চুল নেই, পাতলা হয়ে এসে পেকে গেছে—সব মিলিয়ে কেমন শ্রীহীন অবস্থা! তরুণীর পাশ কাটিয়ে তিনি ভেতরে গেলেন।

আবেগের প্রথম ধাক্কা সামলে নিতে দুজনের কিছু সময় গেল।

তারপর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, শরীরের এ কি অবস্থা হয়েছে?

—টিঁকে যে আছি যথেষ্ট।

—অসুখটা কী! খুলে বলো? কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তারের ট্রিটমেণ্টে রেখে আমি তোমাকে ভাল করে তুলব।

করুণ হেসে প্রশান্ত মুখার্জী বললেন, কোন অসুখ থাকলে তো বাঁচা যেত। বুঝতাম, ঠিক মত ওষুধ-টষুধ খেলে ভাল হয়ে যাব। আমার রোগটা একটু অন্য ধরনের চৌধুরী।

—অর্থাৎ—

—গত ক বছরের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে ভাই। তাইতো ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি।

ডাঃ চৌধুরীর কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

—তিনি বললেন, আমায় আর ধাঁধাঁয় না রেখে, কি হয়েছে পরিষ্কার করে বলো দেখি।

এরপর প্রশান্ত যা বললেন তার সারমর্ম হল, তিনি একটি করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন আর এক-একজন করে আলাদা হয়ে গেছে। তারা এই কলকাতা শহরের নানা অঞ্চলে বাস করছে। এক পয়সা দিয়ে বাপকে সাহায্য করে না। মা-বাপ বেঁচে আছে কি মরে গেছে সেটুকু জানার আগ্রহ তাদের নেই।

পেনসনের সামান্য কটা টাকার উপর নির্ভর করে এই আক্রার বাজারে কোন রকমে তিনি সংসার নির্বাহ করছেন। কি ভাবে যে বেঁচে আছেন তাই ভেবে সময় সময় হতবাক্ হয়ে যান। চিন্তায় ভাবনায় শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। তবে এটুকু বুঝেছেন এইভাবে বেশি দিন চলতে পারে না।

ডাঃ চৌধুরী গুম হয়ে বসে রইলেন কয়েক মিনিট।

বললেন তারপর তুমি যে এমন অবস্থায় পড়বে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। আগে সমস্ত কথা আমায় বললে তো পারতে?

—পারিনি। সঙ্কোচ বাধা দিয়েছে।

—আমার কাছে সঙ্কোচ—!

—আমার মত অবস্থায় পড়লে তুমিও এই ধরনের বিকারের শিকার হয়ে পড়তে ভাই। ইদানিং সুদিনেই আমাদের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাত হত না! দুর্দশায় পড়েছি বলেই হাত পাতবো গিয়ে?

—এ সমস্ত কি বলছো প্রশান্ত! হাত পাতা নয়, তুমি তোমার দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে পারতে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। ভোগ ছিল ভুগে নিয়েছ। আর নয়—এখন থেকে তোমাদের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার।

প্রশান্ত চৌধুরীর হাত চেপে ধরলেন।

তাঁর দু'চোখ জলে চকচক করে উঠল।

—তোমার—

—হ্যাঁ। আমার। হাত পেতে টাকা নিতে বলছি না। তোমার সম্মানে যাতে ঘা না লাগে সেই রকম একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করব। তুমি নিশ্চিন্তভাবে আমার উপর সমস্ত কিছু ছেড়ে দাও।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মানে···

—তোমার বুঝে দরকার নেই।

ডাঃ চৌধুরী প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। কি তাঁর পরিকল্পনা, প্রশান্ত মুখার্জীর আর্থিক অবস্থাকে জেল্লাদার করে তুলতে—কোন্ সম্মানজনক পথ তিনি অবলম্বন করতে চান—সে সম্পর্কে কোন আঁচ দিলেন না।

—তোমার মেয়েটি তো চমৎকার হয়ে উঠেছে দেখলাম। পড়াশুনা করছে তো?

—বি. এ পাশ করে বসে আছে। আর পড়াতে পারলাম না।

—কি নাম রেখেছ? দেখছ, কি রকম সব ভুলে গেছি। দশটা বছর বিরাট একটা সময়, কি বলো?

—ওর নাম প্রতিমা।

—খাসা নাম রেখেছ। দুর্গা প্রতিমার মতই দেখতে।

দু'কাপ চা হাতে করে প্রতিমা ঘরে এল এই সময়। প্রণাম পর্ব আগেই সমাধা হয়ে গিয়েছিল। সস্নেহে তার দিকে তাকালেন ডাঃ চৌধুরী। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন তার সঙ্গে।

প্রতিমা চলে যাবার পর বললেন, আমার ছোট ছেলে চঞ্চলকে নিশ্চয় তোমার মনে আছে? আজকাল প্র্যাকটিশ করছে।

—তাই নাকি। একদিন বাপের মত নামী হয়ে উঠবে, কি বলো?

—ওর উপর আমার আস্থা আছে। আচ্ছা, প্রশান্ত—

—বলো?

—ওকে জামাই হিসাবে পেলে তুমি কি খুশি হবে?

মহা বিস্ময়ে প্রশান্ত থ' হয়ে গেলেন।

নিজেকে সামলে নেবার পর বললেন, খুশি হব কি বলছো? এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আজ সকালে আমি কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম? তুমি যেন সাক্ষাত দেবদূত হয়ে এসেছ আমার কাছে।

চৌধুরী মৃদু হাসলেন।

—সময় সময় এই রকম সমস্ত ব্যাপার ঘটে যায়। আমি দেবদূত নই, উপলক্ষ বলতে পারো। তাহলে ওই কথাই রইল—

—কিন্তু ভাই—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। তোমার গিন্নীকে ডাক। ওঁকে শুভ সংবাদটা জানিয়ে যাই।

—তিনি বাড়ি নেই। গতকাল শ্যামবাজার গেছেন। বাপের বাড়ি আর কি। খরচ-পত্রের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। তোমার তো আরো ছেলে ছিল। তাদের সকলের কি—

—না। দুজনের বিয়ে এখনও হয়নি। একজন অবশ্য করবে না। তৃতীয়জনের জন্য একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। বুঝলে প্রশান্ত, মনের মাঝেই দুটো বিয়ে তাহলে লাগিয়ে দেওয়া যাক।

প্রশান্ত কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আরো কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ডাঃ চৌধুরী বিদায় নিলেন।

এরপর এক সপ্তাহ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশান্ত একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ চৌধুরীর বাড়ি এসেছেন। অচল আর চঞ্চল দুজনেই দেখেছে প্রতিমাকে। চঞ্চল কিছু মোটেই জানে না। তার বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেছে ওই মেয়েটির সঙ্গে।

প্রশান্তকে স্বচ্ছল জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাঃ চৌধুরী [illegible] এগিয়েছেন। তিনি জানেন আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে বন্ধু কখনই নিতে চাইবে না। কাজেই মাথা খাটিয়ে তাঁকে এমন পথ বার করতে হবে যাতে না বলার কিছু থাকতে পারে না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের উপর বিরাট আকারের ওষুধের দোকান খুলবেন স্থির করেছেন। মূলধন তাঁর। ওয়ার্কিং পার্টনার প্রশান্ত। ব্যবসা দেখাশুনা করবেন প্রশান্তই। অনেক বুঝিয়ে বন্ধুকে রাজী করেছেন চৌধুরী। ভাল পজিসানে দোকানের জন্য জায়গাও পাওয়া গেছে। সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার পরই দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

এদিকে এক উটকো ঝামেলা দেখা দিয়েছে। [illegible] রঞ্জন মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে অচলের বিয়ে স্থির করেছেন ডাঃ চৌধুরী। এখন মজুমদার বায়না ধরেছেন, চঞ্চলকে তিনি জামাই করবেন। এধরনের আব্দার বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সম্বন্ধ যদি ভেঙ্গে যায় যাক। অচলের জন্য মেয়ের অভাব হবে না। তাও তো তিনি জানেন না, অচল প্রতিমাকে বিয়ে করার জন্য জেদ ধরে বসে আছে।

—চৌধুরী মশাই আমায় ডেকেছেন?

বিকাশবাবুর কথায় চটক ভাঙ্গল চৌধুরীর। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন। ভাবনার পিছনে প্রায় পনেরো মিনিট খরচ করেছেন।

—হ্যাঁ। অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করলাম। শুয়ে পড়েছিলে নাকি?

—শুতে যাচ্ছিলাম!

—রণেন মজুমদার তো জ্বালিয়ে খেলে। লোকটার এরকম স্বভাব জানলে আমলই দিতাম না। যাহোক, কালই এর একটা হেস্তনেস্ত চাই।

—আবার কি হল? বিকাশবাবু অবাক হয়ে বললেন, কথাবার্তা তো সমস্ত ফাইনাল হয়ে গেছে।

—তাঁর ব্যাপার স্যাপার দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

—উনি এসেছিলেন নাকি?

—উনি এলে তো ভালই হত। সামনা-সামনি কথা বলে নিতে পারতাম। কপিল এসেছিল। সেই এক কথা। কাল সকালেই তুমি মজুমদারের বাড়ি চলে যাবে। বলবে, তিনি যদি সত্যি আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চান তাহলে অচলের সঙ্গেই বিয়ে হবে তাঁর মেয়ের। এখন অনুরোধ উপরোধ অর্থহীন চঞ্চলের জন্য আমি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি।

—বলব।

—শেষ কথাটা আমি কালই শুনতে চাই একথাও বলবে।

—আমি বরং তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। আপনি সরাসরি তাঁকে সমস্ত কিছু বলতে পারবেন।

—সেই ভাল। এই বিরক্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে খুব তাড়াতাড়ি রেহাই পেলে আমি বাঁচি।

সিগার নিভে গিয়েছিল।

ডাঃ চৌধুরী ধরিয়ে নিলেন।

বললেন আবার, কাজ কেমন চলছে?

—দোকান ডেকরেশানের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—ভালভাবেই এগুচ্ছে। মনে হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সমস্তকিছু শেষ করা সম্ভব হবে।

—হলেই ভাল। আমি পয়লা তারিখে দোকান স্টার্ট করতে চাই। প্রশান্তকে সেকথাই বলে রেখেছি। মনে রেখ, দিন পনেরোর বেশি সময় হাতে পাচ্ছি না।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চৌধুরীমশাই।

—তোমাকে আর আটকাব না। শুয়ে পড় গিয়ে।

বিকাশবাবু ড্রইং-রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ চৌধুরীর স্বর্গীয়া স্ত্রীর একমাত্র ভাই উনি। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। ছাঁদনাতলায় দাঁড়াবার স্পৃহা তাঁর আজ পর্যন্ত হল না। কোন মার্কেনটাইল ফার্মে ভাল চাকরি করেন। ভগ্নীপতির বিশেষ অনুরোধে থাকেন এই বাড়িতেই। ডাঃ চৌধুরীর অনেক কাজই তিনি করে দেন। বর্তমানে যেমন,

প্রশান্ত মুখার্জীকে পাটনায় নিয়ে যে ওষুধের দোকান হবে, তার প্রাথমিক কাজকর্ম গুছিয়ে দিচ্ছেন। ভাগনেরাও তাঁকে বিশেষ পছন্দ করে।

বিকাশবাবু চলে যাবার পর আরো কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইলেন ডাঃ চৌধুরী। তারপর সোফা ছেড়ে উঠলেন। প্রতিদিনকার মত আজও দু'পেগ হুইস্কি খাবেন, বই পড়বেন কিছুক্ষণ, শুতে যাবেন তারপর।

ডাঃ চৌধুরীর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রভাত ছুটেছিল চঞ্চলের ঘরের দিকে। তাকে এতবড় সংবাদটা না শুনিয়ে স্থির থাকতে পাচ্ছিল না। চঞ্চল তখনও শুয়ে পড়েনি। বন্ধুর হাবভাব দেখে অবাক না হয়ে পারল না। প্রভাত ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে বলার পর বলল, জাতের জোরে তুই যেন সমস্ত বেড়া টপকে এলি।

—তাই তো দেখছি।

—কাকাবাবু বললেন, মেয়েটি দুর্গা প্রতিমার মত দেখতে।

মৃদু হেসে চঞ্চল বলল, আমাকে এবার উঠে পড়ে লেগে তোর জন্য লক্ষ্মী-প্রতিমা খুঁজে বার করতে হবে।

দুজনের মধ্যে অনেক সরস আলোচনা হল। চঞ্চল প্রতিমাকে এবাড়িতে দেখেছে জানালো বন্ধুকে। বাবার যখন ইচ্ছে তখন গিয়ে আরেকবার স্বচ্ছন্দে দেখে আসা যায়।

নিজের ঘরে গিয়ে প্রভাত শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দে। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল প্রভাত। বালিশের পাশেই রিস্টওয়াচ রেখেছিল দেখল, সাড়ে দশ।

এক ঘুমেই সকাল হয়ে গেছে। শরীরও হয়ে উঠেছে বেশ ঝরঝরে। কাকাবাবুর ওষুধ ভালভাবেই কাজ করেছে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরকম বেয়াড়াভাবে দরজা ধাক্কাধাক্কি করছে কে? পা চালিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলে দিতেই দেখল চঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তার চুল উস্কখুস্ক। মুখ সাদা। অত্যন্ত বিচলিত। গুরুতর কিছু না ঘটে থাকলে এমন হওয়ার কথা নয়।

—কি হয়েছে?

—বাবা—বাবা মারা গেছেন প্রভাত।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল চঞ্চল।

এই শোচনীয় সংবাদে প্রভাত স্তব্ধ হয়ে গেল।

শেষে তার মুখ থেকে কোন রকমে বেরুল, সে কি! কাল রাত্রেও তো সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন বলে মনে হল।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চঞ্চল বলল, এমন যে হবে ভাবাই যায় না। স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও কথা ছিল। আমার তো মনে হল পটাসিয়াম সাইনাইড বা ওই জাতীয় কিছু ওঁর পেটে গেছে।

—সাইনাইড! তুই বলতে চাইছিস—

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রভাত এবার কি বলবে ভেবে পেল না।

একটু অপেক্ষা করে ধীর পায়ে এগুলো ডাঃ চৌধুরীর ঘরের দিকে। সেখানে তখন বাড়ির সকলে উপস্থিত রয়েছেন। চাকর-বাকররা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে করিডরে। প্রভাত গিয়ে দেখল, মেঝের উপর পাশ ফেরা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন গৃহকর্তা। ভাঙ্গা কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর চারপাশে। মনে হয় কাচের গেলাসের ভাঙ্গা অংশ ওগুলো।

কিছু জলীয় পদার্থ গড়িয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। যদিও চঞ্চল দেহ পরীক্ষা করেছে তবুও এই পাড়ার ডাঃ ঘোষকে ডেকে আনা হয়েছিল। তিনি এতক্ষণ মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলেন। এবার মুখ তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

বললেন তিনি, অনুমান মিথ্যা নয়। পটাসিয়াম সাইনাইডই মৃত্যুর কারণ। মনে হয় হুইস্কির সঙ্গে মিশেই ওটা পেটে গেছে। আর সময় নষ্ট করবেন না। এখনই আপনারা পুলিশে খবর পাঠান।

কাঁপা গলায় নির্মল বলল, পুলিশ! কিন্তু—

—এই পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হবে না। পুলিশে খবর না দিলে আপনারাই অসুবিধায় পড়বেন।

—বাবা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন—ভারি গলায় কমল বলল, বাবার মত লোক আত্মহত্যা করবেন ভাবাই যায় না।

—এটা আত্মহত্যা নয় দাদা।

সকলে চমকে মুখ ফেরালো।

দরজার ফ্রেমের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে চঞ্চল।

—কি বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি। এটা আত্মহত্যা নয়—খুন। বাবার মত লোক আত্মহত্যা করবেন অথচ একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে যাবেন না, এ হতে পারে না। তাছাড়া কোন্ দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করবেন?

অচল বলল, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, দরজা ভেতর দিক থেকেই বন্ধ ছিল। আমরা পাল্লা ভেঙ্গে তবে ঘরে ঢুকতে পেরেছি। হত্যাকারী কোন্ পথ দিয়ে ভেতরে গিয়ে কাজ সেরে আবার বেরিয়ে এসেছে বলো?

—বলতে পারব না।

একটু থেমে চঞ্চল আবার বলল, কোন ঘোরাল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার

পক্ষে সম্ভব নয়। মন বলছে বাবা আত্মহত্যা করেন নি। উনি যেভাবে পড়ে আছেন তাতেও আমার ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। মামা আর দাঁড়িয়ে থেকো না। পুলিশকে খবর দাও।

বিকাশবাবু টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিপুল মণ্ডল এসে পড়লেন সদলবলে। এসেই হুঙ্কার ছাড়লেন কয়েকবার। ভ্রূ-কুঁচকে জানিয়ে দিলেন এ ঘরে এত ভিড় তিনি বরদাস্ত করবেন না। খুনের কেস যদি হয়, সূত্রটুত্র যা ছিল সমস্ত লোপাট হয়ে গেছে।

...প্রভাত আর ভাবতে পারে না। চুপ করে বসে থাকে চেয়ারে। তাঁর মত মানুষকে যে কেউ খুন করতে পারে ভাবাই যায় না। ওধারে তখন বিপুল মণ্ডল ডাঃ চৌধুরীর খাস বেয়ারাকে নিয়ে পড়েছেন।

বিপদের গন্ধ প্রথমে সে ই নাকি পেয়েছিল। প্রতিদিনকার মত আজও সকালে চা নিয়ে গিয়েছিল কর্তার কাছে। আজ আবার একটু সকাল সকালই গিয়েছিল। সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাবেন গত রাত্রেই তাকে জানিয়ে রেখেছিলেন।

অনেক ডাকাডাকি করেও সে দরজা খোলাতে পারে নি। এমন অবস্থা হবার কথা নয়। চিরকালই তিনি খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠেন। চা না পাওয়া পর্যন্ত বইটই পড়েন। বেয়ারা তখন বাধ্য হয়ে কমলকে গিয়ে খবর দেয়। কমল আর কোন উপায় না দেখে সকলের সহযোগিতায় দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

বাসব নড়ে চড়ে বসল।

পাইপ নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নেবার পর দীর্ঘ টান দিয়ে তাকাল মিঃ সামন্তর দিকে। ধোঁয়ার হাল্কা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে হোমিসাইড স্কোয়াডের সুবিখ্যাত অফিসারটিকে কিছুটা ঝাপসাই দেখাল।

সামন্ত বললেন, পথ ভুলে যখন আমার কাছে এসে পড়েছেন তখন চলুন একবার ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে আসবেন। হাতে বোধহয় এখন কোন কেস নেই।

—না, বেকারত্ব চলেছে। যাওয়া যেতে পারে। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগে ব্যাপারটা আমায় আগাগোড়া খুলে বলুন ?

—সত্যি কথা বলতে কি খুলে বলার মত তথ্য আমার হাতে নেই এখনও পর্যন্ত। নিহত ব্যক্তি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। কাজেই স্থানীয় থানার হাতে কেসটা আর রাখা যাচ্ছে না বলেই আমাকে নাক গলাতে হয়েছে।

হাতে সময় থাকলেই বাসব লালবাজারে বেড়াতে চলে আসে। আজও এসেছিল বেলা বারটা আন্দাজ। এ-কথা সে-কথার পর সামন্ত বললেন ডাঃ চৌধুরীর খুন হয়ে যাওয়ার কথা। উপর থেকে চাপ আসায় হোমিসাইড স্কোয়াড যে তদন্তে নেমে পড়েছে তাও জানালেন।

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, খুন সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হলেন কি ভাবে?

—পোস্টমর্টমের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সাইনাইড মেশানো হুইস্কি ডাঃ চৌধুরী খেয়েছিলেন। বডির পজিশন দেখে মনে হয়েছে এক চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। ভাঙ্গা গেলাসের টুকরোতে হুইস্কি আর সাইনাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে। যে বোতল থেকে পানীয় গেলাসে ঢালা হয়েছিল সেটা ছিল টিপয়ের উপর। তাতে অর্ধেক মাল ছিল তখনও। বোতল পরীক্ষা করে জানা গেছে তাতেও সাইনাইড মেশানো রয়েছে?

—উনি কি নিয়মিত ড্রিঙ্ক করতেন?

—পাঁড় মাতাল বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য উনি ছিলেন না। প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোবার আগে দু'পেগ করে খেতেন। এই অভ্যাস ছিল তাঁর দীর্ঘ দিনের।

—ওই অভ্যাসকে কাজে লাগিয়েছে হত্যাকারী। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, কোন এক সময় ওঁর অনুপস্থিতিতে সে ঘরে ঢুকে হুইস্কির বোতলে সাইনাইড মিশিয়ে দেয়। কারণ তার অজানা ছিল না, ডাঃ চৌধুরী শুতে যাবার আগে দু'পেগ খাবেনই অভ্যাস মত। এই সূত্রে দুটি বিষয় আমাদের সামনে এসে পড়ছে।

—কোন্ বিষয়?

—এক, হত্যাকারী এমন একজন লোক যার পক্ষে ডাঃ চৌধুরীর ঘরে যখন তখন যাবার স্বাধীনতা আছে। দুই, সাইনাইড এমন একটা বস্তু যা পয়সা ফেললেই বাজার থেকে সংগ্রহ করা যায় না। পারমিটের দরকার হয়। এবং ওই পারমিট যে কেউ পেতে পারে না। সুতরাং ধরে নিতে হবে হত্যাকারী এমন একজন ব্যক্তি যার সাইনাইড সংগ্রহ করার সহজ পন্থা জানা আছে।

—আপনি বলতে চাইছেন সে একজন ডাক্তার?

বাসব মৃদু হাসল।

—এই মুহূর্তে আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে চাইছি না। তবে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ভিকটিম নিজেও একজন ডাক্তার ছিলেন। ও-সমস্ত কথা এখন থাক। আপনার সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাবার আগে সকলের স্টেটমেণ্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চাই। স্টেটমেণ্টের কপি নিশ্চয় আছে।

—আছে।

সামন্ত একটা ফাইল বাড়িয়ে দিলেন।

—এতেই আছে ডাঃ চৌধুরীর বাড়ির সকলের এজাহার।

বাসব ফাইলটা হাতে নিল।

পড়তে আরম্ভ করল মন দিয়ে। বক্তব্যের সারাংশ নিম্নরূপ:

দেবীপদ বাউরী

ডাঃ চৌধুরীর খাস বেয়ারা। বয়স পঞ্চাশ। বীরভূম জেলার মল্লারপুরের অধিবাসী। এ বাড়িতে পনেরো বছর কাজ করছে। তার সঙ্গেই ডাঃ চৌধুরীর শেষ দেখা হয়। ঘড়ি সে দেখেনি। মনে হয় তখন রাত সাড়ে দশটার কম হবে না। তিনি তখন ড্রইংরুম থেকে শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। দেবীকে দেখেই উনি বলেন সকাল ছটার মধ্যেই যেন তাঁকে চা দেওয়া হয়। সাড়ে ছটায় বেরিয়ে যাবেন।

প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানায়, মদের বোতল প্রয়োজন হলে সেই বাজার থেকে কিনে এনে দিত। তবে কোনদিন কর্তাকে সে মদ খেতে দেখে নি। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি খেতেন। সোডার দরকার পড়তো না। আধাখালি যে বোতলটা ঘরে পাওয়া গেছে, ওটাও সে কিনে এনে দিয়েছিল ধর্মতলার সোমরাজ অ্যাণ্ড সন্স থেকে।

কমল চৌধুরী

বিবাহিত। ডাঃ চৌধুরীর বড় ছেলে। ডায়নিংরুমেই তাঁর সঙ্গে ডাঃ চৌধুরীর শেষবার দেখা হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি নিজের ঘরে চলে যান। দশটা কুড়ি আন্দাজ সময় তিনি একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। বাথরুমের জানালা দিয়ে তিনি বাগানে একজনকে দেখতে পান। তাকে কপিল শীল বলেই মনে হয়েছিল। বাকি রাতটা তিনি নিজের ঘরেই ছিলেন।

নির্মল চৌধুরী

ডিনারের পর তিনি ড্রইংরুমে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, এমন সময় কপিল শীল এসে উপস্থিত হয়। দালাল শ্রেণীর এই লোকটা ডাঃ চৌধুরীর কাছে যাওয়া আসা করে কারুর অজানা নয়। বাড়ির লোকরা তাকে দেখলে বেশ বিরক্ত হয়। কপিল আসার পর তিনি ড্রইংরুমে আর অপেক্ষা করেন নি। নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। ঘুম ভেঙেছে একেবারে সকালে ডাঃ চৌধুরীর ঘরের সামনে যে চেঁচামেচি হচ্ছিল তার শব্দে।

অচল চৌধুরী

ডিনারের কিছুক্ষণ পরে কপিলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সাধারণভাবে দু'চার কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তারপর কপিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের ঘরে যাবার সময় তিনি ড্রইংরুমে ডাঃ চৌধুরীকে দেখেন—বসে বসে সিগার টানছিলেন। তিনি ঘরে পৌঁছাবার পর আরো আধ ঘণ্টাটাক্ জেগেছিলেন, শুয়ে পড়েন তারপর। ডাঃ চৌধুরী যে প্রত্যহ দু'পেগ করে হুইস্কি খান একথা বাড়ির সকলেরই জানা ছিল।

চঞ্চল চৌধুরী

ডিনারের পর ডাঃ চৌধুরীর ঘরে গিয়েছিলেন তাঁর আহ্বানে। সঙ্গে ছিল বন্ধু প্রভাত। প্রভাতকে ওখানে রেখেই তিনি নিজের ঘরে চলে যান। কিছুক্ষণ পরে প্রভাত তাঁর কাছে আসে। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে গল্প হয়। সে চলে যাবার পর তিনি শুয়ে পড়েন। সারা রাতের মধ্যে আর একবারও ঘর থেকে বেরোন নি।

বিকাশ ঘোষাল

ডাঃ চৌধুরীর একমাত্র শ্যালক। গত কার্তিকে বয়স চুয়াল্লিশ পার হয়ে গেছে। আদি বাড়ি বরাহনগরে। ভগ্নিপতির অনুরোধে গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়িতেই আছেন। ট্যালবর্ট অ্যাণ্ড মরিসের পদস্থ কর্মচারি। রাত দশটার পর ড্রইংরুমে ডাঃ চৌধুরী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অচলের বিয়ের ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল। ওষুধের দোকান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। তারপর তিনি নিজের ঘরে চলে যান। কপিলকে তিনি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছিলেন। মনে হয়েছিল সে যেন কারুর সঙ্গে কথা বলছে।

প্রভাত রায়

চঞ্চল চৌধুরীর বন্ধু। সকালের ট্রেনেই জামসেদপুর থেকে কলকাতা এসেছিলেন। ডাঃ চৌধুরী নিজের বন্ধুকন্যাকে চঞ্চলের জন্য মনোনীত করেছিলেন—এই সম্পর্কে ওর ঘরে বসে কথাবার্তা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তারপর চঞ্চলের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটান। শুতে যান এগারটা বাজার বেশ পরে।

কমল চৌধুরীর স্ত্রী অলকা, ড্রাইভার এবং অন্যান্য বেয়ারার এজাহারের উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফাইল মুড়ে রাখল।

—সত্যি কথা বলতে কি ঘোষাল কোন সূত্র চোখে পড়ল না। আচ্ছা,

ওই কপিলের সন্ধান করতে পেরেছেন ?

সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। তাকে খুঁজে বার করা হয়েছে। নানা ধরনের কাজ করে সে পেট চালায়। আমাদের জানিয়েছেন, ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। সেদিন সে তাঁর ছেলেদের বিয়ে সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, এই বিয়ে বিয়ে কথাটা বড় বেশি এসে পড়ছে।

—হুঁ। আপাতদৃষ্টিতে কেসটা খুব ঘোরাল মনে হচ্ছে। তবে এমনও হতে পারে, হত্যার মোটিভ আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু আমাদের কাছে জলবৎ তরলং হয়ে যাবে।

—হয়তো আপনার কথাই ঠিক। মোটিভ নিয়েই আমাদের আগে মাথা ঘামাতে হবে। চলুন, এবার যাওয়া যাক। আর সময় নষ্ট করে লাভ কি ?

সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন।

পুলিশের নির্দেশে সকলেই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। পোস্টমর্টম হয়ে যাবার পর ডাঃ চৌধুরীর মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সৎকার করা হয়েছে। প্রশান্তবাবু এই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল এসেছিলেন। অচল তাঁকে খুব খাতির দেখিয়েছে। তিনি অবশ্য চঞ্চলের সঙ্গে বেশি কথা বলেছেন। তাকে যেতে বলেছেন তার বাড়িতে।

বাসব ও মিঃ সামন্ত ওখানে পৌঁছালেন বেলা দেড়টার সময়। বিপুল মণ্ডল তখন আরেক দফা ডাঃ চৌধুরীর ঘর সার্চ করছেন। কপিলকে অবশ্য তিনি আজ সন্ধ্যার মধ্যে হাজতে পুরবেন। রাত এগারটায় সময় তার এ বাড়িতে উপস্থিতি ঘোর সন্দেহজনক। চাপ দিলে নিশ্চয় অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে।

বাসবের সঙ্গে বাড়ির সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন সামন্ত। বিপুল মণ্ডলের কাছে ব্যাপারটা বড়ই বেখাপ্পা লাগল। তাঁদের তদন্তের মধ্যে বে-সরকারী লোক নাক গলাক তিনি কখনই পছন্দ করেন না। কিন্তু উপায় কি ? উপরওয়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়।

বাসব চঞ্চলের সঙ্গে কথা বলাই প্রথমে পছন্দ করল। তারই ঘরে গিয়ে বসল। অবশ্য প্রভাতও রয়েছে।

—আচ্ছা চঞ্চলবাবু, প্রত্যেক ডিসপেন্সারিতেই কি পটাসিয়াম সাইনাইড রাখা হয় ?

—না। সরকার চালাও অনুমতি দেন না। তাছাড়া ও জিনিসটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া কাজে লাগে না।

—আপনার পারমিট আছে?

—না। বাবার ছিল।

—তিনি সাইনাইড নিয়ে কি করতেন?

—ইদানীং একটা কি বিষয় নিয়ে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন; ওতেই কাজে লাগতো। সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

—ওই মারাত্মক বস্তুটা তিনি রাখতেন কোথায়?

—চেম্বারে বোধহয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ সমস্ত ব্যাপারের আমি কিছুই জানি না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, আপনার বাবার চেম্বার কোথায়?

—এই বাড়ির সঙ্গে অ্যাটাচড। পুলিশ তালা দিয়ে রেখেছে।

বাসব আর কোন কথা না বলে পা বাড়াল। ড্রইংরুমে তখন কমল, নির্মল, অচল আর বিকাশ ঘোষালকে নিয়ে সামন্ত বসে আছেন। ছাড়াছাড়া ভাবে কথাবার্তা হচ্ছে। বিপুল মণ্ডলও আছেন ঘরে। একপাশে ভ্রূ-কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাসব ড্রইংরুমে ঢুকেই বলল, মিঃ সামন্ত, আমি একবার ডাঃ চৌধুরীর চেম্বারের ভেতরে যেতে চাই।

নিশ্চয়। মণ্ডল, ব্যবস্থা করুন।

মণ্ডল বললেন, আসুন—

—তার আগে আমি এঁদের সঙ্গে দু'চার কথা বলে নি। বাসবের দৃষ্টি সকলের মুখের উপর দিয়ে পিছলে গেল।—কারণ ছাড়া বড় একটা হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় না। আপনারা আঁচ করতে পেরেছেন কি ডাঃ চৌধুরীর মত মানুষের পক্ষে কেন খুন হওয়া সম্ভব।

বিকাশ ঘোষাল বললেন, আমরাও তো ভেবে থৈ পাচ্ছি না। চৌধুরী মশাই ছিলেন অজাতশত্রু। তাঁকে যে কেউ—

—তাছাড়া—কমল বলল, স্বার্থের গন্ধও এখানে নেই। বছর তিনেক আগে উইল করেছিলেন। নিজের সমস্ত কিছু যাতে আমরা চার ভাই সমান অংশে পাই তার ব্যবস্থা রেখেছেন।

—তাঁর ইদানীংকার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

—ইদানীং তিনি কি কোন ব্যাপারে খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন, এই কথাই আমি বলতে চাইছি।

বিকাশ ঘোষাল বললেন, ছুটো ব্যাপারে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বটে।

—কি বলুন তো ?

—ছেলেদের বিয়ে আর ওষুধের দোকানের—

—ডাঃ চৌধুরীর দোকান আছে নাকি ?

—নেই। তবে উনি এক বন্ধুকে পার্টনার নিয়ে ওষুধের ব্যবসায় নামছিলেন। আর দিন কয়েকের মধ্যে দোকান ওপেন হত।

—ওষুধপত্র কেনা হয়ে গিয়েছিল ? দেখাশুনার ভার ছিল কার উপর ?

—বলতে পারব না। খুলে তিনি আমাদের কিছুই বলেননি। আমাকে শুধু দোকান সাজাবার ব্যাপারে ডেকরেটর ঠিক করে দিতে বলেছিলেন।

নির্মল বলল, মামা ঠিক বলেছেন। এই ব্যাপারটা আমরা ভাসাভাসা জানতাম। উনি চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন।

—হুঁ। পার্টনার বন্ধুটির নাম কি ?

—প্রশান্ত মুখার্জী। ওঁরই মেয়ের সঙ্গে আমার ছোট ভাই-এর বিয়ে বাবা ঠিক করেছিলেন।

বাসব সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

—মিঃ সামন্ত, আপনি প্রশান্ত মুখার্জীর ঠিকানাটা নিয়ে রাখুন। আমি চেম্বার থেকে ঘুরে আসছি।

রুগীদের অপেক্ষা করার বড়সড় হলের শেষ প্রান্তে ডাঃ চৌধুরীর চেম্বার। বিপুল মণ্ডল তালা খুলে দিতেই বাসব ভেতরে ঢুকল। চারদিক তাকিয়ে নিল একবার। একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের এই রকম চেম্বার হওয়াই বোধহয় স্বাভাবিক।

একপাশের দেওয়ালের সমস্তটাই আলমারি দিয়ে ঢাকা। কাচের উপর কোন তাকে কি জাতীয় ওষুধ আছে তার লেবেল লাগানো। বাসব এগিয়ে গেল 'পয়জন' লেখা তাকের দিকে। আশ্চর্যের বিষয় আলমারির টানা পাল্লাতে তালা লাগানো নেই। পাল্লা সরিয়ে বাসব ভেতরে উঁকি মারল। পটাসিয়াম সাইনাইডের চ্যাপ্টা শিশিটা ওর চোখে পড়ল। অবশ্য বুঝতে পারা গেল না তা থেকে কিছুটা বার করে নেওয়া হয়েছে কিনা।

বিপুল মণ্ডল কপাল কুঁচকে বাসবের কার্য-কলাপ দেখছিলেন। এবার বললেন, আলমারির মধ্যে কিসের সন্ধান করছেন ?

—হত্যাকারীর।

পাল্লা টেনে দিয়ে বাসব টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। আধুনিক কায়দায় তৈরি সুদৃশ্য টেবিল। একধারে তিনটে দেরাজ আছে। রিভলভিং চেয়ার তার পাশে। টেবিলের অপর প্রান্তে তিনখানা সাধারণ চেয়ার।

—দেরাজের চাবি আপনার কাছে আছে ?

বিপুল মণ্ডলের কাছে ছিল। চাবির গোছা ডাঃ চৌধুরীর ড্রেসিং

গাউনের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। তবুও তিনি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না।

—চাবি কি করবেন ?

—দেরাজগুলো দেখবো।

—ওখানে কি—

—হত্যাকারী লুকিয়ে থাকতে পারে।

গমগমিয়ে গেলেও বিপুল মণ্ডল কিছু বলতে পাচ্ছেন না। উপরওয়ালারাই এই লোকটাকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন। তিনি পকেট থেকে চাবির গোছা বার করেন। একটু চেষ্টার পর প্রথম দেরাজটা খুললেন।

বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভেতরটা পরীক্ষা করল। পার্কার পেন, প্যাড, তিনখানা চেক বই। আলাদা আলাদা ব্যাঙ্কের। কার লাইসেন্স, একশ, দশ আর পাঁচ টাকা নোট খানদশেক, আর রয়েছে রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে জড়ানো কয়েক সিট কাগজ। বাসব প্রথমে চেক বইগুলো তুলে নিল।

রিভলভিং চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মারা যাবার একদিন আগেকার তারিখে দুটি ব্যাঙ্ক থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তুলেছেন। চেকের ফয়েলে লেখা আছে 'মেডিসিন অ্যাকাউন্ট'। চেক বইগুলো রেখে বাসব ব্যাণ্ড দিয়ে জড়ানো কাগজের সিটগুলো তুলে নিল।

বাইশ সিট কাগজ রয়েছে। ওষুধের লিস্ট করা হয়েছে। কোম্পানী অনুসারে লিস্ট করা হয়েছে। সমস্তই থোক ওষুধ। বুঝতে পারা যায়, যে দোকান ডাঃ চৌধুরী খুলতে যাচ্ছিলেন তারই প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই সমস্ত ওষুধ দরকার ছিল। প্রত্যেক ওষুধের পাশে দামও লেখা রয়েছে। আসল লিস্ট অবশ্য এটা নয়, কার্বন কপি।

বাসব অনেকক্ষণ লিস্টের পাতা নাড়াচাড়া করল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আনমনে ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ওর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাইতো—। প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সবে মাত্র কলমের দিকে হাত বাড়িয়েছে—

—আপনার হল ?

—দেরি হবে।

—কি যে করছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—না-বুঝতে পেরে থাকলে আমি নিরুপায়। মোট-কথা আমার আরো কিছু সময় লাগবে।

বাসব এবার ওষুধের দাম লিস্ট দেখে প্যাডের কাগজে টুকে যেতে লাগল। সমস্ত টোকা হয়ে যাবার পর যোগ করার পালা। যোগ শেষ করতে সময় মন্দ লাগল না। মোট হল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ ডাঃ চৌধুরী

পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তুলেছিলেন ওষুধ কেনার জন্য।

ওষুধ কি কেনা হয়েছিল? যদি কেনা না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ আকার নিতে আরম্ভ করেছে। বাসব ওষুধের লিস্টটা পকেটস্থ করে উঠে পড়ল রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে। তারপর বিপুল মণ্ডলকে সচকিত করে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ড্রইংরুমে তখনও সকলে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। বাসব ঘরে প্রবেশ করে কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করল, নতুন দোকানের জন্য ওষুধপত্র কেনা হয়েছে কি না আপনারা কেউ বলতে পারেন?

জানা গেল কেউই এ সম্পর্কে কিছু জানেন না।

—আচ্ছা, উনি কি নিজেই গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনতেন?

কমল বলল, তিনি টাকা জমা দিতে বা তুলতে কখনই ব্যাঙ্কে যেতেন না। রুগী দেখতে দেখতেই তো তাঁর বেলা কিনটে বেজে যেত। যাবেন কখন?

—কে যেত?

—আমাদের চেক ভাঙাতে দিতেন। দেবী টাকা জমা দিয়ে আসতো।

—ওঁর খুন হওয়ার আগের দিন আপনাদের কাউকে উনি চেক ভাঙাতে দিয়েছিলেন?

কাউকে দেননি জানা গেল।

বাসব বলল, মিঃ সামন্ত উঠুন। রহস্যের কূলে আমরা এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। সময় হাতে নেই, পাঁচটা বাজার আগে সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে। আমরা আবার সন্ধ্যার সময় ফিরে আসছি। মনে হয় তখন আপনাদের আসল কথাটা শোনাতে পারব।

বারান্দার ঘড়িতে সশব্দে আটটা বাজল। বিপুল মণ্ডল অন্ধকার কোর্ট ইয়ার্ডে পায়চারি করছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সেই দুপুর থেকে এবাড়ি ছেড়ে একবারও বাইরে পা দিতে পারেন নি। ড্রইংরুমে তখন বাড়ির সকলে উপস্থিত। কথাবার্তা বিশেষ হচ্ছে না।

এই সময় সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বিপুল মণ্ডলও দেখা দিলেন পিছু পিছু। বাসব সোফায় বসে ধীরে সুস্থে পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সকলের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগল। ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

—এই তদন্তের মধ্যে আমার এসে পড়া সম্পূর্ণ আকস্মিক।—বাসব বলতে আরম্ভ করল, মিঃ সামন্ত আমার পুরানো বন্ধু। এক সঙ্গে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করেছি। কাজেই এবারও আমায় এগিয়ে আসতে হল। এবার আসল কথায় আসা যাক। আপাতঃদৃষ্টিতে ডাঃ চৌধুরীর হত্যাকাণ্ড

গভীর রহস্যে ঢাকা মনে হলেও, আমরা তদন্ত করার পর বুঝেছি এর চেয়ে সহজ কেস আর হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে, এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সে ভেবেছিল, হত্যাকাণ্ডের মোটিভ মোটেই বুঝতে পারবে না কেউ।

হত্যাকাণ্ডটাকে অন্য লাইটে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর মোটিভ যখন বুঝতে পারা যাচ্ছে না তখন তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, হত্যাকারীর এই আত্মতুষ্টি আমরা ছত্রখান করে দিয়েছি। মোটিভ কি তা বুঝতে পারা গেছে, সেই সঙ্গে চিনতে পারা গেছে তাকে। অর্থ অহরহ অনর্থ ঘটাচ্ছে। এখানেও সে-ধারা যথানিয়মে বজায় থেকেছে। পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার জন্য ডাঃ চৌধুরী তাঁর এক প্রিয়জনের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

বাসব থামল।

কারুর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। সে আরম্ভ করল আবার—ডাঃ চৌধুরী ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। নতুন দোকানের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনা, পাঁচটা কোম্পানী ঘুরে বিরাট তালিকার সমস্ত ওষুধ সংগ্রহ করা ইত্যাদি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ওষুধের লিস্ট আর দুটি চেক এমন একজনকে দিয়েছিলেন যে তাঁর বিশ্বাসভাজন। কিন্তু সেই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটি এত টাকা হাতে পাবার পর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। তার হয়তো জুয়া, রেস, মদ বা মেয়েমানুষের পিছনে ছুটতে থাকায় সর্বস্বান্ত অবস্থা, এই টাকায় নিজের পজিশন হয়তো বাঁচানো যায়—ঠিক কি কারণে এত টাকা তার দরকার পড়েছিল আমার জানা নেই। যাই হোক, এই সিদ্ধান্তে তাকে আসতে হল, ডাঃ চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নইলে টাকা নেওয়া চলে না।

চেম্বারের ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয়ই তার কাছে আছে। বোধহয় হত্যাকাণ্ডের আগের রাত্রে সে সাইনাইড কিছুটা চুরি করে আনে। ডাঃ চৌধুরী যখন চেম্বারে—বাড়ির অন্যান্য লোকেরা যখন অফিসে বা অন্যত্র ব্যস্ত তখন তার পক্ষে হুইস্কির বোতলে বিষ মিশিয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি। এরপরই অনিবার্য ফল ফলেছে।

বাসব রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল। পাইপ ধরিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে গেল সকলের উপর দিয়ে। সকলেই একাগ্র। মুখ গম্ভীর। মিনিট দুয়েক বাসব পাইপ টেনে গেল। তারপর—

—আমার সুদীর্ঘ গোয়েন্দা জীবনে এমন ছেলেমানুষী আর দেখিনি বলতে পারেন। স্থূল প্রমাণ হত্যাকারী এত ছেড়ে গেছে যাতে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আমি বলব কিভাবে তাকে আমরা

চিহ্নিত করলাম। লিস্টের কার্বন কপি নিয়ে সেই সমস্ত কোম্পানীর সেলস্ অফিসে গেলাম যেখান থেকে ওষুধ কেনার কথা ছিল। জানা গেল কোথাও অর্ডার প্লেস করা হয়নি। তারপর সেই দুই ব্যাঙ্কে যেতে হল, যেখানকার দুটো চেক ডাঃ চৌধুরী কেটেছিলেন। নিজে যখন যাননি তখন যাকে দিয়ে তুলিয়েছিলেন তার নাম চেকে পাওয়া যাবে। পুলিশের সাহায্যে সেই দুটো চেক দেখে নিতে অসুবিধা হয়নি। যিনি টাকা নিয়েছেন তার নাম দেখলাম। সুতরাং আমরা চিনতে পারলাম হত্যাকারী কে।

এতক্ষণ পরে চঞ্চল বলল, তার নাম কিন্তু আপনি করছেন না!

—বিকাশবাবু, আপনি অন্ততঃ বুঝতে পেরেছেন আমি কার কথা বলতে চাইছি।

—আমি!!!—আকাশ থেকে পড়লেন বিকাশ ঘোষাল। আমি কি করে বুঝবো?

—নিজেকে বাঁচাবার এই অপচেষ্টা এখন আর কেন? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনার কথা স্বীকার করেন নি। অথচ চেকে আপনার নাম রয়েছে, সই করে টাকা নিয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে।

—তা ..মানে...কোন কারণে আমি প্রথমে স্বীকার করতে চাইনি। কিন্তু টাকাটা এনে চৌধুরীমশাইকেই দিয়েছিলাম।

বাসব মৃদু হেসে বলল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে আরো হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না। টাকাটা আপনার ঘর সার্চ করে যে পাওয়া যাবে না তা আমরা জানতাম। কাজেই হানা দিতে হয়েছিল আপনার অফিসে, যে ঘরে বসেন সেখানকার আলমারির মধ্যে থেকে সমস্ত টাকাই পাওয়া গেছে। লুকিয়ে রাখার পক্ষে চমৎকার জায়গা, কি বলেন? প্রমাণ ছোট বড় আরো আছে। যথাসময়ে পুলিশ কোর্টে সে সমস্ত উপস্থিত করবে। মোট কথা, কাজটা বড় কাঁচা হাতের হয়ে গেছে!

বিকাশ ঘোষাল আর কিছু বলতে পারলেন না। বসে রইলেন মুখ নিচু করে। ঘরের অন্যান্যরা অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি তাদের চোখে জল্লাদের রূপ নিয়েছে।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

—মিঃ সামন্ত আমার তো আর কিছু করার রইল না। বাড়ি চলি। যাবার আগে অবশ্য একটা কথা বলে যাই। ঘণ্টা দেড়েক আগে প্রশান্ত মুখার্জীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর মুখে শুনলাম, আর্থিক অবস্থা ডাঃ চৌধুরীর প্রথম জীবনে ভাল ছিল না। বিয়ে করেছিলেন অতি সাধারণ ঘরে। তাঁর শ্বশুর অফিসের টাকা তছরূপ করায় দীর্ঘ মেয়াদের শাস্তি পান। এখানেই শেষ নয় পরে একজন রক্ষীকে খুন করে জেল থেকে পালাবার সময় গুলি খেয়ে

যারা যান। বিকাশবাবুর শিরায় শিরায় বইছে সেই বংশের রক্তের স্রোত। ডাঃ চৌধুরী তাঁকে যত ভাল ভাবেই মানুষ করার চেষ্টা করে থাকুন না কেন, ফল যে মোটেই শুভ হয়নি আপনারা দেখতেই পেলেন। প্রথম সুযোগেই নীল রক্ত ঠিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাসব দরজার দিকে এগুলো।

টয়কর্ণার

ঘড়ির দিকে তাকালেন পুরন্দর আচার্য।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে। এগারটার সময় অফিসে এসেছিলেন তিনি। এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে কাজ করেছেন। লাঞ্চের ব্রেকেও কাজ করেন কারণ বাড়ি থেকে খেয়েই তিনি এগারটার সময় অফিসে আসেন। ষাটের কোঠায় পা দিয়েছেন পুরন্দর অথচ তাঁর শরীরে বার্ধক্যের চিহ্ন মাত্র নেই। তাছাড়া ক্লান্তি জিনিষটাকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেননি।

হাত পা ছড়িয়ে হেলে বসলেন চেয়ারে। সিগার ধরালেন। কাজের শেষে এই অবকাশটুকু বেশ ভাল লাগে তাঁর। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর অনেক কিছুর সঙ্গে একটা চীনে মাটির পুতুল রাখা ছিল। ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ভারতীয় সৈনিকের মূর্তি। পুরন্দর আচার্যর 'টয়কর্নারের' সর্বাধুনিক নমুনা। টেবিলের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি মূর্তিটা তুলে নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। বিচিত্র হাসি খেলে গেল তাঁর মুখের উপর।

আজ পুরন্দর আচার্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, মূল্যবান রিভলভিং চেয়ারের কুশনে গা ডুবিয়ে নিজের কারখানার সর্বাধুনিক নমুনাকে নেড়েচেড়ে দেখছেন। মনের মধ্যে আজ কোন শঙ্কা নেই, নেই কোন ব্যাকুলতা। অথচ খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়। মাত্র বছর পনেরো আগে মাটির পুতুল তৈরি করে বিক্রি করার ব্যবসা ছিল তাঁর। কোন আটচালা পর্যন্ত ছিল না। বাগবাজার অঞ্চলের ফুটপাথের উপর পুলিশের বারবার গুঁতো খেয়ে নিজের কাজ তিনি নির্বিকারভাবে করে যেতেন। কাঠফাটা রদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মূর্তিগুলোকে সাধ্যমত সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করতেন।

কি সমস্ত দিনই গেছে পুরন্দরের জীবনে! কাজের শেষে এই অলস মুহূর্তে অতীতের কথা মাঝে মাঝে ভাবতে ভাল লাগে তাঁর। কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছেন। ট্রাইলাকের টাই কলারটা তিনি ঢিলে করে দেন। ঝুঁকে রেখে দেন মাটির পুতুলটা যথাস্থানে। টেবিলের উপরকার পুরু কাচের উপর তাঁর ছায়া পড়ে। সরে আসতে গিয়েও সরে আসেন না পুরন্দর। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন। মনে পড়ে যায় পনেরো বছরের আগেকার চেহারা। তখন তাঁর শরীরের পরতে পরতে মেদের সঞ্চার হয়নি। তখন একহারা ছিলেন, সুশ্রী ছিলেন।

সিগারে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে অতীতকে তিনি রোমন্থন করতে

আরম্ভ করলেন। বিরাট বিত্তশালী বাপের ছেলে না হলেও হা-ঘরের ছেলে তিনি ছিলেন না। ছোটবেলা থেকেই ভাল আঁকতেন। স্কুলের গণ্ডি পেরুবার পর আর্ট কলেজে প্রবেশ করবার অধিকারও পেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত ওলটপালট হয়ে গেল উনিশশো বিশে-র স্বদেশী আন্দোলনের সময়। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন বাবা। সংসারের হাল ধরবার লোক চলে যাওয়ায় অচল হয়ে গেল সংসার। আর্ট কলেজের শিক্ষা মুলতবী রেখে, চাকরির সন্ধানে সংসার সমুদ্রে সাঁতরে বেড়াতে লাগলেন পুরন্দর। কোথায় চাকরি। চাকরির সন্ধান করতে করতেই কেটে গেল বছর দেড়েক। ক্রমেই তিনি নিরাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। চাকরি তাঁর কোনদিন হবে না এই ধারনা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠতে লাগল। এই সময় একদিন হঠাৎ বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে দেখা হয়ে গেল চারুপ্রকাশের সঙ্গে।

চারুপ্রকাশ পুরন্দরের আর্ট কলেজের বন্ধু। কলেজ ছাড়ার পর দু'জনেরই প্রথম দেখা। অনেক কথা হল দুই বন্ধুর মধ্যে। পুরন্দরের দুরবস্থার কথা শুনলেন চারুপ্রকাশ। বললেন, চাকরির মোহ যদি ছাড়তে পারো তবে তোমার একটা হিল্লে আমি করতে পারি।

—অর্থাৎ ?

—মাটির খেলনা তৈরি করবার ব্যবসা আরম্ভ করেছি। একা সামলাতে পারি না সবদিক। তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও তাহলে ব্যবসা আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে।

পুরন্দর চিন্তিত গলায় বললেন, পুতুল গড়তে আমি ভালই পারব। তবে কি জানো ব্যবসায় ফেলবার মত মূলধন তো আমার নেই ভাই।

—তবে দরকারও নেই। গঙ্গা থেকে মাটি সংগ্রহ করতে পয়সা লাগে না। মেহনত আমাদের নিজেদের। রং আর ক'টাকার খরচ হবে বলো না ? ছোট কাজ বলে এই ব্যবসাকে যদি ঘৃনা না করো তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও।

আর দ্বিরুক্তি করেননি, চারুপ্রকাশের সঙ্গে নেমে পড়লেন মাটির পুতুল তৈরির ব্যবসায়। তারপর কত বছর কেটে গেছে। বড়লোক হতে না পারলেও, কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে খেয়ে পরে বেঁচে থেকেছেন দুই বন্ধুতে। বিয়ে থাও করেছেন, ছেলেমেয়ের বাপও হয়েছেন দু'জনে। দেশ স্বাধীন হবার পর অভাবনীয়ভাবে তাঁদের ভাগ্য খুলে গেল। সেদিন একাই মূর্তিগুলোতে রং ধরাচ্ছিলেন পুরন্দর। চারুপ্রকাশ ছিলেন না, কোথায় গিয়েছিলেন যেন। এই সময় দামী একটা মোটরকার এসে থামল। মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত একজন নেমে এলেন মোটর থেকে। তাঁর হাতে মাটির একটা মূর্তি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এই মূর্তিটা তৈরি করেছ ! বিনীতভাবে পুরন্দর বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এরপর ভদ্রলোক তাঁকে নিজের গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে অনেক কথা বললেন! যার সারমর্ম হল, ভদ্রলোক একজন মার্কিন সংস্থার পদস্থ কর্মচারি। আগামী মাসে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতে নিজেদের মণ্ডপ সাজানোর জন্যে একজন মৃৎশিল্পীর প্রয়োজন। পুরন্দরের শিল্পকর্ম তাঁর পছন্দ হয়েছে। এই ধরনের নিখুঁত হাতেরই তাঁর প্রয়োজন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি এখানে এসেছেন ওকে দিল্লী নিয়ে যাবার জন্যে। অবিলম্বে কথা পাকা হয়ে গেল। মার্কিন সংস্থার মণ্ডপে মাটির লতাপাতা কেটে দেবার জন্যে মোটা টাকায় চুক্তিবদ্ধ হলেন পুরন্দর।

এরপরই ভাগ্য খুলে গেল। দিল্লীর শিল্প মেলায় তাঁদের শিল্পকর্ম উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হল। ভারতের নানা প্রান্তে ঘনঘন পুরন্দর ও চারুপ্রকাশের ডাক পড়তে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যেই মোটা টাকা সঞ্চয় করে ফেললেন দু'জনে। এই সময় শুধু মাটির নয় চীনেমাটির মূর্তিও তাঁরা তৈরি করেছিলেন। কি খেয়াল হল চীনেমাটি দিয়ে আরো ভালভাবে কাজকর্ম করবার জন্যে ছোটখাট একটা কারখানাই খুলে বসলেন। সেই ছোট কারখানা এখন বিরাট আকার নিয়েছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশের চাহিদা মেটাচ্ছে। এখন পুরন্দর একজন সুখী মানুষ।

কিন্তু এই সুখের মধ্যে একটু দুঃখও আছে। চারুপ্রকাশ এখন আর তার পাশে নেই। বছর কয়েক আগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।

ঝন্ঝন্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। চটকা ভাঙল পুরন্দর আচার্যর। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। রিসিভার তুলে নিলেন—হ্যালো···কে. সি. সান্যাল···তা যা বলেছেন মশাই ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোকেরা খোঁজখবর করলেই কেমন ভয় করে···কি বললেন··ভয়ের কথাই বলবেন আজ···ফরেনে মাল পাঠাচ্ছি অথচ সেই বাবদ কর দিচ্ছি না সরকারকে··· শিগ্‌গির নোটিশ আসছে আমার নামে···শুনুন মিঃ সান্যাল, ফরেনে আমরা মাল চালান দিই না। আমার মনে হয় আমার কোন শত্রুপক্ষ মিথ্যে করে এই সংবাদ আপনাদের কাছে পরিবেশন করেছে।···কি যে বলেন···এত বড় ব্যবসা করছি দু'চারটে শত্রু থাকবে না···সময় মত জানিয়ে আমাকে বন্ধুর কাজই করছেন, আমি সহজেই প্রমাণ করতে পারব সরকারকে ঠকাচ্ছি না, আমাদের কোন মাল বিদেশে যায় না···সন্ধ্যার পর আসছেন···আচ্ছা বাই-বাই···

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। সারা মন তেতো হয়ে উঠল। এই সমস্ত উটকো বিপদ সময় সময় মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। ফোন করছিলেন তাঁর এক বন্ধু। আয়কর বিভাগের কাছে নাকি সংবাদ পৌঁছেছে, তারা আয়কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে মাল চালান দিচ্ছেন। বন্ধু হিসেবে এই কথাই আগাম

জানিয়ে রাখলেন মিঃ সান্যাল। তাঁর উন্নতি দেখে অনেকেরই চোখ টাটাচ্ছে। তাদেরই মধ্যে কেউ যে এই মিথ্যে সংবাদ আয়কর বিভাগের কাছে পাঠিয়েছে সন্দেহ নেই।

ইন্টারকাম বোতাম টিপলেন পুরন্দর।

অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল, ইয়েস স্যার—

—বিনায়ক, দেখতো পলাশ নিজের ঘরে আছে কিনা।

—ঘণ্টাখানেক হল তিনি বেরিয়ে গেছেন স্যার।

বিনায়ক পুরন্দরের একান্ত সচিব।

—ও, রিয়া নিজের ঘরে আছে বোধহয়। ওকে বলো, আমি ডাকছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই রিয়া ঘরে এল। সুশ্রী, ক্ষীণাঙ্গী তরুণী। চারুপ্রকাশের মেয়ে। মারা যাবার আগে রিয়া ও তাপস—নিজেরই দুই ছেলেমেয়েকে পুরন্দরের হাতেই দিয়ে গেছেন চারুপ্রকাশ। রিয়া কারখানার ডিজাইন বিভাগের চার্জে আছে। তাপস এখনও কাজে যোগ দেয়নি, পড়াশুনা করছে। চারুপ্রকাশের মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ করে নেবেন স্থির করে রেখেছেন পুরন্দর। এ কথা সকলেই জানে। রিয়ারও অজানা নয়।

রিয়াকে দেখে পুরন্দর বললেন, তাপসের প্লেন ক'টায়?

—সাড়ে সাতটার সময়। আপনি এয়ারপোর্টে যাবেন কাকাবাবু?

—যাবার তো খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সলিসিটারের কাছে একবার না গেলেই নয়। অবশ্য তাপসের সংগে একবার আমি দেখা করে নেব। খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে নাকি?

মৃদু হেসে রিয়া বলল, মুখে অবশ্য খুব সাহস দেখাচ্ছে, তবে আমার মনে হয় এতটা পথ প্লেনে যেতে হবে ভেবে মনে মনে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

তাপস এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে জার্মানী যাচ্ছে। পুরন্দরই তাকে পাঠাচ্ছেন। রিয়ার চেয়ে বছর কয়েকের ছোট সে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। দূর অজানা দেশে যেতে সে স্বাভাবিক ভাবেই ভীত হচ্ছে।

পুরন্দর প্রশ্ন করলেন, পলাশ নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে যাচ্ছে?

মৃদু গলায় রিয়া বলল, বলেছে তো যাবে।

আরো দু-চার কথার পর তাকে সঙ্গে নিয়ে পুরন্দর আচার্য বেরুলেন অফিস থেকে। রিয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, তাপসের সঙ্গে দেখা করে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন। রিয়া ও তাপস মামা-মামীর সংগে আলাদা বাড়িতে থাকে।

তখন প্রায় সাড়ে চারটে।

নিজের ফিয়েট থেকে নেমে অফিসে প্রবেশ করল পলাশ।

দীর্ঘদেহী, সুরূপ পলাশ আচার্য পুরন্দরের একমাত্র সন্তান। লাঞ্চের পর অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, জরুরী একটা কাজ সেরে নিতে এখন ঘরে ফিরে এল। নিজের চেম্বারে প্রবেশ করে পলাশ ইন্টার-কমিউনিকেশন যন্ত্রের চাবি টিপল। অপর প্রান্ত থেকে দ্রুত ভেসে এল কণ্ঠস্বর, ইয়েস স্যার—

—রবীনবাবু একবার এ ঘরে আসুন।

রবীন সেন নোটবুক হাতে নিয়ে বসের ঘরে এল।

সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পলাশ বলল বাবা বেরিয়ে গেছেন?

—মিনিট কয়েক আগে বেরিয়ে গেলেন।

—রিয়াও বেরিয়ে গেছে বোধহয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই একই সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে গেলেন।

—একটা নোট নিন। আজকের ডাকেই চিঠিটা যাওয়া চাই।

খাতা ও পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল রবীন। পলাশ দ্রুত নোট দিল।

—টাইপ করে এখুনি পাঠিয়ে দিন চিঠিটা। অ্যাড্রেস করবেন নয়াদিল্লীর শিল্প দপ্তরকে। চিঠির ব্যবস্থা করেই ফিরে আসবেন, কাজ আছে। রবীন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরে এল মিনিট দশেক পরে। পলাশ ঘরময় তখন অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

রবীনকে দেখে বলল, গাড়ির চাবিটা নিন। আপনাকে এখুনি একবার মিঃ তালুকদারের বাড়িতে যেতে হবে।

সসঙ্কোচে রবীন বলল, সাতটার সময় আমার অন্যত্র একটা কাজ ছিল।

—আপনাকে বেশীক্ষণ আমি ব্যস্ত রাখব না। রুমাকে নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে। ইতিমধ্যে আমি ফোন করে দিচ্ছি। ও রেডি থাকবে।

রবীন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রুমাকে ফোন করল পলাশ। প্রস্তুত থাকতে বলল। আর দোটানায় থাকতে চায় না। পলাশ নিজে মনস্থির করে ফেলেছে। রিয়াকে বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। রুমার সঙ্গে দৈবাৎ যদি পরিচয় না ঘটে যেত আর সেই পরিচয় যদি ভালবাসায় রূপান্তরিত না হত, তাহলে রিয়াকে বিয়ে না করার কোন প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু…

অফিসের ছুটির পর এই চেম্বারে বসে কতদিন গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়েছে পলাশ ও রুমা। কেউ জানতে পারেনি, একমাত্র রবীন ছাড়া। আজকের মত গাড়ি পাঠিয়ে রবীনকে দিয়ে বহুবার ডাকিয়ে আনিয়েছে এখানে রুমাকে। আজ কিন্তু অন্যান্য দিনের মত গল্পগুজব করার মুড নেই পলাশের। সকালেই সংবাদ পেয়েছে, সামনের ফাল্গুনেই ওর বিয়ে নাকি দিয়ে ফেলতে চান পুরন্দর।

রুমা এলেই তার কাছে সরাসরি বিয়ের কথাটা পাড়বে। বিয়েতে রাজি

না হবার কারণ নেই রুমার। তারপর রাত্রে ডিনার টেবিলে বাবাকে জানিয়ে দেবে রিয়াকে ও বিয়ে করতে পারবে না। পৌনে ছ'টার সময় রুমা এল। অফিস তখন নিস্তব্ধ। রবীনকে ছেড়ে দিল পলাশ।

—তোমাকে কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে আজ? রুমা ধীর গলায় প্রশ্ন করল।

অল্প হেসে পলাশ বলল, গুরুগম্ভীর একটা কথার অবতারণা করব বলে।

—শুনি তোমার গুরুগম্ভীর কথাটা কি?

পলাশ রুমার চেয়ারের সামনে, টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয়. আমার বিয়ের এখনও সময় হয়নি?

রুমা খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল, হয়নি আবার? বলে পার হতে চলল।

—তোমারও নিশ্চয়ই বিয়ের বয়স হয়েছে?

—তাতো হয়েছেই।

পলাশের ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।—দেখা যাচ্ছে আমরা দু'জনেই বিবাহযোগ্য। কাজেই দু'জনের বিয়ে দু'জনের সঙ্গে সহজেই হতে পারে। কি বলো?

ছদ্মগাম্ভীর্যে রুমা বলল, আরম্ভ করেছিলে বেশ নাটকীয়ভাবে কিন্তু শেষের দিকটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

—কথাটাকে হাল্কা করে দিও না। আমি সিরিয়াসলি প্রশ্ন করছি, আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করলে?

—উহুঁ।

—রুমা—

দু'হাত দিয়ে রুমাকে কাছে টেনে আনল পলাশ।—আমি এঞ্জিনীয়ার মানুষ। এতদিনেও হয়তো নিজের মনের কথা সঠিক ভাষায় তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারিনি। তবে এটুকু তো বুঝতে পেরেছো আমি তোমাকে কত গভীরভাবে ভালবাসি। তোমার মতটা পেলেই বাবার কাছে আজ কথাটা পাড়তে পারি।

রুমা পলাশের কাঁধে মাথা রেখে বলল, গলা ফাটিয়ে না বললে বুঝি তুমি কিছু বুঝতে পারবে না?

পলাশ উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল, ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ হচ্ছে, ওর কাছে কেউ আসছে নাকি! রুমাকে ছেড়ে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল রিয়া। ওদের দু'জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল। পলাশের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে। ও কোন রকমে বলল, তুমি···

স্বাভাবিক গলায় রিয়া বলল, তাপসকে নিয়ে এই পথ দিয়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম তুমি

বোধহয় আছো। খোঁজ নিতে এলাম। যাবে?

—সাড়ে সাতটায় প্লেন তো? তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি।

রিয়া আর কিছু না বলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। রুমা রিয়াকে এই প্রথম দেখলেও তার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানা ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পলাশ বলল, যাক, ভালই হল। রিয়াকে আর পরিষ্কার করে কিছু বলতে হবে না। আমি একটা সঙ্কোচের বেড়া ভালভাবেই টপকে গেলাম। চলো, বেরিয়ে পড়ি। এই বন্ধ ঘরে থেকে সন্ধ্যাটা আর মাটি করব না।

যথাসময়ে প্লেন ছেড়ে গেল।

তাপসের মত রিয়ার মনও ভারি হয়ে উঠেছে। তিন বছর দেখা হবে না দু'জনের। তাপস স্টুটগার্ড যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে যাতে একখানা করে চিঠি দেয় বার বার সে কথা জানিয়ে রেখেছে। রুমাল দিয়ে নিজের ভিজে চোখ দুটো মুছে নিয়ে রিয়া কার পার্কের জায়গায় এসে দাঁড়াল। আসবো বলেও পলাশ এয়ারপোর্টে আসেনি।

অসংখ্য মোটরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মোটরগাড়ির অরণ্য থেকে নিজের গাড়িখানা উদ্ধার করা বেশ শক্ত হবে। একধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে খান দশেক ট্রাক। কুলীরা তার থেকে বাক্স ভর্তি মাল নামাচ্ছে। ট্রাকগুলোর পাশ দিয়ে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল রিয়া। প্যাকিং বাক্সের উপর বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'ফ্রান্স'। প্রেরকের জায়গায় 'টয়কর্ণার, ক্যানকাটা'।

কি রকম হল! তাদের কম্পানীর মাল ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে গেলেও বিদেশে যায় না? সামনের বছর বিদেশে মাল পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এই রকম স্থির করা আছে। তবে—। শাহ ডাঃ রিয়া কম্পানীর অন্যতম অংশীদার, হঠাৎ যদি বিদেশে মাল পাঠাবার বিষয় স্থিরও হয়ে থাকে, তাও তার অজানা থাকবার কথা নয়। এক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে কিছু না জানিয়ে করা হয়ে থাকে। কিন্তু একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না—অথচ মাল যে বিদেশে যাচ্ছে তার প্রমাণ চোখের উপর।

কুলীরা প্যাকিং বাক্স ট্রাক থেকে দ্রুতগতিতে নামাচ্ছে। এখুনি হয়তো কারগো কেরিয়ারে এগুলো রাখা হবে। "টয়কর্ণারের" একজন কর্মীকেও ঘোরাফেরা করতে দেখল দূরে রিয়া। নানা চিন্তা তার মনে ওঠানামা করতে লাগল। যে ট্রাক থেকে মাল নামানো হচ্ছে সেখানা তাদের নয়। এমন কি কোন প্লেন কম্পানীরও নয় প্রাইভেট কেরিয়ার। কি খেয়াল হতে ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে থেকে ডায়েরী বার করে ট্রাকের নম্বরটা টুকে রাখল।

তারপর গম্ভীর মুখে গিয়ে বসল নিজের গাড়িতে।

নটার কিছু পরে বাড়ি ফিরল পলাশ।

ছেলের অপেক্ষায় বই হাতে করে পার্লারে বসেছিলেন পুরন্দর। ও ফিরে এলে দু'জনে এক সঙ্গে ডিনার সারবেন এই ইচ্ছে নিয়েই অবশ্য অপেক্ষা করছিলেন। দু'জনে খাবার ঘরে এলেন। এই অবকাশে পলাশকে গুছিয়ে বলতে হবে নিজের মনের কথা। ঘাবড়ে গেলে চলবে না।

খেতে খেতে অফিস সম্বন্ধে দু'চার কথা হবার পর পুরন্দর প্রশ্ন করলেন, তাপসকে প্লেনে তুলে দিয়ে দমদম থেকে ফিরলে কখন ?

—আমি যাইনি এয়ারপোর্টে।

—কেন ?

—এমনি যাইনি।

ছেলেকে একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে গম্ভীর গলায় পুরন্দর বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, কিছুদিন থেকে রিয়াকে এভয়েড করছো।

—ওই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

—তোমার বক্তব্য যাই থাক, আসল কথা হল রিয়াকে তোমায় বিয়ে করতে হবে এবং সামনের মাসেই।

পলাশ সাহস সঞ্চয় করে বলল, ওকে বিয়ে করতে আমি পারব না।

হাউ ডেয়ার ইউ আর! আমার মুখের উপর এই কথা বলতে তোমার আটকালো না। কেন তুমি ওকে বিয়ে করতে পারবে না শুনি ?

—না…মানে…

—ননসেন্স। বুদ্ধি নামক পদার্থটা যদি তোমার মাথায় এক বিন্দু থাকতো, তাহলে এই হেজিটেশন আসতো না। রিয়াকে অন্য কেউ বিয়ে করলে, সেই লোক স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কম্পানীর একজন ডিরেক্টর হয়ে বসবে। সে কি রকম মেজাজের হবে কে জানে। আমাদের সঙ্গে যদি তার মতের মিল না হয়, গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। আমার রক্ত দিয়ে গড়া এই ব্যবসা ছারখার হয়ে যেতে পারে ? পাগলামিকে ঝেড়ে ফেলে দাও! আমি তোমাকে তিন দিন ভেবে দেখবার সময় দিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন পুরন্দর। অর্ধভুক্ত অবস্থায় খাবার ঘর ত্যাগ করলেন। বিপর্যস্ত মন নিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কয়েক মিনিট বসে রইল পলাশ। তারপর উঠে পড়ল। খাওয়া আর হল না।

পরের দিন যথাসময় অফিস এল পলাশ। রাত্রে যে ভাল ঘুম হয়নি মুখের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এখন রুমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। অফিসের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ও চলে যাবে

স্কটিশে। ওখানে দেখা করবে রুমার সঙ্গে। রুমা স্কটিশের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে।

এখন তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে নিতে হবে। ইণ্টার-কমিউনিকেশনের বোতাম টিপল পলাশ। ও প্রান্ত থেকে রবীনের গলা পাওয়া গেল, ইয়েস স্যার—

কিন্তু রবীনকে কিছু বলবার আগেই ওর দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে, রিয়া ঘরে প্রবেশ করল। যন্ত্রের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে এনে পলাশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। মনে মনে উদ্বিগ্ন হল। রিয়া ওর সামনের চেয়ারে বসে বলল, কাল তো তুমি গেলে না?

—একটা কাজে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে যাওয়া হল না।

—আমি অবশ্য জানতাম তুমি আসবে না।

—কাল সন্ধ্যার সময় যাকে এই ঘরে দেখে গেলে তার সম্বন্ধে মনে কোন আগ্রহ জাগছে না?

ফিকে হেসে রিয়া বলল, পুরুষদের চেয়ে এই সব ব্যাপারে আমাদের একটু আগ্রহ বেশি জানো তো। জেনে নেব ঠিকই। তবে তার আগে অন্য একটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আমাদের মাল কি ফ্রান্সে পাঠানো হচ্ছে।

—কই না তো। বিদেশে মাল চালান গেলে তুমি জানতে পারবে না?

—কিন্তু ফ্রান্সে আমাদের মাল যে চালান যাচ্ছে তার প্রমাণ কাল আমি দমদমে পেয়েছি।

ভ্রূ কুঁচকে পলাশ বলল, কি যা তা বকছো।

—যা তা নয়। নিজের চোখে দেখেছি, আমাদের লেবেল মারা বড় বড় প্যাকিং বাক্স ফ্রান্সে যাবার জন্যে 'বুক' হয়েছে। এমন কি সেখানে আমাদের একজন কর্মীকেও দেখলাম।

—বলো কি!! বাবাকে বলেছ এ কথা।

—এখনও বলিনি। তোমার কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে আগে এলাম।

ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে পলাশ বলল, হ্যালো···ও···আসছি এখুনি···

—আমি মিনিট কয়েকের মধ্যে আসছি। তুমি বসো। তুমি যা বললে তা অত্যন্ত গুরুতর কথা। ও বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

পলাশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুরন্দর আচার্য এই মাত্র অফিসে এলেন। তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। পলাশের ব্যবহারে তিনি সবিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ও যে রিয়াকে বিয়ে করতে

চাইবে না এ কথা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

সাহেবকে কামরায় ঢুকতে দেখেই বেয়ারা ছুটে এসেছিল। তাকে দেখে পুরন্দর বললেন, ছোট সাহেবকে সেলাম দাও।

তারপর কি মনে হওয়ায় বললেন, থাক। আমিই যাচ্ছি।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পলাশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পর পর তিনখানা ঘর। তিনি, পলাশ ও রিয়া অফিসের কাজে ব্যবহার করেন। স্প্রিংযুক্ত পুরু কাচের দরজা ভেজানো রয়েছে। পুরন্দর হাত দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যে অবিশ্বাস্য দৃশ্য তাঁর চোখের উপর ধরা দিয়েছে তা যেমন হৃদয়বিদারক তেমনি ভয়াবহ।

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পুরন্দর। এগুতে পাচ্ছেন না, পিছিয়ে যেতেও ভুলে গেছেন। পলাশ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, বাবা...

এই ডাকে সম্বিত ফিরে এল পুরন্দরের। ততক্ষণে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য পলাশের চোখে ধরা দিয়েছে। টেবিলের উপর মাথা রেখে পড়ে রয়েছে রিয়া। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। এরপর হৈ-চৈ পড়ে গেল অফিসে। পলাশের চেম্বারের সামনে কর্মীরা ভিড় করে এল। ছুটে এলেন কম্পানীর পেড ফিজিশিয়ান। রিয়ার শরীর পরীক্ষা করে বললেন, মারা গেছেন।

গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

পুলিশে সংবাদ দেওয়া হল। পুলিশ না আসা পর্যন্ত দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ভেঙ্গে পড়া মন নিয়ে পুরন্দর। আধ ঘণ্টার মধ্যে সদলে ইন্সপেক্টার সামন্ত এলেন। প্রবীণ অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারি। মৃতদেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর ঘরখানাও পর্যবেক্ষণ করলেন। দরজা ওই একটাই। জানলা আছে দুখানা। গরাদ লাগানো জানলা। পাল্লা খোলাই ছিল। সামন্ত গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। ঘরখানা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে হলেও সমতল থেকে হাত ছয়েক উঁচু জমির উপর তৈরি। সমতল জমিতে বড় বড় গাছ ও ঝোপঝাড়, জানলার কাছ থেকে সরে এলেন সামন্ত।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে আবার এসে দাঁড়ালেন। এখন আর মৃতদেহ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে না। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। হত্যাকারী যদি দরজা দিয়ে ঢুকে গুলি করে থাকে তবে গুলি পিছন দিকে লাগবার কথা। অথচ গুলি লেগেছে মাথার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। দরজা দিয়ে ঢুকে, পিছন থেকে সামনের দিকে এসে হত্যাকারী ভদ্রমহিলার মাথায় গুলি করেছে, এ কথাও ভেবে নেওয়া যায় না। কেউ রিভলবার হাতে সামনে একজনকে দেখেও মাথা পেতে দেবে গুলি খাবার জন্যে—তা হতে পারে না। বরং সে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখানে

সে রকম ঘটনা ঘটেনি। তবে কি হত্যাকারী জানলা দিয়ে গুলি করেছিল? জানলার প্রায় মুখোমুখি বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাই বা কিভাবে সম্ভব। সামন্ত লক্ষ্য করেছেন জানলার ওপাশে কোন কার্নিশ নেই। কিসের উপর দাঁড়িয়ে হত্যাকারী লক্ষ্য স্থির করেছিল?

চিন্তাকে আর তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। পরে ধীরস্থির ভাবে সমস্ত কিছু চিন্তা করে দেখবেন। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সকলের এজাহার নেওয়া। ফটোগ্রাফারকে আহ্বান করলেন। ঘরের ও মৃতদেহের গোটা কয়েক ছবি তুলল ফটোগ্রাফার। এরপর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে চালান দেওয়া হল। ঘরের দরজা সীল করে দিয়ে ইন্সপেক্টর সামন্ত পুরন্দরের চেম্বারে এলেন। পিতা-পুত্র তখন মুখোমুখি বসে। দু'জনেই নির্বাক। সামন্ত ঘরে প্রবেশ করে বললেন, বডি পোস্টমর্টেমে চালান দেওয়া হয়েছে। এখন আপনাদের একটু কষ্ট দেব। এজাহার দিতে হবে।

ভারি গলায় পুরন্দর বললেন, নতুন করে আমার কিছু বলবার নেই। রিয়ার মৃতদেহ আমি কিভাবে আবিষ্কার করলাম তা আপনাকে আগেই বলেছি।

—মৃতার পরিচয় আমার জানা দরকার। ও বিষয় কিছু বলুন।

পুরন্দর রিয়ার পরিচয় দিলেন। সে যে অত্যন্ত ভাল মেয়ে ছিল এবং তাকে যে তিনি পুত্রবধূ করবার মনস্থ করেছিলেন তাও বললেন। পরিশেষে তিনি শোকসন্তপ্ত গলায় জানালেন, রিয়ার মৃত্যুতে তাঁর বুক ভেঙ্গে গেছে। বন্ধুর কন্যা হলেও তাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তার মত মেয়ের শত্রু থাকতে পারে, সুদূর কল্পনাতেও একথা মনে স্থান পায়নি তাঁর।

পলাশ নিজের স্টেটমেন্টে বলল, রিয়া আর আমি কথা বলছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন আসতে আমি তাকে বসতে অনুরোধ করে ঘরের বাইরে যাই। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে দেখি বাবা দরজার গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর টেবিলের উপর মাথা রেখে মরে পড়ে রয়েছে রিয়া।

—টেলিফোন পেয়েই আপনি বেরিয়ে গেলেন কোথায়? সামন্ত প্রশ্ন করলেন।

—অফিসের কাছেই 'গ্রীন অ্যারো' নামে রেস্তোরাঁ আছে। ফোন এসেছিল ওখান থেকে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু ওখানে অপেক্ষা করছে সংবাদ পেয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার। ওখানে গিয়ে আমার বন্ধুকে দেখতে পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম ফোন করা হয়নি "গ্রীন অ্যারো" থেকে আমাকে।

—হুঁ। আপনার কি মনে হয়, হত্যাকারী ও ঘর থেকে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে নেবার জন্যই এইভাবে টেলিফোনের আশ্রয় নিয়েছিল?

—এখন আমার তাই মনে হচ্ছে।

এরপর পলাশের বেয়ারাকে ডাকা হল। সে নিজের বিবৃতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল, পলাশ বেরিয়ে যাবার পর ঘরে আর কাউকে সে ঢুকতে দেখেনি। সমস্তক্ষণ সে দরজার বাইরের টুলের উপর বসেছিল। তাছাড়া ঘরের মধ্যে থেকে কোন আওয়াজও তার কানে আসেনি।

রবীন, পুরন্দর আচার্যর সেক্রেটারি বিনায়ক ও অন্যান্য কর্মীরা বেয়ারাকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিল। কেউ কোন শব্দ পায়নি, কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখেনি। শব্দ না পাওয়ার অর্থ অবশ্য পরিষ্কার, হত্যাকারী সায়লেন্সার ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ঘরে না ঢুকে জানলার বাইরে কার্নিশ না থাকা সত্ত্বেও সে কিসের উপর দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল?

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের অনুমতি না নিয়ে কেউ যেন কলকাতার বাইরে না যান সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে তখনকার মত সদলে বিদায় নিলেন ইন্সপেক্টার সামন্ত।

দুশো একচল্লিশের কে হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিটের ঘরে তখন তর্কের তুফান চলেছে। বলাবাহুল্য তর্কের বিষয়বস্তু, চীন। ঘরে অবশ্য অনেক লোক নেই। বাসব ও শৈবালের মধ্যে তর্ক চলেছে।

বর্তমানে বাসবের হাতে কোন কেস নেই। দিন কয়েক আগে চণ্ডীগড় থেকে ফিরেছে। এক জটিল হত্যা তদন্তে নিযুক্ত হয়ে ওখানে গিয়েছিল বাসব। পাঞ্জাব পুলিশ কেসটা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল? বাসব সাফল্যের সঙ্গে সেই তদন্ত শেষ করেছে। হত্যাকারী এখন পুলিশ কাষ্টডিতে।

তর্কের অবস্থা যখন বেশ ঘোরাল তখন বাহাদুর এসে জানাল, দু'জন ভদ্রলোক সাক্ষাত করতে এসেছেন। বাসব ভদ্রলোক দুজনকে এখানে আনতে ইঙ্গিত করে বলল, তর্কটা আজকের মত এখানেই মুলতুবি থাক ডাক্তার। কালকে তোমাকে ঘায়েল করে দিতে পারব আশা করি।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, বাঙ্গে পয়েন্টে আমাকে কনভিন্স করা খুব সহজ হবে বলে তুমি মনে করে থাকলে ভুল করেছ।

বাহাদুরের সঙ্গে ভদ্রলোক দু'জন ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব দু'জনকে বসতে অনুরোধ করে বলল, বলুন, আপনাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন রবীন সেন। সে বলল, সুবিখ্যাত পুতুল প্রস্তুতকারক 'টয়কর্ণারের' নাম নিশ্চয় জানে থাকবেন। ওখানকার অন্যতম পরিচালক পলাশ আচার্যের আমি প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনিই আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমার নাম রবীন সেন।

—''টয়কর্ণারের'' নাম শুনেছি বইকি। আজ সকালেই খবরের কাগজে পড়ছিলাম যেন, ওখানে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়ে গেছেন।

—আমরা ওই সম্পর্কেই এসেছি। রবীন দ্বিতীয় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, এঁর ভগিনী রিয়াদেবী খুন হয়েছেন। তিনি কম্পানীর অংশীদার ছিলেন।

বাসব ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকায়নি, এবার তাকিয়ে দেখল, সমস্ত মুখ থমথম করছে। তিনি এবার বললেন, আমার ভগিনী আর ফিরে আসবে না তা আমি জানি। তবে যে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে আমি-লোকচক্ষের অন্তরালে থাকতে দিতে চাই না। পুলিশ অবশ্য যা করবার করছে। করুক। আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম রিয়া'র হত্যাকারীকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে। এই তদন্তভার আপনাকে নিতেই হবে বাসববাবু।

—আপনি উতলা হবেন না…। আপনার নামটা।

—শৈলেন বসু।

আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি শৈলেনবাবু। বাসব বলল, বর্তমানে আমি ফ্রি আছি। তদন্তভার গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কথা পুলিশকে জানিয়েছেন কি?

রবীন বলল, জানানো হয়েছে। পলাশবাবুই জানিয়ে রেখেছেন।

বাহাদুর চার কাপ চা দিয়ে গেল।

বাসব বলল, এবার আপনারা আমাকে ঘটনাটা বলুন। অবশ্য সমস্ত ঘটনাকে আমি দু'ভাগে ভাগ করতে চাই। প্রথম, রিয়াদেবী সংক্রান্ত সমস্ত কথা। দ্বিতীয়, দুর্ঘটনার দিনের কথা।

শৈলেনবাবু বললেন, রিয়ার সম্বন্ধে অবশ্য সমস্ত আমি বলতে পারব। তবে দুর্ঘটনার সময় আমি 'টয়কর্ণারে' উপস্থিত ছিলাম না, কাজেই ও-বিষয়ে আপনাকে রবীনবাবুই বলবেন। তিনি রিয়ার সম্পর্কে একে একে সমস্ত কথাই বললেন। এই প্রসঙ্গে চারুপ্রকাশ আর পুরন্দরের কথাও বাদ গেল না। পলাশের সঙ্গে যে তার বিয়ে স্থির হয়েছিল তাও বললেন।

রবীন দুর্ঘটনার দিনের কথা বলল। পুরন্দর কিভাবে মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। তারপর অফিসে কেমন হৈ-চৈ পড়ে গেল। টেলিফোন করে পলাশকে কেউ ওর ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাও বলল রবীন। বাসব চোখ বন্ধ করে শুনছিল। এবার বাসব বলল, মোটামুটিভাবে আমি আপনাদের কাছে ঘটনাটা শুনলাম। এবার ঘটনাস্থলে আমার যাওয়া দরকার। কাল দুপুরে আমি 'টয়কর্ণারে আসব।

রবীন বলল, বেশ। আমি জানিয়ে রাখব কথাটা পলাশবাবুকে।

শৈলেনবাবু ও রবীন বিদায় নেবার পর বাসব বলল, শুনলে তো সব, ঘটনাটা সম্বন্ধে তোমার কোন মন্তব্য আছে ডাক্তার ?

—আমার মতে—শৈবাল বলল, হত্যাকাণ্ডের মূলে নিশ্চয় কোন নারীঘটিত ব্যাপার আছে।

বাসব আর কিছু বলল না। সিগারেট ধরাল।

তখন সাড়ে বারটা।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে 'টয়কর্ণারে'র গিয়ে উপস্থিত হল। প্রথমেই বিরাট হল। পর পর টেবিলের শ্রেণী! প্রত্যেকটা টেবিলকে কেন্দ্র করে কয়েকজন কর্মী বসেছেন। কাজ করে চলেছেন একাগ্রমনে। বাসব এনকয়ারি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। একজন সুশ্রী মহিলা কাউণ্টারে ছিলেন। বাসব তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে পলাশ আচার্যের অনুসন্ধান করল।

বাসবের আগমনের সংবাদ পূর্বাহ্নেই বোধহয় জানিয়ে রাখা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা শান্ত গলায় বললেন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

পলাশ এখন আগেকার চেম্বারে আর বসে না। বসবার উপায় নেই। পুলিশ সেই ঘর সীল করে দিয়েছে। স্টোরের পাশে একখানা খালি ঘর পড়েছিল। আপাতত সেই ঘরেই বসছে পলাশ। বাসব ও শৈবালকে পৌঁছে দিয়ে এনকয়ারির ভদ্রমহিলা নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। পলাশ সাদরে ওদের বসতে অনুরোধ করে সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরল।

বাসব একটা সিগারেট নিয়ে বলল, ডাক্তার এ রসে বঞ্চিত।

পলাশ ওর সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনি কেসটা টেকআপ করায় আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছি মিঃ ব্যানার্জী।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, শৈলেনবাবুর মত আপনিও রিয়া-দেবীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন দেখছি।

—স্বাভাবিক। রিয়ার মৃত্যুতে বাবার বুক ভেঙ্গে গেছে। আমরাও ভাবতে পারিনি যে এইভাবে খুন হবে। তাছাড়া হত্যাকারীকে ধরতে না পারলে আমাদের কম্পানীর রেপুটেশনও হ্যাম্পার্ড হবে।

—রিয়াদেবীর মৃত্যুতে আপনি সকট হননি ?

—হয়েছি বইকি। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে ওইভাবে খুন···

—আমি আপনাকে প্রশ্ন ওভাবে করিনি—পলাশকে বাধা দিয়ে বাসব বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে রিয়াদেবীর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল। তাছাড়া আপনারা একই সঙ্গে বড় হয়েছেন। হয়তো হৃদয়ের সম্পর্কও ছিল, তাই···

—এই ধারনা করাই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু রিয়ার সঙ্গে

আমায় কোন হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না বাবা তাকে পুত্রবধূ মনোনীত করলেও আমি চাইনি। কারণ..

—আপনি অন্যত্র বিয়ে করবেন স্থির করেছেন বোধহয়।

—ঠিক তাই। রুমাকে আমি বিয়ে করব স্থির করেছি।

—এ কথা আপনার বাবা বা রিয়াদেবী জানতেন?

—রিয়া জানতো না। তবে রুমাকে সে দেখেছিল মারা যাবার আগের দিন সন্ধ্যায়। বাবাকে সেদিন রাত্রেই জানিয়েছিলাম রিয়াকে বিয়ে করতে পারব না।

বাসব অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বলল, রিয়াদেবীর সঙ্গে রুমাদেবীর কোথায় দেখা হয়েছিল?

—আমার অফিস ঘরে।

পলাশ সেদিনকার ঘটনাটা বলল। বলল, রবীনকে দিয়ে কিভাবে রুমাকে ডাকিয়ে আনিয়েছিল। তারপর রিয়ার অকস্মাৎ আগমন, এয়ারপোর্টে যাবার অনুরোধ ইত্যাদি সবই।

—আপনি তাহলে আর এয়ারপোর্টে যাননি!

—না। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না বাসববাবু, এই সমস্ত কথা শুনে আপনার লাভ কি? রিয়ার খুনের সঙ্গে এই সমস্ত ঘটনার সম্পর্ক কি?

বাসব অল্প হেসে বলল, একটা খুনের তদন্ত করতে গেলে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে হয় মিঃ আচার্য। তাছাড়া আমি ভগবান নই। এই সমস্ত তথ্যের মধ্য থেকেই আমাকে সূত্রের সন্ধান করতে হবে। সূত্র পাওয়া গেলে হত্যাকারীর নিশ্চিত ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকবে। যাক, এবার দুর্ঘটনার দিনের কথাই আসা যাক। রিয়াদেবীর সঙ্গে আপনার যা কথাবার্তা হয়েছিল, আমায় বলুন।

একটু ভেবে নিয়ে পলাশ বলল, আমি তখন সবে ইণ্টার-কমিউনিকেশন যন্ত্রের বোতাম টিপে রবীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি, রিয়া ঘরে এল। আমাকে বলল, সে নাকি এয়ারপোর্টে দেখে এসেছে আমাদের মাল বিদেশে চালান যাচ্ছে। আমাদের কোন মাল বিদেশে চালান যায় না। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে ভুল দেখেছে। রিয়া বলল, ভুল সে দেখেনি। এমন কি আমাদের একজন কর্মীকে মাল খালাসের সময় সেখানে দেখেছে। আমি বিস্মিত হলাম এবং এই সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করবার আগেই ফোন বেজে উঠল। এক বন্ধু অফিসের সামনেকার রেস্টুরেণ্টে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে তখুনি দেখা করা দরকার এই কথাই জানা গেল ফোনে।

—তারপর?

—আমি রিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে রেস্টুরেন্টে যাই। কিন্তু সেখানে আমার পরিচিত কাউকে দেখতে পাই না। তারপর ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়েই দেখি বাবা দরজার কাছে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রিয়া মারা গেছে তখন।

—হুঁ। আপনাদের মাল কি সত্যিই বিদেশে যায় ?

—না আগামী বছর থেকে পাঠাবার পরিকল্পনা আছে।

—আচ্ছা, এয়ারপোর্টে আপনাদের যে কর্মীকে রিয়াদেবী দেখেছিলেন তার নাম বলেছিলেন কি ?

—না।

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আপনার সঙ্গে এখনকার মত কথা শেষ হল। এবার আপনার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। তাঁর কাছে নিয়ে চলুন আমাদের।

পলাশ বাসব ও শৈবালকে পুরন্দরের ঘরে নিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে পুরন্দর আচার্য নিজের রিভলভিং চেয়ারে হেলে বসেছিলেন। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসলেন। বাসব ও শৈবাল আসন গ্রহণ করল। ওদের দু'জনকে পৌঁছে দিয়েই পলাশ নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর বাসব বলল, পলাশবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি সব শুনলাম। এখন আপনাকে একটু বিরক্ত করব।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুরন্দর বললেন, এই কেসের তদন্তভার যখন গ্রহণ করেছেন তখন নিজের কর্তব্য করবেন বইকি। আমি প্রথমে প্রাইভেট এনকয়ারের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু শৈলেন যখন এসে বলল, আর দেখলাম পলাশেরও তাই ইচ্ছে তখন আর আপত্তি করলাম না। রিয়ার মৃত্যুতে আমি খুবই কাতর হয়ে পড়েছি। তার বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সে এইভাবে চলে যাওয়ায় তার অনেকখানিই অপূর্ণ রয়ে গেল। যাক, সে কথা; আমাকে কি প্রশ্ন করবেন বলছিলেন, করুন ?

বাসব বলল, আপনিই প্রথমে মৃতা রিয়াদেবীকে দেখতে পান। সেই সময় পলাশবাবুর ঘরে কেন গিয়েছিলেন বলবেন কি ?

—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এমনি বলতে পারেন।

রিয়াদেবীর মৃত্যুতে কে বেশি লাভবান হলেন অর্থাৎ কম্পানীতে তাঁর যে অংশ আছে এখন তা কার প্রাপ্য ?

—রিয়ার ছোটভাই তাপসের। সে কয়েকদিন হল জার্মানী গেছে।

—আপনাদের মাল বিদেশে চালান যায় না অথচ রিয়াদেবী এয়ারপোর্টে দেখেছিলেন 'টয়কর্ণারের' মাল বিদেশে চালান যাচ্ছে। এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?

—পলাশের মুখে শুনেছি রিয়া এই ধরনের একটা কথা তাকে বলেছিল। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

—কি রকম?

—রিয়া মারা যাবার আগের দিন দুপুরবেলা আয়কর বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারি আমাকে ফোনে জানিয়েছিলেন, আমরা নাকি বিদেশে মাল পাঠাচ্ছি কিন্তু সরকারকে কর দিচ্ছি না। তখন আমি কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তারপর···

—তারপর ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখলেন বোধহয়?

—এক্জ্যাক্টলি। খোঁজ নিতেই জানা গেল, বিদেশী কম্পানীর কার্গো শিপে আমাদের মাল নিয়মিত করেন যাচ্ছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার ভেবে দেখুন, আমাদের কম্পানীর লেবেল মেরে কেউ নিয়মিত মাল বিদেশে পাঠাচ্ছে অথচ আমরা কিছুই জানি না!

বাসব মৃদু গলায় বলল, কলকাতা শহরটা ক্রমেই দুষ্কৃতকারীদের একটা বিরাট আড্ডাখানা হয়ে উঠছে। এই বিষয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি?

—না।

—ভালই করেছেন। রিয়াদেবীকে আপনি পুত্রবধূ করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু পলাশবাবু এই বিয়েতে রাজি ছিলেন না। শুনলাম আপনাদের মধ্যে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল—কথাটা সত্যি?

পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার বাসবের দিকে তাকালেন পুরন্দর। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সাহস পলাশের নেই। তবে সে যে বিয়েতে আপত্তি করেনি তা নয়। আমি তার আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি।

—আমার প্রশ্নগুলো শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। তদন্তভার যখন গ্রহণ করেছি, তখন আমি উপায়হীন। আর একটু বিরক্ত করব আপনাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তাঁর বিয়েতে আপত্তির কারণ কি? অন্য একজনকে তিনি ভালবাসেন। ধরুন, তিনিও যদি আপনার সমস্ত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে রিয়াদেবীকে বিয়ে না করতেন—আপনি কি পলাশবাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করতেন এর জন্যে?

—আপনি অফট্র্যাকে চলে যাচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জী?

—আমার ট্রাক ঠিকই আছে মিঃ আচার্য। প্রশ্নের উত্তরটা অনুগ্রহ করে দিন?

—তাই করতাম।

বাসবের প্রশ্ন এবার আরো বিচিত্র দিকে মোড় নিল, এমনও তো হতে পারে পলাশবাবু আপনার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতে চান না আবার কোন মতেই রিয়াদেবীকে বিয়ে করবেন না, কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক বিশেষ পথ অবলম্বন করতে হল।

পুরন্দরের শুভ্র ললাটের উপর কুঞ্চন দেখা দিল। তিনি দ্রুত গলায় বললেন, আপনি যা বলতে চাইছেন তা কখনই সম্ভব নয়। পলাশ রিয়াকে··· না না···

—ভাল কথা, পুলিশের পক্ষ থেকে যিনি তদন্ত করছেন, তাঁর নাম এখনও আমি জানতে পারিনি।

—দেবেন সামন্ত।

—ভালই হল, দেবেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কয়েকবার আমরা একই সঙ্গে কাজ করেছি। এটা তো অফিস. আপনাদের কারখানা কোথায় ?

—ট্যাঙ্গরায়। আমাদের অফিস আগে ক্লাইভ বিল্ডিং-এ ছিল। এই বাড়িটা মাস দুয়েক হল আমরা কিনেছি। তারপর উঠে এসেছি এখানে।

—বর্তমানে আমার আর কোন প্রশ্ন নেই মিঃ আচার্য। এবার আমরা উঠি।

পুরন্দরকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে। বাইরে পলাশ দাঁড়িয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনা করছিল। ওদের দেখে বলল, এবার কার সঙ্গে কথা বলবেন বলুন ?

বাসব বলল, আপনাদের টেলিফোন অপারেটরকে একবার ডাকুন।

—সবে এখানে অফিস সিফ্‌ট করা হয়েছে। টেলিফোন বোর্ড এখনও বসানো হয়নি। প্রত্যেকে ডায়রেক্ট এক্সচেঞ্জ থেকে লাইন নিয়ে কথা বলেন।

—ও! রবীনবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলব। তিনি আছেন না লাঞ্চে গেছেন।

—আছেন। আপনি আসবেন—কাকে কখন দরকার পড়বে বলা যায় না তো। যাতে কোন কর্মী লাঞ্চে না যান সেই অর্ডার দিয়ে রেখেছি।

বেয়ারা বাসব ও শৈবালকে রবীন সেনের কাছে নিয়ে গেল। রবীন তখন টাইপের বোতামগুলোর উপর দ্রুত হাত বুলিয়ে চলেছে। ওদের দেখেই উঠে দাঁড়াল। সহর্ষে বলল, আপনারা এসেছেন খবর পেয়েছিলাম। আশা ছিল আমার কাছেও হয়তো আসবেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কাল অবশ্য আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। এখন এলাম নতুন একটা বিষয় জেনে নিতে।

—বলুন ?

—রুমাদেবী—মানে পলাশবাবুর সঙ্গে যাঁর ইয়ে আছে তাঁকে আপনি দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা এখানে নিয়ে এসেছিলেন ?

—হাঁ। আগেও বহুবার তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছি।

—রুমাদেবীর ঠিকানাটা বলুন আমায়।

রবীন ঠিকানা বলল। বাসব ঠিকানাটা কাগজে লিখে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, রুমাদেবীর বাবা আছেন তো ? কি করেন তিনি ?

—আছেন। কি করেন বলতে পারব না।

—আচ্ছা রবীনবাবু, আপনার বস নিজেই তো রুমাদেবীর বাড়ি যেতে পারেন। তা না গিয়ে আপনাকে দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি ?

—রুমাদেবীর বাবা প্রমথ তালুকদারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, সেই কারণেই হয়তো পলাশবাবু ওখানে যেতে চান না। তাছাড়া ওই অঞ্চলে আমাদের অফিসের কয়েকজন কর্মী বাস করে, রুমাদেবীর কাছে না যাবার এও একটা কারণ হতে পারে। আসল কথা সঠিকভাবে আমি কিছুই জানি না। বুঝতেই পারছেন আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর বাসব পুরন্দরের সেক্রেটারি বিনায়কের সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারল না। প্রায় তিনটের সময় ওরা বিদায় নিল 'টয়কর্ণার' থেকে। পথে নেমে বাসব বলল, দেবেন সামন্তর সঙ্গে এবার একবার দেখা হওয়া দরকার। আমি থানায় চললাম। তুমি এক কাজ করো।—

—বলো ?

—এই ঠিকানা-লেখা কাগজটা নাও। প্রমথ তালুকদারের ওখান থেকে একবার ঘুরে এসো। লোকটা কি করে ইত্যাদি খোঁজ নিয়ে আসবে।

—বেশ।—

ঠিকানা-লেখা কাগজটা হস্তান্তরিত হবার পর দু'জনে দু'পথ ধরল।

সামন্ত থানাতেই ছিলেন।

বাসবকে দেখে বললেন, আমি আপনাকেই আশা করছিলাম।

সহাস্যে বাসব বলল, আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আশা করছিলেন কেন ?

—আমি সংবাদ পেয়েছি আপনি রিয়ার মার্ডার কেস তদন্তে নিযুক্ত হয়েছেন। কাজেই আমার কাছে যে আসবেন তা তো সহজেই ধরে নেওয়া চলে। 'টয়কর্ণারের' অফিসে গিয়েছিলেন নাকি ?

ওখান থেকেই আসছি। আবার আপনাকে নিয়ে ওখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে। রিয়াদেবী যে ঘরে খুন হয়েছেন সে ঘরখানা একবার দেখা

দরকার। আপনার নিশ্চয়ই এখন সময়ের অভাব হবে না?

স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়। চলুন।

—তার আগে পোস্টমর্টমের রিপোর্টখানা দেখবো।

সামন্ত দেরাজ থেকে পোস্টমর্টমের রিপোর্ট বার করলেন। এগিয়ে দিলেন বাসবের দিকে। বাসব রিপোর্টের উপর চোখ বুলিয়ে গেল। অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। গুলি মাথার মধ্যভাগে প্রবেশ করেছে—বেরিয়ে যায় নি, আটকে ছিল স্পাইনাল কর্ডের কিছু উপরে। অর্থাৎ গুলি মাথা ভেদ করে কিছু তেরছাভাবে গেছে। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—কেসটার সম্বন্ধে আপনার ওপিনিয়ান কি মিঃ সামন্ত?

—আমি এখনও অথৈ জলে।

—হুঁ। রিয়াদেবীর সঙ্গে ভ্যানিটি ব্যাগ বা ওই জাতীয় কিছু ছিল নাকি?

—চামড়ার ফিতে দেওয়া এক ধরনের ব্যাগ মেয়েদের আজকাল বেরিয়েছে না? ওই ব্যাগ ছিল তাঁর কোলের উপর রাখা। আমি নিয়ে এসেছি সেটা।

—কি আছে তার মধ্যে।

—বিশেষ কিছুই নয়। ছোট চিরুণী, আয়না, পাফ সমেত পাউডারের বাক্স, রুমাল, নোট আর কয়েন মিলিয়ে ছিয়াত্তর টাকা আর একটা ডায়রী।

—ডায়রী? তার মধ্যে থেকে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?

হাত উল্টে সামন্ত বললেন, খুবই হিসেবি ছিলেন ভদ্রমহিলা। পাতার পর পাতা কেবল হিসেব! মাঝে মাঝে দু'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। সব শেষের পাতায় শুধু লেখা আছে একটা মোটরের নম্বর।

বাসব ভ্রু-কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল, একদিনের জন্যে ডায়রীটা আমায় দিতে পারেন ইন্সপেক্টার।

—কেন পারব না!

সামন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে লোহার আলমারি থেকে ডায়রীটা বার করে বাসবের হাতে দিলেন। বললেন, চলুন এবার যাওয়া যাক।

—চলুন।

পুলিশের জীপে চেপেই দু'জনে দশ মিনিটের মধ্যে 'টয়কর্ণারে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরন্দর বা পলাশকে সংবাদ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সামন্ত। ঘরের দরজার সীল ভাঙলেন। ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার। খাঁ-খাঁ করছে। সামন্ত আলো জ্বালালেন। আলোর বন্যায় ডুবে গেল চারিদিক।

ঘরের যেখানে যা ছিল তাই আছে। কিছুই সরানো হয়নি। বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছিল চারিদিক। মাঝারি সাইজের ঘরখানা। ডিসটেম্পার করা দেওয়াল। শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত বলে ভেন্টিলেটার নেই। কাচের পাল্লাযুক্ত

দুটো জানলা। দরজা একটাই। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা জানলা দুটোর কাছাকাছি। টেবিলের উপর কাচের আবরণ। কালির শিশি, পিন-কুশান একটা গেলাসের মধ্যে দশ-বারটা পেনসিল, প্যাড, কয়েকটা ফাইল, গামপট, এনগেজমেণ্ট বুক ছাড়া টেলিফোন ও অফিসের কাজের জন্যে ইণ্টারকাম রয়েছে টেবিলের উপর।

রক্তের কালচে দাগ দেখে বাসব বলল, টেবিলের এই জায়গায় মাথা রেখে বোধহয় মরে পড়েছিলেন রিয়াদেবী?

—হ্যাঁ। সামনের ওই জানলাটাও খোলা ছিল। কিন্তু ওপাশে কোন কার্নিশ নেই। অথচ দরজা দিয়ে যে হত্যাকারী ঘরে ঢোকেনি তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

জানলা খোলা ছিল বলছেন? কিন্তু জানলা খোলা থাকবার তো কথা নয়।

—কেন?

—এয়ারকণ্ডিশন করা ঘরে জানলা বন্ধ থাকাই তো স্বাভাবিক।

—তাই তো! কিন্তু জানলাটা সেদিন খোলাই ছিল।

—এক কাজ করুন, আমি এই ঘরের পিছন দিকের বাগানে যাচ্ছি। আপনি পলাশবাবুর কাছ থেকে জানলা সম্বন্ধে খোঁজখবর করে ওখানে আসুন।

জমি থেকে জানলার উচ্চতা হাত আটেক হবেই। বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাসব জানলার দিকে তাকাল, জানলার ঠিক নিচে দেওয়ালের দু' জায়গায় ঘষা দাগ। দুটো দাগের তফাৎ হাত দেড়েক হবে। ওখানে দাগ কেন? হঠাৎ ওর মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাসব ঘাসের দিকে তাকাল। ওই তো—ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার হাত-কয়েক দূরেই দু'জায়গার ঘাস উঠে গেছে, নরম মাটি একটু বসেছে। বাসবের হিসেবে তাহলে ভুল হয়নি।

ইন্সপেক্টার সামন্ত এলেন।

বাসব প্রশ্ন করল, জানলা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন?

—পলাশবাবু বললেন, তাঁর ঘরের এয়ারকণ্ডিশন ব্যবস্থায় সেদিন গোলমাল দেখা দিয়েছিল, জানলা খুলে রেখেছিলেন তিনিই।

—ও! একটা সমস্যার সমাধান আমি করতে পেরেছি ইন্সপেক্টার। ঘরে দরজা একটা। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ওই দরজা দিয়ে কেউ ঢোকে নি। কার্নিশ না থাকায় জানলার এপাশে দাঁড়িয়ে যে হত্যাকারী কাজ সেরেছে সে কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না—সেই সমস্যার আমি সমাধান করেছি। জানলার তলায় ওই ঘষা দাগ দুটো দেখছেন? কিসের দাগ বলে মনে হয়? দাগ দুটোর দিকে তাকিয়ে সামন্ত বললেন, দেওয়ালের

সঙ্গে ঠেসান দিয়ে কিছু রাখা হয়েছিল তারই দাগ।

—ঠেসান দেওয়া জিনিসটা মই বলে কি আপনার মনে হয় না?

—মই !!

—মাটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ঘাসের উপর মই রাখার পরিষ্কার চিহ্ন দেখতে পাবেন।

উত্তেজিত গলায় সামন্ত বললেন, ঠিক কার্নিশ না থাকলেও মই-এর উপর দাঁড়িয়েই হত্যাকারী গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু মই পেল কোথা থেকে?

—নিশ্চয়ই ঘাড়ে করে অন্য কোথাও থেকে আনেনি। এই বাগানের মধ্যে থেকেই পেয়েছে। আমার মনে হয়, হত্যাকারী মই লাগিয়ে উপরে উঠে যখন জানলা দিয়ে উঁকি মারে তখন রিয়াদেবী নিশ্চয়ই মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। নইলে মাথার মধ্যভাগে গুলি লাগবার আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার আমাদের মইটা খুঁজে দেখতে হবে।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, একধারে সার সার কয়েকটা অর্ধসমাপ্ত ঘর, দারোয়ানদের জন্যেই বোধহয় তৈরি হচ্ছিল ঘরগুলো—মইটা পাওয়া গেল ওখানেই। অবহেলিতভাবে পড়েছিল এক পাশে।

বাসব বলল, মইটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই ইন্সপেক্টার।

—বাড়ি নিয়ে যেতে চান!

—হ্যাঁ। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আসুন, ধরাধরি করে জীপের মাথায় নিয়ে গিয়ে তুলি।

সামন্ত আর কথা না বাড়িয়ে মই-এর একধারটা ধরলেন, অন্য ধারটা ধরল বাসব। ধরাধরি করে মইটাকে জীপের কাছে নিয়ে আসা হল। তারপর হুডের উপর চাপিয়ে কোন রকমে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। জীপের এক খোলতাই খুলল বটে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এবার কষ্ট করে মই সমেত আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আরেকটা কথা, জানলার অপর দিকের কাঠের বিটের উপর হত্যাকারীর হাতের ছাপ পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। অনুসন্ধান করে দেখবেন একবার।

—বেশ।

মই সমেত বাসবকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিলেন সামন্ত, তখন বিকেল হয়ে গেছে। বাইরের ঘরের একপাশে মইটাকে আড়াআড়ি রেখে ও ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে রিয়ার ডায়রীটা পরীক্ষা করতে লাগল। ঠিকই বলেছিলেন ইন্সপেক্টার, বেশির ভাগ পাতায় শুধু আয়-ব্যয়ের হিসেব। মাঝে মাঝে দু' এক জায়গায় লেখা আছে, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে হবে ইত্যাদি। খুনের আগের

দিনের তারিখে শুধু কোন মোটরকারের নম্বর লেখা আছে।

বাসবের মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা ওঠানামা করতে লাগল। হত্যাকারী কে, সে বিষয়ে এখন ওর চিন্তা নেই। চিন্তা হল, হত্যার মোটিভ কি? রিয়ার মৃত্যুতে অর্থের দিক থেকে একমাত্র লাভবান হয়েছে তাপস। কিন্তু সে হত্যাকারী হতে পারে না। আগেরদিন সন্ধ্যার সময় জার্মানীর পথে যাত্রা করেছিল তাপস। এরপর স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে পলাশের কথা। রিয়াকে সে বিয়ে করতে চায় নি অথচ পুরন্দর আচার্য রিয়াকে পুত্রবধূ করতে বদ্ধপরিকর। বিয়ে না করলে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র পর্যন্ত করতে পারেন। পলাশ সম্পত্তি হারাবার ভয়ে রিয়াকে কি খুন করতে পারে না?

বাসব সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভাবতে লাগল, এতটা বোকামি করবে না পলাশ আচার্য অর্থাৎ রিয়াকে খুন করার ইচ্ছে থাকলেও নিজের অফিসঘরে খুন করবে না। অন্যত্র কোথাও নিয়ে গিয়ে সহজেই তার পক্ষে খুন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু—কিন্তু এমনও তো দেখা গেছে, হত্যাকারী ইচ্ছে করে নিজের ঘরে খুন করেছে নিজের উপর থেকে সন্দেহ দূরে নিয়ে যাবার জন্যে। এ ক্ষেত্রে যে তাই হয়নি এ কথাও তো জোর দিয়ে বলা যায় না।

এই সময় বাসবের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। শৈবাল প্রবেশ করল ঘরে।

—একি হে, ঘরের মধ্যে একটা বই ঢুকিয়েছ কেন?

—'টয়কর্ণার' থেকে নিয়ে এলাম পরীক্ষা করে দেখব বলে। তারপর কি হল ডাক্তার? প্রমথ তালুকবারের দেখা পেলে?

—পেলাম বইকি। ভীষণ ঘোড়েল লোক।

—কি রকম?

শৈবাল একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, তোমাকে প্রথম থেকেই বলি। নম্বরগুলো পর পর নয় বলে অনেক কষ্টে তো বাড়ি খুঁজে পেলাম। বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে কোনদিন কর্পোরেশন নোটিশ দিতে পারে। যাই হোক, কড়া নাড়তেই তালুকদার দোর খুলে দিল। খিয়ে ভাজা চেহারা। গলার আওয়াজ অতি কর্কশ। বললাম, পলাশবাবুর কাছ থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কথা আছে। আমি এখন ব্যস্ত বলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। কি আর করি, পাড়ার কতকগুলো বকবাজ ছেলের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে হল। তালুকদারের অত্যন্ত বদমেজাজ, পাড়ার কোন লোকের সঙ্গে তার ভাব নেই। ওর মেয়ে কলেজে পড়ে এবং সুন্দরী। কারুর সঙ্গে প্রেমটেম আছে কিনা কেউ বলতে পারল না। তবে মাঝে মাঝে দামী গাড়ি চড়ে কোথায় যায়।

—তালুকদার কি কাজকর্ম করে খোঁজ নিলে না!

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন। নিশ্চয়ই নিয়েছি। সে কি কাজকর্ম করে কারুর জানা নেই। প্রত্যেক দিন বিকেল বেলা কয়েকজন লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়; ফেরে রাত দশটার পর।

—হুঁ।

—পলাশবাবুর রুচিকে ঠিক প্রশংসা করতে পাচ্ছি না। ওই রকম লোকের মেয়ের সঙ্গে···

বুঝছো না, যার যেখানে মজে মন—। তাছাড়া বাপ খারাপ হলেও মেয়েটি নিশ্চয়ই ভাল। শোনো ডাক্তার, এখুনি আমি তোমার সঙ্গে একটা গুরুগম্ভীর আলোচনা আরম্ভ করতে চাই। তবে তার আগে বাহাদুর আমাদের একদফা চা খাইয়ে গেলে ভাল হয়। দেখতো নেপালের সেই অধিবাসীটি রান্নাঘরে কি করছে?

শৈবাল বাহাদুরের সন্ধানে গেল।

বাসব ডেকচেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল টেলিফোন ডেস্কের কাছে। গাইড থেকে কার যেন নম্বর দেখে নিয়ে ডায়েল করতে আরম্ভ করল।

চা পর্ব শেষ হবার পর মৃদু হেসে শৈবাল বলল, এবার তোমার গুরুগম্ভীর আলোচনা আরম্ভ করো।

অ্যাসট্রের মধ্যে থেকে কুণ্ডলীর আকারে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল। বাসব ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়েছিল সেই দিকে। শৈবালের কথা শুনে বলল, কেসটা কত জটিল তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ ডাক্তার? হত্যাকারী এমন কোন সূত্র ফেলে যায় নি যা অবলম্বন করে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হতে পারি। যাই হোক আশার কথা আমি অনেক চিন্তা করে এবং চতুর্দিকের অবস্থা বিবেচনা করে এগিয়ে যাবার মত সন্তোষজনক একটা পথ আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে হত্যার মোটিভ কি? প্রচুর ভেবেও রিয়াদেবীকে খুন করার কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমিও প্রথমে পাইনি। কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে যেতেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। রিয়াদেবী আগের দিন সন্ধ্যায় এয়ারপোর্টে তাঁদের কম্পানীর মাল জাল করে বিদেশে পাঠানো হচ্ছিল লক্ষ্য করেছিলেন এবং একজন পরিচিত লোককেও সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন। হয়তো সে চায় নি তার নাম প্রকাশ হয়ে পড়ুক— রিয়াদেবীকে তাই বোধহয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।

—তোমার কথা আমি পুরোপুরি মানতে পাচ্ছি না।

—কেন?

—হত্যাকারী রাত্রে রিয়াদেবীকে তাঁর নিজের বাড়িতে খুন করতে পারতো। তা না করে পলাশবাবুর ঘরে ওইভাবে খুন করবে কেন? এত

রিস্ক নেওয়ার অর্থ হয় না! ধরো, তিনি আগেই এয়ারপোর্টে যাকে দেখেছেন তার নাম প্রকাশ করে দিলেন পলাশবাবুর কাছে—এই সম্ভাবনাই স্বাভাবিক, তারপর খুন হলেন। এতে হত্যাকারীর কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে রাত্রে খুন করে তাঁর মুখ বন্ধ করাই ছিল প্রশস্ত পথ।

—হিয়ার, হিয়ার ডাক্তার। ভাল একটা পয়েন্ট বের করেছ। তবে ভাই আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলতে পারলে না। এর উত্তরও আমার কাছে আছে। হত্যাকারী প্রথমে বুঝতে পারেনি রিয়াদেবী তাকে এয়ারপোর্টে দেখেছেন। তিনি যখন পলাশবাবুর সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করছেন, দৈবাৎ সে কথাটা শুনে ফেলে! সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা তার মনে দানা বাঁধে। রিয়াদেবী তার নাম প্রকাশ করে দেবার আগেই সে পলাশবাবুকে ফোন করে ওখান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং মই-এর সাহায্যে জানলার কাছে উঠে গুলি চালিয়ে খুন করে রিয়াদেবীকে।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, পুরো ব্যাপারটা তুমি তলিয়ে দেখ, যারা টয়কর্ণারে'র নামে বিদেশে মাল চালান দিচ্ছে তারা নিজেদের পাপ ব্যবসা বাঁচাতে বা পরের চোখে ধরা পড়ে না যাওয়ার জন্যে সব করতে পারে। হত্যাকারী তাদের মধ্যে একজন। অবশ্য বিদেশে এই মাল চালান দেওয়ার ব্যাপারে আমি আরো ঘোরাল বিষয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

—ঘোরাল গন্ধ! সে আবার কি?

—তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই, জাপানী পুতুল সারা পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ফেলেছে? প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা যাবে না বলেই ভারতীয় পুতুল বিদেশে চালান যায় না। এই কারণেই 'টয়কর্ণারও' মাল বিদেশে পাঠায় না। যারা 'টয়কর্ণারে'র নাম জাল করে বিদেশে পুতুল পাঠাচ্ছে, তারা যদি লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পাঠাতে পারত তাহলে বুঝতে পারা যেত বিদেশে মার্কেট পেয়েছে তারা। আমি একটু আগে পুরন্দরবাবুকে ফোন করেছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন গত আট মাসের মধ্যে তাঁদের নাম করে যে মাল বিদেশে চালান গেছে, তার মূল্য হাজার পঁচিশেক টাকার বেশি নয়। এখন তুমিই ভেবে দেখ, ডিউটি দিয়ে এত রিস্ক নিয়ে আট মাসে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার মাল পাঠিয়ে তারা ক'টাকা লাভ করতে পেরেছে। আমার মনে হয় পুতুল পাঠানো ধোঁকার টাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো কোন বৃহত্তর লাভের ব্যাপার আছে ওতে।

—এক কাজ করলে হয় না—শৈবাল বলল, লেটেস্ট মাল ফ্রান্সের পথে রওনা হয়েছে দিন তিনেক আগে, আমরা তো সহজেই প্রেরকের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারি বিমান অফিসগুলোতে খোঁজ করে। যে পন্থায় পুরন্দরবাবু অনুসন্ধান করেছেন।

—পারি। তাতে কোন ফল হবে না। কারণ প্রেরকের কলমে সঠিক নাম-ঠিকানা দেওয়া থাকবে না। তবে একটা কাজ করা যায়। এখনও হয়তো মাল ফ্রান্সে পৌঁছায়নি কিম্বা পৌঁছালেও ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। যদি পুতুলগুলো আটক করা যায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেখা যাবে বড় কম্পানীর রেপুটেশনের আড়ালে আরেক দফা বে-আইনী কিছু হয়েছে।

বাসব চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।—আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—আইডিয়াটা যখন মাথায় খেলেছে তখন দেরি করে লাভ নেই। প্রথমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে যাব। তারপর মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী একজন পরিচিত সদস্যর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা তাঁকে বলব। কোন রকমে ব্যবস্থা করে ওখানে মালটা আটকাতেই হবে? ফরাসী দূত অফিসেও হয়তো যেতে পারি। চলি-—

শৈবালকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ঘর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল বাসব।

বাসব যখন বাড়ি ফিরল তখন পৌনে বারটা। সমস্ত কাজ ভালভাবে গুছিয়ে আনতে পেরেছে। তবে খুব সহজেই যে সব কিছুর সুরাহা হয়েছে তা নয়। পুরন্দর আচার্যকেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে! তিনিও বুঝিয়ে বলেছেন, তাঁদের কম্পানীর নাম জাল করে কিভাবে মাল বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। বাসব নিজের সন্দেহের কথাও বলেছে।

সমস্ত শুনে ফরাসী দূত অফিসেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন করণীয় যা কিছু করবার তাঁরা করবেন। যে কম্পানীর কার্গো ফ্লাইটে মাল গেছে, তাদের সতর্ক করেছে পুলিশ। তারাও তৎপর হয়ে উঠেছে।

বাসব হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেল। খাওয়া শেষ করেই বিছানায় আশ্রয় নেবে! এখন ওর মন ভীষণ হাল্কা।

আঠারো ঘন্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে আহ্বান করা হল বাসবকে। ও উপস্থিত হতেই দপ্তরের পদস্থ কর্মচারি মিঃ ভাল্লা বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক। ঘন্টা খানেক আগে প্যারিস থেকে সংবাদ এসেছে। ওখানে বাক্স সমেত পুতুলগুলো ভেঙ্গে দেখা গেছে প্রত্যেকটার ভেতরের অংশ মোটা করে সোনার প্রলেপ দিয়ে মোড়া। তার উপর অন্য রঙ লাগানো।

—কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি?

—হ্যাঁ। ভাঁদু নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার নামেই মাল পাঠানো হয়েছিল। তার কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্যারিস পুলিশ পরে পাঠাচ্ছে।

আরো দু'চার কথার পর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে বাসব থানায় চলে এল। অবশ্য একা নেই সঙ্গে শৈবালও আছে। থানায় সামন্তকে পাওয়া গেল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি কোয়ার্টারে গেছেন। থানা সংলগ্ন কোয়ার্টার। সংবাদ পেয়ে লুঙ্গি পরিহিত ইন্সপেক্টার সামন্ত বেরিয়ে এলেন। ওদের নিয়ে গিয়ে বসালেন ঘরে।

চা পাঠিয়ে দিতে বলে এলেন ভেতরে। বাসব গোয়েন্দা দপ্তরে যা শুনে এসেছিল তা বলবার পর বলল, কাজেই বুঝতে পারছেন ইন্সপেক্টার 'রিয়ার মার্ডার কেসটা' এখন কি বিরাট আকার নিয়েছে। আপনার থানার আওতা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। রিয়াদেবী মারা না গেলে 'গোল্ড স্মাগলিং'-এর ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়তো কিনা সন্দেহ।

—অপরাধীকে তো ধরা গেল না এখনও।

—ব্যস্ত হবেন না। তাও যাবে। প্রমথ তালুকদারের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করেছিলেন ?

—কালই তাঁর সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারব আশা করি।

—আর খোঁজ খবরের দরকার নেই। কাল বিকেলে তাঁকে আপনি ধরে আনবেন থানায়। বিস্মিত হয়ে ইন্সপেক্টার বললেন, সে কি ? চা এসে পড়ল এই সময়।

শৈবালও অবাক হয়েছিল। দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বাসব বলল, রিয়াদেবীর ডায়রীতে একটা মোটরের নম্বর লেখা ছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই ? মোটর ভিকেলসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওটা লরির নম্বর। ওই নম্বরের লরির মালিকের নাম হল প্রমথ তালুকদার।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামন্ত বললেন, বলেন কি মশাই ! প্রমথ তালুকদারের লরিতেই এয়ারপোর্টে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাহলে। হয়তো স্মাগলারদের একজন রিয়াদেবীর হত্যাকারী।

—হয়তো। কাল ভাল করে তাঁকে বাজিয়ে দেখতে হবে।

বাসব পকেট থেকে একটা ফিঙ্গার প্রিন্ট বার করে বলল, পলাশবাবুর ঘরের জানলার কাছের হাতের ছাপ তুলে ছিলেন নিশ্চয়ই। এই ছাপটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন মেলে কিনা।

—কার ছাপ এটা ?

—কাল বলবো। এখন চলি ইন্সপেক্টার। মিসেস সামন্তকে বলবেন, তাঁর চা-এর হাত অতি মিষ্টি। এসো ডাক্তার—

পলাশ যখন থানায় পৌঁছাল তখন বিকেল পাঁচটা। এখন কেউ আসেননি। দুপুরে "টয়কর্ণারে" গিয়েছিল বাসব। রিয়া যে ঘরে খুন হয় সেই ঘরে

ঢুকেছিল একবার। তারপর "টয়কর্ণারে" থেকে বিদায় নেবার আগে পুরন্দরকে বলেছিল, আজ পাঁচটার পর থানায় আসবেন সকলকে নিয়ে। আশ্চর্য হয়েছিলেন পুরন্দর।—থানায়?

মৃদু হেসে বাসব বলেছিল, সমস্ত রহস্যের যবনিকা পড়তে আর বেশি বিলম্ব নেই মিঃ আচার্য।

—আপনি জানেন রিয়াকে কে খুন করেছে?

—জানি বইকি। এখন আমায় ক্ষমা করবেন। হত্যাকারীর নাম বর্তমানে বলতে চাই না। পলাশবাবু, শৈলেনবাবু, রবীনবাবু, বিনায়কবাবুকেও যেতে বলবেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যে অন্যান্য সকলে এসে পড়লেন। সব শেষে এল বাসব ও শৈবাল। বাসব ইন্সপেক্টারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ফিঙ্গার প্রিণ্ট দুটো মিলেছে?

—হ্যাঁ। একই লোকের।

—প্রমথ তালুকদারকে আনা হয়েছে?

—ওয়ারেণ্ট তো ইস্যু করতে পারি না। ভয় দেখিয়ে কোন রকমে ভদ্রলোককে এনেছি।

—ওঁকে নিয়ে আসুন এখানে।

—প্রমথ তালুকদারকে আনা হল। তাঁর কদাকার মুখ রাগে আরো কদাকার হয়ে উঠেছে। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, আমায় এখানে কেন ধরে আনা হয়েছে?

বাসব বলল, ব্যস্ত হবেন না। কোন সঙ্গত কারণেই আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।

শৈবাল লক্ষ্য করল প্রমথ তালুকদারকে দেখবার পরই পলাশের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে উঠেছে।

—সেই সঙ্গত কারণটাই আমি জানতে চাই।

—...৪৬৩২৯ নম্বর লরিটা আপনার?

—হ্যাঁ।

—এই লরিতে চাপিয়ে বেআইনী জিনিস আপনি এয়ারপোর্টে নিয়ে থাকেন।

—না। মানে...

—সত্যিকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। গত সাত তারিখে "টয়কর্ণারের" লেবেল দেওয়া কয়েকটা প্যাকিং বাক্স আপনার লরিতে বওয়া হয়েছিল। আপনার অজানা ছিল না বেআইনী মাল আছে বাক্সগুলিতে।... না...আপত্তি করবার চেষ্টা করবেন না মিঃ তালুকদার। প্যারিসে মিঃ ভাদু

ধরা পড়েছেন। ভারতে যাদের সঙ্গে তিনি কারবার করেছেন তাঁদের নাম তাঁর কাছ থেকে প্যারিস পুলিশ ঠিক আদায় করতে পারবে। আশা করা যায় সেই তালিকার মধ্যে আপনার নামটাও থাকবে।

গাল ঝুলে পড়ল প্রমথ তালুকদারের। তিনি কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না। ঘরের মধ্যে প্রায় এক মিনিট পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল। পুরন্দরের মন উসখুস করলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না তিনি।

বাসব আবার বলল, রিয়াদেবীর হত্যা তদন্তের ভার আমার উপর দেওয়া আছে। কয়েকদিন আমি পরিশ্রম করে এই তদন্তের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। রহস্য আর আমার কাছে রহস্য নেই। সেই সম্পর্কেই সমস্ত কথা বলবার জন্যে এখানে আপনাদের ডেকে এনেছি। ভরসা করি আমার দীর্ঘ বক্তব্য আপনারা শান্তভাবেই শুনবেন। 'রিয়া মার্ডার কেসে' নিযুক্ত হবার পর যখন তদন্ত করতে 'টয়কর্ণারে' যাই তখন আমার ধারনা ছিল আর দশটা হত্যাকাণ্ডের মত এখানেও অর্থই অনর্থ ঘটিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম রিয়াদেবীর মৃত্যুতে এঁদের কারুরই আর্থিক লাভ হয়নি। যিনি লাভবান হয়েছেন তিনি জার্মানীর পথে। কোন ক্রমেই তাঁর পক্ষে এই খুন করা সম্ভব নয়। এবার দ্বিতীয় সম্ভাবনা নিয়ে আমার মাথা ঘামাতে হল। পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে পলাশবাবুর সঙ্গে রিয়াদেবীর বিয়ে হোক। পলাশবাবু আবার প্রমথ তালুকদারের মেয়ে রুমাদেবীকে বিয়ে করতে চান। স্বাভাবিকভাবেই বিরাট সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হল পলাশ আচার্যকে। একরোখা ব্যক্তিত্বশালী বাবার কথা উপেক্ষা করলে সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন তিনি অথচ রিয়াদেবীকে কোন মতেই বিয়ে করতে পারেন না। তিনিই কি পথের কাঁটা এইভাবে সরিয়ে ফেললেন? মোটিভ জোরাল হলেও তাকে অবলম্বন করা গেল না। কারণ রিয়াদেবীকে খুন করবার জায়গার অভাব ছিল না। সেদিন পলাশবাবু রিয়াদেবীর সঙ্গে এয়ারপোর্টে যেতে পারতেন। ফেরার পথে কাজ শেষ করে অন্ধকারের মধ্যে মৃতদেহ খানা-খন্দরে ফেলে আসার কোন অসুবিধা ছিল না; কিন্তু তা না করে, নিজের অফিস ঘরে খুন করবার রিস্ক নেবেন এত বোকা নিশ্চয়ই পলাশবাবু নন?

আমি সমস্ত ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভাবতে লাগলাম। রিয়াদেবী মারা যাবার আগে পলাশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন, তিনি এয়ারপোর্টে দেখে এসেছেন 'টয়কর্ণারে'র মাল বিদেশে চালান যাচ্ছে। এদিকে আয়কর বিভাগের একজন কর্মচারিও পুরন্দরবাবুকে জানিয়েছিলেন, 'টয়কর্ণারের' মাল বিদেশে যাচ্ছে অথচ তাঁরা সরকারকে আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন। শিগগিরই নোটিশ নাকি যাচ্ছে ইত্যাদি। হত্যার মোটিভ সম্পর্কে এবার আমি স্থির নিশ্চিন্ত হলাম। যারা এই চোরাচালান দিচ্ছে, এয়ারপোর্টে

তাদের একজনকে লরি থেকে মাল নামাবার সময় দেখে ফেলেছিলেন রিয়াদেবী। সমস্ত কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে তাকে পৃথিবীতে থাকতে দিতে চায়নি। কিন্তু এখানে বড় রকম একটা প্রশ্ন আছে, হত্যাকারী রিয়াদেবীকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পর খুন করল না কেন? তিনি পলাশবাবুকে যখন এই বিষয় বলছেন তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং পলাশবাবুকেও ও ঘর থেকে সরিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করে।

এবার বিদেশে মাল চালান দেওয়া প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। সংবাদ নিয়ে জানা গেল আট মাসে চোরাকারবারীরা মাত্র হাজার পঁচিশেক টাকার মাল ফ্রান্সে পাঠিয়েছে। এই অল্প টাকার মাল থেপে থেপে পাঠিয়ে খুব বেশি যে লাভ হয়েছে তা নয়। লাভ যখন প্রচুর হয়নি তখন তারা এত রিস্ক নিয়ে এই কাণ্ড কারখানা করেছে কেন? একটু চিন্তা করার পরই এর উত্তর আমি পেলাম। আসলে অভিজ্ঞতাই আজকাল আমাকে অনেক বিষয় সাহায্য করে। এমনও তো হতে পারে অন্য কিছু বিদেশে চালান যাচ্ছে চীনে মাটির পুতুলের আবরণে। আমি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে গিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা বললাম। ফরাসী দূত অফিসেও আমাকে যেতে হল। এরপর মাল যাকে পাঠানো হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করা শক্ত হয়নি। অবশ্য দ্রুত কর্মতৎপরতার দরুণই এই কাজ সম্ভব হয়েছে। প্যারিস-পুলিশ পুতুলগুলোর পেট থেকে অজস্র টাকার সোনা উদ্ধার করেছে। বলাবাহুল্য পুলিশ যাকে ধরেছে সেই ভাঁড় যাদের সঙ্গে চোরাকারবার করতো তাদের নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করে দেয়।

বাসব থামল। একটু দম নিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আবার আরম্ভ করল, এতক্ষণে সমস্ত ঘটনাটা আপনারা মোটামুটি আন্দাজ করেছেন। কিন্তু এখন রিয়াদেবীর হত্যাকারী যবনিকার আড়ালে। তার নাম প্রকাশ করবার আগে বলতে চাই তাকে আমি কিভাবে ধরলাম। মৃতদেহের পজিশনের কথা শুনে এবং পলাশবাবুর অফিস-ঘর পরীক্ষা করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম খোলা জানলা দিয়েই হত্যাকারী গুলি চালিয়েছিল। কাজেই জানলার পিছন দিক অর্থাৎ বাগানের সেই অংশ পরীক্ষা করলাম। পরীক্ষার ফল অত্যন্ত আশাপ্রদ হল। দেওয়াল এবং জমি পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেল হত্যাকারী মই-এর সাহায্যে জানলার কাছে উঠেছিল। মই-এর সন্ধান পেতেও বিলম্ব হল না। কয়েকটা অর্ধ-সমাপ্ত ঘরের কাছে পড়েছিল সেটা। মইটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমি তার থেকে হাতের ছাপ তুলেছি। ইন্সপেক্টার জানলার কাঠের বিটের উপর থেকে হাতের ছাপ তুলেছেন, দুটো ছাপই এক লোকের—হত্যাকারীর। এই ঘরে এখন যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদেরই একজনের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। আপনারা কি আন্দাজ করতে পারছেন

কে রিয়াদেবীকে খুন করেছে ?

কারুর মুখে কথা নেই। থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে।

—মিঃ আচার্য, আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন ..

—না, মিঃ ব্যানার্জী—দ্বিধাজড়িত গলায় পুরন্দর বললেন, আমি বুঝতে পারিনি রিয়াকে কে খুন করেছে।

—পলাশবাবু আপনি ?

—আমারও ওই একই অবস্থা।

—রবীনবাবু আপনি ?

—এখনও অন্ধকারে আছি।

—জানি আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমি বুঝতে পারতাম না। কিন্তু হত্যাকারীর গগনলেহী আত্মপ্রত্যয়ই নিজের পতন ঘটাল। একটু সতর্ক হলে হাতের ছাপগুলোকে এড়িযে যাওয়া যেত। তাহলে কোনদিন আমি তাকে ধরতে পারতাম না—যদি সে নিজের দ্বিতীয় ভুলটাকেও সংশোধন করে নিত। আপনাদের অনেকের মনেই বোধহয় একটা প্রশ্ন খচখচ করছে। রিয়াদেবী এবং পলাশবাবুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয় তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। তবু হত্যাকারী এদের দু'জনের কথা কিভাবে শুনতে পেয়েছিল ? তখন সে কোথায় ছিল ? আপনারা জেনে রাখুন সে আড়ি পাতবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। এমন কি তার জানা ছিল না, রিয়াদেবী পলাশবাবুকে তারই সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানের অপূর্ব কলাকৌশলের জন্যেই সে বেশ কিছু দূরে, নিজের জায়গায় বসে এদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল। আপনারা অধৈর্য হয়ে পড়ছেন বুঝতে পারছি। আর আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেব না। যাই হোক, এবার বলি পলাশবাবুর অফিস-ঘরের ইন্টার-কমিউনিকেশন যন্ত্রের বোতামটা যদি কোন রকমে তুলে দিতে পারতেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনাকে ধরতে পারতাম না রবীনবাবু।

বিদ্যুৎবেগে রবীন সেন উঠে দাঁড়াল।—কি বলছেন আপনি ? আমি—!!

অভিনয় করার মিথ্যে চেষ্টা করছেন। যন্ত্রের বোতাম টিপে পলাশবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রিয়াদেবী ঘরে প্রবেশ করলেন। দু'জনের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। আপনি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এদের কথা শুনতে শুনতেই পরিকল্পনা খাড়া করে ফেললেন। অফিস থেকে কয়েক মিনিটের জন্যে ফোন করে সরিয়ে দিলেন পলাশবাবুকে। তারপর—। কি ভাবে হত্যাকারী আড়ি পেতে কথা শুনেছিল কিছুতেই যখন বুঝতে পারছি না তখন অন করা ইন্টার-কমিউনিকেশন যন্ত্রটা চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম হত্যাকারী কিভাবে এদের কথা শুনতে পেয়েছিল এবং সে কে। যাক, ইন্সপেক্টার সামন্ত আপনি রিয়াদেবীকে হত্যা করার অপরাধে

রবীনবাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না নিশ্চয়ই ইনি প্রমথ তালুকদারের মত গোল্ড স্মাগ্‌লারদের মধ্যে একজন।

ঘরের মধ্যেকার থম্‌থমে ভাবটা কেটে গেছে। সবিস্ময়ে সকলে গুঞ্জনের জাল বুনতে লাগলেন। কেউই কল্পনা করেন নি রবীন এই হত্যা নাটকের নায়ক। ইন্সপেক্টার এগিয়ে গেলেন ওর দিকে। ওর মুখ কুঁচকে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে। মনের মধ্যেটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। কিন্তু কোন কথাই বলল না রবীন। অনড় হয়ে বসে রইল নিজের চেয়ারে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকিয়ে পুরন্দর আচার্য বললেন, সুখ্যাতির বন্যা বইয়ে আপনাকে ছোট করব না মিঃ ব্যানার্জী। তবে একথা বলব, আপনার কার্যকুশলতায় আমি হতবাক হয়ে গেছি। আপনারা দু'জন আটটার পর আসুন না আমার ওখানে নৈশ আহার ওখানেই সারবেন।

বাসব সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করে বলল, আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে সুখী হতাম মিঃ আচার্য। কিন্তু আজ অন্যত্র আমায় ব্যস্ত থাকতে হবে। এখন চলি। পলাশবাবু পেমেন্টের ব্যাপারে কাল আমার সঙ্গে আপনি বোধহয় দেখা করছেন? এসো ডাক্তার।

বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল!

লালীমার কালীমা

বাদব হোয়াটনটের কাছ থেকে সরে এসে সোফায় বসল।

—তারপর কি হল বলুন ?

ডানপাশের কোচে যিনি বসেছিলেন, তিনি অবশ্যই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছেন। তবে পঞ্চাশের কোঠা এখনও অতিক্রম করেনি এটাও ঠিক। চওড়া হাড়ের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। যৌবনে অত্যন্ত সুরূপ ছিলেন এক নজর মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। এই সঙ্গে আরো বুঝতে পারা যায় তিনি বাঙালী নন।

কথাবার্তা ইংরাজীতেই হচ্ছিল।

তিনি নড়েচড়ে বসে বললেন, বাবা মারা যাবার বেশ কয়েক বছর আগেই কাকা মারা গিয়েছিলেন। হুইস্কির প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল। লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুনই তাঁর মৃত্যু হল। বাঁধা কোন আয় ছিল না তাঁর। কাঁচামালের দালালি করতেন। সপরিবারেই থাকতেন আমাদের সংসারেই। চার্চ গেটের কাছাকাছি বাবার একটা ছোট লোহার তৈরি জিনিসপত্রের দোকান ছিল। সেই দোকানের আয় থেকে আমাদের কোন রকমে চলে যেত। কাকা মারা যাবার পর কাকীমা আর আমাদের কাছে থাকলেন না। ছেলে সদাশিবকে নিয়ে বাপেরবাড়ি চলে গেলেন। সদাশিব আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। তারপর বছর কয়েক কেটে গেল। বাবার আর্থিক উন্নতি মোটেই হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবার পরই তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। চড়া দামে লোহা সাপ্লাই করে যুদ্ধের ক'বছরে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করলেন। আমরা বড়লোক হয়ে গেলাম।

—আপনার সেই খুড়তুতো ভাই-এর কি হল মিঃ সিন্ধে ?

বালাজী সিন্ধে নিজের মুখের উপর রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বললেন, সেই কথাতেই এবার আসছি। কাকীমার বাপেরবাড়ির লোকেরা থাকতেন কাটনিতে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর কাকীমা ও সদাশিবকে ফিরিয়ে আনার জন্য বাবা নিজেই গেলেন কাটনি। আর্থিক অবস্থা যখন ভাল হয়ে গেছে তখন ওদের দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে দেওয়া কেন ? কিন্তু ওঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হল। কারণ ওই পরিবার কাটনি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারল না। তারপর দীর্ঘ পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। বাবা-মা বহুদিন হল গত হয়েছেন। আমি বাড়ির কর্তা। বেশ নির্বিবাদেই দিন

'কেটে যাচ্ছিল। মাস খানেক আগে হঠাৎ চিঠিখানা পেলাম।

পকেট থেকে স্ট্যাম্প মারা একটা খাম বার করে সিন্ধে বাসবের দিকে এগিয়ে ধরলেন। বাসব খামের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করে চোখের সামনে মেলে ধরল। কিন্তু পড়তে পারল না। মারাঠী ভাষায় লেখা।

—আপনি পড়ে শোনান।

সিন্ধে চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে ইংরাজীতে তর্জমা করে পড়লেন।

রাও,

আমি মারা গেছি এই ধারনা নিয়েই তুমি আছো। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে সদাশিব রাও সিন্ধে মরেনি। সুস্থ সবল অবস্থায় বেঁচে আছে। এবং অর্ধেক সম্পত্তি অধিকার করার জন্য শীঘ্রই সে উপস্থিত হচ্ছে।

তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি, যে স্থাবর-অস্থাবর বিপুল বৈভব তুমি একা ভোগ করছো তার অর্ধেক দাবীদার আমি। আমার দাবী উপেক্ষা করলে ফল ভাল হবে না। বাঁকা পথে কাজ কিভাবে উদ্ধার করতে হয় তাও আমি জানি।

সদাশিব।

—বুঝতেই পাচ্ছেন, সদাশিবের এই ঔদ্ধত্যে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবার অর্জিত সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপনি কি করলেন ?

—স্ত্রীকে চিঠিখানা দেখালাম। আর তো কিছু করার ছিল না। দিন চারেক পরে সে আমাকে ফোন করল। আমি তাকে তখুনি বাড়ি চলে আসতে বললাম। এই সঙ্গে আরো বললাম, কোন ব্যবসা-ট্যাবসা করার জন্য হাজার পঞ্চাশেক টাকা আমি দেব। হাজার হোক বংশের ছেলে। সে কিন্তু আমার কথা শুনে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। তার অর্ধেক সম্পত্তি চাই। আমি ফোন ছেড়ে দিলাম। এরপর দিন কয়েক বিনা ঝামেলায় কাটল। সেদিন সন্ধ্যার 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ডে' ডিনার সারতে গিয়েছিলাম সস্ত্রীক। হোটেল থেকে বেরুবার মুখেই সদাশিবের সঙ্গে দেখা। সে আমাদের পথ আটকাল। জায়গাটা বেশ নির্জন। আমার স্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন। সে আবোল তাবোল অনেক কিছু বলে গেল। আমি তাকে বললাম, বাড়িতে এসো, ভালভাবে কথা হবে। সে বললে বাঘের গুহায় ঢুকতে মোটেই রাজি নয়। পনেরো দিনের মধ্যে যদি আইন সঙ্গতভাবে অর্ধেক সম্পত্তি তার নামে না করে দেওয়া হয় তবে সে আমার মাথা রিভলবারের গুলি দিয়ে ফুটো করে দেবে। আমার আর সহ্য হল না। ঝটকা দিয়ে তাকে সরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সিন্ধে একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, সদাশিব কিন্তু নিয়মিত নানা

উৎপাত চালিয়ে যেতে লাগল। আমি পুলিশে সংবাদ দিলাম। পুলিশ আমাকে এই ঝামেলার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারল না। খুবই অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটছিল। ব্যবসার কাজে কলকাতা এসেছি গত সোমবার। ইন্টারন্যাশানালে উঠেছি। গত রাত্রে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে আমার ভয় পেয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। বলতে পারেন একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল কিসের শব্দে। ঘরে নাইট ল্যাম্প জলছিল। ঝাপসা আলোতেও সদাশিবকে চিনতে পারলাম। সে কিভাবে ভেতরে এল ভগবান জানেন। সদাশিব চুপ্‌চাপ এগিয়ে এল—হাল্কা ঝলকানি দেখলাম, চাপা শব্দ হল—বুঝলাম, সে গুলি চালিয়েছে। ভাগ্যক্রমে গুলি গায়ে লাগল না। আমি কিন্তু মড়ার মত পড়ে রইলাম। সদাশিব আমাকে মৃত মনে করেই বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিভাবে যে বাকি রাতটুকু কাটিয়েছি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। সকাল হতেই এখানে চলে এসেছি। সদাশিবের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান।

—লালবাজারকে ইনফর্ম করেছেন?

—না। পুলিশকে জানানো মানেই নানারকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। সময় মত বম্বে ফেরা তাহলে আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়তো।

—আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব।

—সদাশিবকে আপনি খুঁজে বার করুন। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা খরচ লাগে আমি দেব।

—এ তো রীতিমত বুনো-হাঁসের পিছনে ছোটা।

—আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে মিঃ ব্যানার্জী। বুঝতে পাচ্ছেন না, ওকে আইনের প্যাঁচে না ফেলতে পারলে ও আমাকে মেরে ফেলবে।

—আমাকে একটু ভাববার সময় দিন মিঃ সিন্ধে। আপনি কবে বম্বে ফিরছেন?

—কাল দুপুরের ফ্লাইটে। আপনার সম্মতি পেলে তাড়াতাড়ি টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখতে পারি।

—বেশ। আজ রাত দশটার মধ্যেই আপনি আমার কাছ থেকে ফোন পাবেন।

বালাজী সিন্ধে কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবেই বিদায় নিলেন।

শৈবাল এতক্ষণ কথা বলেনি। ঘরের অন্যপ্রান্তে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকলেও দুজনের কথা শুনছিল। এবার বলল, সিন্ধে সাহেব কিন্তু বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাকে তুমি নিরাশ করবে নাকি?

—কিছু ঘটে যাবার পর আমার কাজ আরম্ভ হয়। এখনো তো তেমন

কিছুই ঘটেনি। তাছাড়া—

—ঘটেনি কি রকম? ভদ্রলোক খুন হতে হতে বেঁচে গেলেন—

—তা বটে। বম্বে আমি কখনও যাইনি। হাতে এখন কোন কাজকর্মও নেই। ঘুরে আসা যেতে পারে, কি বলো?

—নিশ্চয়। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হবে। বেড়ানো এবং রোজগার।

বাসব মৃদু হেসে পাইপ ধরাতে লাগল।

বিমানবন্দরের বাইরেই বালাজী সিন্ধের ইমপালা দাঁড়িয়েছিল। আজ এই ফ্লাইটে তিনি যে কলকাতা থেকে ফিরবেন একথা অজানা ছিল না বাড়ির লোকের। বাসব চেষ্টা করেছিল শৈবালকে সঙ্গে আনার। গুটি কয়েক বড় অপারেশন হাতে থাকায় সে আসতে পারল না। সিন্ধে অতিথিকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর সেক্রেটারি কৌশল সঙ্গে এসেছে কলকাতা থেকে। সে ট্যাক্সিতে আসবে মালপত্র নিয়ে।

সারাটা পথ দুজনের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। সিন্ধে কটন গ্রীনে থাকেন। এই অঞ্চলটিকে শহরতলি বলাই ঠিক। বেশ নির্জন, ছিমছাম। বহুক্ষণ পরে পেল-গ্রীন রং-এর ইমপালা বিরাট এক কমপাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করল। সযত্নে বাগানের ওধারেই আধুনিক হর্মশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে বাড়িখানা। বাসব অনুভব করল, বৈভব আর রুচিবোধের এমন সমাবেশ সর্বক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। গাড়ি থেকে নেমে অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে পার্লারে এলেন গৃহকর্তা। শ্রীমতী সিন্ধে ওখানেই ছিলেন। নিখুঁত সুন্দরী মহিলা। দেহের গঠনে তাঁকে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। আসলে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কুশান পাতা গড়ানো বেতের চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় উল বুনছিলেন। একজন অপরিচিত লোককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে আসতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মৃদু হেসে সিন্ধে বললেন, আমার স্ত্রী ললিতা।

তারপর বাসবের পরিচয় দিলেন। কেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাও বললেন। কলকাতার ইণ্টারন্যাশনালে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ অল্পের জন্য কিভাবে বেঁচে গেছেন তাও অল্প কথায় বললেন। ললিতার মুখে আশঙ্কার মেঘ ঘন হয়ে এল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয় কিছুটা ক্লান্ত। আসুন আপনাকে ঘর দেখিয়ে দিই।

—আমি কিন্তু একতলাতে থাকাই পছন্দ করব।

—বেশ।

পার্লার অতিক্রম করে ললিতার পিছু পিছু বাসব বাগান ঘেঁষা পুবমুখো

একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরখানি সুসজ্জিত এবং বাথরুম সংযুক্ত। নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না তবু পরিচ্ছন্নতা লক্ষনীয়।

সুইস-বোর্ডের দিকে আঙুল তুলে ললিতা বললেন, কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই লাল রং-এর পুশবটা চাপ দেবেন। চাকর আসবে।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই একজন বাসবের সুটকেশটা রেখে গেল। কৌশল এই মাত্র এয়ারপোর্ট থেকে ফিরল বোঝা যাচ্ছে। বাসব জামা কাপড় বদলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। এখন ওর কাজ হল অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাওয়া।

নানা চিন্তা ওর মনে আসা যাওয়া করতে লাগল।

বাসব পাইপ ধরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। আজ বিকেলেই থানা-ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করে আসবে। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনেই সদাশিবের ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছিলেন সিঙ্কে।

অবশ্য বিকেল হতে আর বাকি নেই।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল। ডাইনিং হলে যেতে হয়নি ওকে, ঘরেই বেয়ারা খাবার বয়ে এনেছিল। এখন ঠিক পোনে ছ'টা। বম্বেতে সন্ধ্যে বেশ দেরিতে হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দা অতিক্রম করার মুখেই কৌশলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বাসবের। করিৎকর্মা, চটপটে ছোকরা।

সে বলল, এখন উপরে স্যার বিশ্রাম করছেন। তাঁর কাছে খবর পাঠাবো কি?

—প্রয়োজন নেই। এখন আমি বেরুচ্ছি।

—গাড়ি বার করতে বলি?

না। দূরে কোথাও যাচ্ছি না। কাছাকাছি থাকব।

মাত্র বছর আটেক ললিতাকে বিয়ে করেছেন বালাজী সিঙ্কে। ললিতা সন্তান উপহার দিতে পারেননি বলেই ভাগনেকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। ভাগনেই বোধহয় তাঁর উত্তরাধিকারী। শ্রীযানের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত দেখা হল না। এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে বাসব বাগানের দক্ষিণ প্রান্তের যে ছোট গেটটা ছিল, সেই দিকে এগুলো।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই ওকে থামতে হল। একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সির মধ্যে বসে একটি মেয়ের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে সাতাশ আঠাশ বছরের একটি যুবক কথা বলছে। যুবক স্বাস্থ্যবান এবং সুরূপ। বাসবকে দেখে সে ভ্রূ-কুঁচকাল।

বাসব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, থানাটা কোন দিকে বলতে পারেন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আপনি—

—আমি মিঃ সিঙ্কের সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছি।

—ও, আপনিই মিঃ ব্যানার্জী। মামা ফোন করে আপনার কথা আমাকে বলেছেন। আমি রাজনাথ। তাঁর—

—বুঝতে পেরেছি, তাঁর ভাগনে।

—আপনি থানায় যেতে চাইছেন তো? রেহানা তুমি মিঃ ব্যানার্জীকে একটু নামিয়ে দিয়ে যাও।

রেহানা দরজা খুলে বলল, আসুন—

ট্যাক্সিতে বসে বাসব বলল, ধন্যবাদ মিঃ রাজনাথ, ফিরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে রইল।

—বেশ তো।

ট্যাক্সি গতি নিল।

ওখান থেকে থানা মাত্র দশমিনিটের পথ। রেহানাকে বেশ ভালভাবেই দেখে নিয়েছে বাসব। বেশ মিষ্টি চেহারার মেয়ে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল। ভাগ্যক্রমে থানার ইনচার্জকে পাওয়া গেল অফিসঘরেই। বেশ সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক। বাসবের খ্যাতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল নয় বলেই মনে হল। তবে অসৌজন্যতা প্রকাশ করলেন না।

বাসব কোন্ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে এবং সিঙ্কেকে কলকাতায় হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল একথা বলে সদাশিব সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা তাদের সম্ভব হয়েছে কিনা জানতে চাইল। ইন্সপেক্টার ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। একজন অপরিচিতের সঙ্গে ওবিষয়ে আলোচনা করা চলে কিনা তাই বোধহয় তিনি ভেবে দেখছিলেন।

তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বাসব বলল, আপনার মনে হেজিটেশন আসা স্বাভাবিক। আপনি মিঃ সিঙ্কেকে আমার সম্পর্কে ফোন করে দেখতে পারেন। প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি আপনাদের হেডকোয়ার্টার থেকে সমস্ত রকমের অনুমতি আনানোর ব্যবস্থা করবেন।

ইন্সপেক্টার এবার যেন একটু লজ্জিত হলেন।

বললেন, সিঙ্কে সাহেব যখন ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন তাঁর মত ধনী লোকের স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে। সদাশিব সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।

—সে কোথায় থাকতো জানতে পেরেছেন?

—বছর দশেক আগে পর্যন্ত সে কাটনিতে ছিল। মা মারা যাবার পর আমেদাবাদে যায়। সেখানে একটা কাপড়ের কলে চাকরি করছিল। বছর দেড়েক আগে তার চাকরিটা যায়। তারপর আমেদাবাদ থেকে সে কোথায় চলে গেছে তা আর এখন জানা যাচ্ছে না।

আরো দু'চার কথার পর বাসব ওখান থেকে উঠল। এধার ওধার ঘুরে ললিতা-ভিলাতে যখন সে ফিরে এল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। স্ত্রীর

নামানুসারেই বাড়ির নামকরণ করেছেন সিঙ্ঘে। পার্লারে তখন মজলিশ বসেছে। গৃহকর্তা ও ললিতা ছাড়া রয়েছেন দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক এবং রাজনাথ। সেক্রেটারি কৌশলও দাঁড়িয়ে রয়েছে বিনীত ভঙ্গিতে একধারে।

বাসবকে দেখে সিঙ্ঘে বললেন, আসুন। থানায় গিয়েছিলেন শুনলাম। আলাপ করিয়ে দিই। এঁরা দুজনেই আমার বিজনেস পার্টনার। মিঃ বিলমোরিয়া এবং মিঃ চৌহান। আর ইনি হলেন সুবিখ্যাত গোয়েন্দা বাসব ব্যানার্জী।

নমস্কার বিনিময় হল।

বাসব দুজনকেই ভালভাবে দেখে নিল। বিলমোরিয়ার বয়স চল্লিশের সামান্য কিছু উপরে হবে। জুলপি শোভিত তীক্ষ্ণ মুখ। চৌহানের বয়সও ওই রকম হবে। ছোটখাট চেহারা। মুখের উপর গম্ভীর কাঠিন্য লেগে রয়েছে। দুজনেরই সাজপোশাক নিখুঁত।

বিলমোরিয়া বলে উঠলেন, মিঃ সিঙ্ঘে আপনাকে সঙ্গে করে এনে ভাল করেছেন। কলকাতায় তো শুনলাম লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেছে। মনে হয় আপনি সদাশিবকে খুঁজে বার করতে পারবেন। বাসব একটু হেসে বলল, চেষ্টা নিশ্চয় করব।

ললিতা বললেন, আমি তো ওকে বলেছি এখন কিছুদিন বাড়ি থেকে না বেরুতে। বিপদ কোনদিক থেকে আসবে বলা তো যায় না।

জোরে হেসে উঠলেন সিঙ্ঘে।

—বাকি জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় কাটিয়ে দেব বলছো।

চৌহান অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন রাস্তাঘাটে যখন তখন গুলি চালানো সহজ কথা নয়। বিশেষ করে বম্বে শহরে। তবে হ্যাঁ, রাতে কোথাও বেরুবেন না, এ অনুরোধ আমিও করব।

বাসব আর এখানে অপেক্ষা করল না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। এখন একই চিন্তা ওকে পেয়ে বসেছে কোন পথ ধরে এগুবে? দায়িত্ব নিয়ে যখন এসেছে তখন ব্রেক খেয়ে আর বেড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

পাইপ ফুঁকে আর প্ল্যান ভাঁজতে ভাঁজতে ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। কিছুটা অতিষ্ঠ হয়ে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার অপর প্রান্তের দরজা দিয়ে বাগানে এল। আকাশে চাঁদ নেই। আলো না থাকার দরুন অন্ধকার। ঝিরঝিরে হাওয়া কিন্তু শরীর জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মন্থর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল—কাছেই কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে দুজন লোক অনুচ্চ গলায় কথা বলছে। সন্তর্পণে বাসব আরো একটু এগিয়ে গেল। একজনের গলার আওয়াজ চেনা—রাজাজী সিঙ্ঘে।

—বছরের পর বছর ব্যাপারটা চেপে রাখা সম্ভব নয়। আমি ধৈর্য পরীক্ষা দিয়েই চলেছি। আপনি আমার জন্য কিছুই করছেন না।

সিন্ধে বললেন, অকৃতজ্ঞের মত কথা বলো না। সামান্য কর্মচারি ছিলে, আমি তোমাকে পার্টনার করেছি।

—না করে উপায় ছিল না। এখন আমার হাজার ত্রিশেক টাকার দরকার। সব সময় মনে রাখবেন, আপনার সুনাম আমার ইচ্ছের উপরই নির্ভর করছে।

—তুমি আমাকে ব্লাকমেল করে চলেছ। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারের একটা সীমা আছে।

—আছে নাকি? বেশ, কালকেই আমি প্রকাশ করে দেব। বম্বের উঁচু সমাজ জেনে নিক, আপনি কি কদর্য কু-চরিত্রের মানুষ। নিষিদ্ধপল্লী থেকে একজন—

—আর কোন কথা নয়। আমি ফেডআপ হয়ে গেছি। এখন যাও। কাল অফিসে চেক পাবে।

—এইতো কথার মত কথা। চলি—

বাসব আর ওখানে দাঁড়াল না। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ফিরে চলল।

আধঘণ্টা আগে ডিনার শেষ হয়েছে। শুভরাত্রি জানিয়ে সস্ত্রীক সিন্ধে উপরে চলে গেছেন। বাসব নিজের ঘরে হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিল। দরজার কাছে অল্প একটু শব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে দেখল, রাজনাথ ঘরে প্রবেশ করছে। হাসি মুখে সে বাসবের সামনে এসে বসল।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—ভাল করেছেন। ট্যাক্সির মেয়েটি কে?

—রেহানা। মানে…

—বুঝতে পেরেছি। মেয়েটি মুসলমান?

—না। পাঞ্জাবী হিন্দু। নামটা ওর ওইরকম।

—বাড়িতে সকলে জানেন কথাটা?

মুশকিল হয়েছে ওখানেই। মামা জানতে পারলে ভীষণ রাগারাগি করবেন। উনি আবার জাতের বাইরে পা বাড়াতে রাজি নন। অথচ আমি রেহানাকে বিয়ে করতে চাই।

মৃদু হেসে বলল, জটিল পরিস্থিতি।

—অবশ্য আমি আর ঝুলে থাকতে রাজি নই। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলছি।

—হঠকারিতা দেখিয়ে নিজের ভবিষ্যত অন্ধকার করবেন না। অপেক্ষা

অনেক সময় সুফল দেয়। আচ্ছা, আপনার সদাশিব মামা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? তাঁকে কোনদিন দেখেছেন?

—আমি তো দূরের কথা, মামা তাঁকে দেখেছেন কি?

—তিনি তো বলছেন দেখেছেন। বম্বের এক হোটেলের সামনে কথাও হয়েছে।

বিচিত্র হাসি দেখা দিল রাজনাথের মুখে।—আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়েও একটা বিষয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাননি দেখে অবাক হচ্ছি। সদাশিব মামা যখন বাড়ি থেকে চলে যান তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। এত বছর পরে তাঁকে চিনতে পারা কি সহজ কথা? এমনও তো হতে পারে, অন্য কেউ তাঁর ভূমিকা নিয়ে মামাকে ভয় দেখাচ্ছে।

বাসব দ্রুত চিন্তা করল। রাজনাথ হয়তো ঠিকই বলছে। এমন হলেও হতে পারে। ওর ভাবনা এই পথে পরিচালিত হয়নি কেন ভেবে ও মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ল।

—মিঃ সিংহকে আপনি একথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমার কথা আমল দেননি তিনি।

—আপনার ধারনাই যদি ঠিক হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কিসের স্বার্থে এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছেন?

—রহস্য ওখানেই। আপনার তদন্তের উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। সত্যিকথা বলতে কি আমি আপনার মতই একজন লোককে খুঁজছিলাম।

দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

—কে?

দরজা ঠেলে মাঝারি সাইজের একজন মোটা-সোটা লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখে ঘন দাড়ি, মাথা ভর্তি বড় বড় রুক্ষ চুল। তাকে দেখেই রাজনাথ উঠে দাঁড়াল।

—আমি আসছি।

লোকটি বেরিয়ে যাবার পর বাসব প্রশ্ন করল, ও কে?

—বিনায়ক আমার ব্যক্তিগত কর্মচারি। এখন চলি মিঃ ব্যানার্জী। কাল আবার দেখা হবে।

রাজনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত তখন অনেক।

শৈবালকে চিঠি লেখার ইচ্ছে ছিল বাসবের। কিন্তু আলস্য তাকে পেয়ে বসেছে। কাল লিখলেই হবে—এই সিদ্ধান্ত করে সে গা এলিয়ে দিল বিছানায়। চোখে ঘুম নেমে আসতে খুব বেশি সময় নেয়নি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বাসব নিজেই জানে না। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে

ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসল। শব্দটা যেন বাগানের দিক থেকে এল। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরও আর কিছু শোনা গেল না। ও শুয়ে পড়ার উপক্রম করছে, এমন সময় আবার সেই ঝনৎকার। বাসব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। গাছপালা আড়াল করে রয়েছে, তাছাড়া ঘন অন্ধকার। আওয়াজটা গেটের দিক থেকে এল মনে হচ্ছে। বাসব ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে পার্লারে এসে দাঁড়াল। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সমস্ত বাড়িকে ঘিরে যেন মৃত্যুহীন শীতলতা বিরাজ করছে।

পার্লার থেকে পোর্টিকোয় এল। এখানে আলো জ্বলছে! এধার-ওধার তাকাচ্ছে, আবার সেই ঝনৎকার শুনতে পেল। শব্দ কোথায় হচ্ছে এবার আর বুঝতে অসুবিধা হল না। গেটের মাথায় আলো থাকায় এখান থেকে জায়গাটা দেখা যাচ্ছিল। গেটের পাল্লা দুটো হাওয়ার দরুন ঠোকাঠুকি লাগায় বোধহয় শব্দ হচ্ছে।

এরকম তো হবার কথা নয়! গেটের পাল্লায় তালা দেওয়া থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এমন একজন অর্থশালী ব্যক্তির বাড়িতে রাত্রে কম্পাউণ্ডের মধ্যে পাহারার ব্যবস্থা থাকবে না তাতো হতে পারে না। বাসব ঘরে ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়াবার মুখেই থমকে গেল। কালো মত ওটা কি? কেউ পড়ে রয়েছে মনে হচ্ছে যেন!

বাসব বাগানে নেমে এল। দ্রুত এগিয়ে চলল লক্ষ্যস্থলের দিকে। কাছে পৌঁছতেই স্তব্ধ হয়ে গেল ও। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন বালাজী সিন্ধে। তাঁর কোটের পিছন দিকের অংশ রক্তে ভিজে উঠেছে। অন্তত তিনটে গুলি যে পিঠ ভেদ করেছে তা বুঝতে পারা যায়। দেহে যে প্রাণ নেই সে সম্পর্কেও বাসব নিশ্চিত হল।

কি অবিশ্বাস্য ঘটনা! এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা তখন অর্থহীন। বাসব নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হল। প্রায় দৌড়ে ফিরে এল পার্লারে। এখন বাড়ির সকলকে জাগিয়ে তোলা দরকার। এ বাড়ির কিছুই জানে না ও। কে যে কোথায় শুয়ে আছে ভগবান জানেন। ঠিক এই সময় বাসবের দৃষ্টি পড়ল সিঁড়ির দিকে। অতি সন্তর্পণে রাজনাথ উপরে উঠে চলেছে। সে ওকে দেখতে পায়নি।

—শুনছেন?

ঝটিতি রাজনাথ ফিরে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত নেমে এল।

—এ কি! আপনি?

—কোথা থেকে ফিরছেন?

—না···মানে

—সাজপোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে না যে আপনি বিছানা থেকে উঠে এসেছেন।

—বিশেষ কাজে বেরুতে হয়েছিল। কিন্তু আপনি এত রাত্রে?

বাসব হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনি তাহলে কিছুই দেখেননি? বাড়ির সকলকে আগে তুলুন। তারপর থানায় ফোন করুন। আপনার মামা খুন হয়ে গেটের সামনে পড়ে আছেন।

বাসব আবার দুর্ঘটনাস্থলের দিকে এগুলো। মাথার মধ্যে চিন্তা ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। সংবাদটি পরিপাক করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল রাজনাথের। তারপর সে ছুটল বাসবের পিছু পিছু।

খবর পেয়ে কটন গ্রীনের থানা-ইনচার্জ সদলবলে এসে পড়লেন। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির এরকম মর্মন্তুদ মৃত্যু এই অঞ্চলে এই প্রথম। তিনি বেশ ঘাবড়ে গেছেন। বিভিন্ন দিক থেকে মৃতদেহের ছবি নেওয়া হল। কড়া লাইটের ব্যবস্থা করে দুর্ঘটনাস্থলের চারধারে অনুসন্ধান চালানো হল, কিন্তু কোন সূত্রই পাওয়া গেল না।

পার্লারে মুহ্যমানের মত বসে আছে রাজনাথ। সোফার একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কৌশল। খবর পেয়ে বিলমরিয়া আর চৌহান এসে পড়েছেন। ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মধ্যে আরো কয়েকজন এসেছেন। সকলেই অসম্ভব মুহ্যমান। ললিতা ওখানে নেই। স্বামীর মৃতদেহ দেখে মূর্চ্ছার মত হয়েছিল। ধরাধরি করে ওঁকে ওঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই সময় হেডকোয়ার্টার থেকে হোমিসাইড স্কোয়াডের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। এত বড় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে রাখা ঠিক নয়—বিবেচনা করে স্থানীয় থানা থেকে খবর পাঠানো হয়েছিল হেডকোয়ার্টারে। ওঁদের মধ্যে থেকে ইন্সপেক্টার পটবর্ধন সকলের জবানবন্দী নিলেন। উল্লেখযোগ্য কোন কথা কারুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেল না।

শুধু ললিতা জানিয়েছেন, সাড়ে-দশটার সময় সিকে কার কাছ থেকে যেন ফোন পেয়েছিলেন। তারপরই পোশাক বদলে তিনি নিচে নামার আগে স্ত্রীকে বলেছিলেন, তাকে একবার বেরুতে হতে পারে। বেরুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন।

ইতিমধ্যে বাসবের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। ও কেন বম্বে এসেছে সে কথাও জেনেছেন হেডকোয়ার্টারের কর্তাব্যক্তিরা। দেখা গেল বাসবের খ্যাতির কথা তাঁদের অজানা নয়।

পটবর্ধন বললেন, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন মিঃ ব্যানার্জী?

আর সকলের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল।

—কে খুন করেছে বা খুনের মোটিভ কি এই মুহূর্তে অবশ্য বুঝে ওঠা কষ্টকর। অবশ্য অনুসন্ধান আরম্ভ করার একটা সূত্র আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

—কি বলুন তো?

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, কম্পাউণ্ডের মধ্যে পাহারার ব্যবস্থা নেই কেন? স্বাভাবিক কারণেই এই ব্যবস্থা আশা করা যায়। দ্বিতীয়ত, গভীর রাত্রে গেটে তালা দেওয়া ছিল না কেন?

—সিন্ধে বেরিয়েছিলেন, তখনই হয়তো গেট খোলা হয়েছিল।

—স্বাভাবিক। কিন্তু যাবার সময় কে তাঁকে গেট খুলে দিয়েছিল? যদি ধরে নেওয়া যায় তিনি নিজেই বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছেন তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সেই তালা ও চাবি কোথায় গেল।

ইন্সপেক্টার প্রভাকর বললেন, বাড়ির লোকদের এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হয়তো আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কৌশলকে প্রথমে প্রশ্ন করা হল। সে বলল, উজাগার সিং নামে একজন উত্তরপ্রদেশের লোক গত আট বছর ধরে নাইট গার্ডের কাজ করছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী। আজ রাত্রে ডিউটি ছেড়ে উজাগার কোথায় গেল, এবিষয়ে কিছুই জানে না সে।

রাজনাথ বলল, বাসবের ঘর থেকে বেরুবার পরই উজাগারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তখন তাকে বিশেষ বিচলিত দেখাচ্ছিল। সে কাতরভাবে বললে, অনুমতি পেলে সে এখুনি একবার ভাস্তপে দেশওয়ালীদের আড্ডায় যেতে পারে, কারণ গ্রাম থেকে একজন লোক বাড়ির খুব খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। রাজনাথ তাকে ছুটি দিয়ে দেয়। সে গেট বন্ধ করার ব্যবস্থা করে এবং বাড়ির প্রধান চাকর নাথোর কাছে জিম্মা করে দেয়।

নাথোকে তখুনি ডাকা হল।

ভীত সন্ত্রস্ত নাথো যা জানাল তার সারমর্ম হল, ছোটসাহেব তাকে গেটের চাবি দিয়েছিলেন। সে চাবি এখন তার কাছে আছে। বড়সাহেব বা আর কেউ গেট খোলার জন্য তার কাছ থেকে চাবি চাননি। ওই তালার ডুপ্লিকেট চাবি ছিল কিনা সে বলতে পারে না।

আরো অনুসন্ধান করে জানা গেল, ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। কিছুদিন আগে মিঃ সিন্ধের কাছ থেকেই হারিয়ে যায়। তারপর আর করানো হয়নি। ইতিমধ্যে রাজনাথ জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ যা করছে করুক। তবে তার পক্ষে বাসব তদন্ত চালাবে। পুলিশ-পক্ষ এতে খুশীই হলেন বলা চলে।

মৃতদেহ যখন পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হল তখন ভোর হয়ে আসছে।

এই সময় আবার উজাগার সিং-এর সন্ধান পাওয়া গেল। ভাস্তপে দেশওয়ালীদের আড্ডায় নয় সিঙ্কের বাড়ির শ'খানেক গজ দূরে এক পার্কে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথা কেটে গিয়েছিল—রক্ত চুলের উপর জমাট বেঁধে রয়েছে। তখনও তার আচ্ছন্নভাব কাটেনি। ডাক্তারের সাহায্যে কিছুক্ষণের মধ্যে উজাগারকে চাঙ্গা করে তোলা হল। এই অবস্থায় কিভাবে পড়ল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে যা বলল তা হল, ছোট সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ভাস্তপ থেকে যে লোক খবর নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। একমাত্র ছেলের কিছু একটা হয়েছে এই ধারনাই তখন মনে বসে গিয়েছিল। অপরিচিত সংবাদদাতার সঙ্গে আড্ডায় যেতে তাই সে দ্বিধা করেনি। পার্কের কাছে আরো তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল। কাছাকাছি যেতেই লোকগুলো আক্রমণ চালায়! তারপর মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের দরুন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আক্রমণকারীরা কেউই তার পরিচিত নয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে পুলিশদল বিদায় নিল। অবশ্য সঙ্গে নিয়ে গেল উজাগার সিংকে। যাবার আগে জানিয়ে দেওয়া হল, পুলিশের অনুমতি ছাড়া যেন কেউ বম্বের বাইরে পা না বাড়ায়। চৌহান, বিলমোরিয়া এবং আরো যে ক'জন এসেছিলেন তাঁরাও বাড়ি ফিরে গেলেন। পার্লারে তখন মুখোমুখি বসে রইল বাসব আর রাজনাথ। বিনায়ক দূরে দাঁড়িয়ে আছে অন্যমনস্কভাবে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, তদন্তভার তো আমার উপর দিলেন, কিন্তু মন খুলে সাহায্য করবেন কি?

—নিশ্চয়।

—অত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন প্রথমে তা আমার জানা দরকার।

—একটু ইতস্ততঃ করে রাজনাথ বলল, বিনায়ক আমাকে প্রচণ্ড এক খবর দিয়েছিল। মামাকে নাকি চৌহান ব্ল্যাকমেল করছে। বাগানে ঝোপের আড়ালে ওই ধরনের কথা সে গত রাত্রে শুনতে পেয়েছে এবং দেখেছে দুজনকে। মামার সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিছুদিন থেকে বিনায়ককে লাগিয়ে রেখেছিলাম তার পিছনে। ব্ল্যাকমেলিং-এর সংবাদ পেয়ে স্থির করলাম, এ সম্পর্কে চৌহানের সঙ্গে দেখা করব এবং আজ রাত্রেই। আপনার ঘর থেকে বেরুবার কিছুক্ষণ পরেই আমি চৌহানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তিনি কিছুই স্বীকার করলেন না। তখন বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হল।

—আপনি ফিরেছেন রাত আড়াইটের কাছাকাছি। মিঃ চৌহানের বাড়িতে কি এত সময় লেগেছিল?

—না। আপনাকে বলা হয়নি, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে আমি রেহানার ফোন পেয়েছিলাম। সে মরিয়া হয়ে আমার কথা প্রকাশ করে ফেলেছিল। ওর বাবা আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে চান এই কথাই ফোনে জানিয়ে-

ছিল। চৌহানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেহানাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কি কথা হল আপনাদের?

—উনি এক বিচিত্র প্রস্তাব দিলেন। বললেন, আমাদের বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে মামার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা চলবে না। রেহানাকে নিয়ে আলাদাভাবে সংসার পাততে হবে। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, মামার চরিত্র নাকি এত জঘন্য যে তাঁর মেয়ে ওবাড়িতে গিয়ে বাস করুক তা তিনি কখনই অনুমোদন করবেন না। আমি আর অপেক্ষা করিনি। রাগ করে চলে এসেছিলাম।

—মিস রেহানার বাবার সঙ্গে তাহলে মিঃ সিন্ধের চেনাজানা ছিল।

—তাই তো মনে হল।

—হুঁ। আপনাদের ক'টা গাড়ি?

—দুটো। একটা মামার, একটা আমার।

—আপনার বোধহয় ড্রাইভারের প্রয়োজন পড়ে না। আপনার মামার ড্রাইভার কি এখানে থাকে না ডিউটি সেরে বাড়ি চলে যায়?

—এখানেই থাকে। মামা কখন যে কোথায় বেরুবে তার তো কোন ঠিক থাকে না।

—আর কথা নয়। এবার আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমিও নিজের ঘরে যাই।

কথা শেষ করেই বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

বেলা ন'টার সময় ললিতা ড্রইংরুমে এলেন। সেখানে তখন রাজনাথ, বিলমোরিয়া ও চৌহান রয়েছেন। সিন্ধের দুই পার্টনারকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। ললিতার সুন্দর মুখ এখনও থমথমে। শোকের প্রাথমিক ধাক্কাটা বোধহয় এখনও সামলে উঠতে পারেননি।

চৌহান ক্রুত গলায় বললেন, এই সময় আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের ঠিক হচ্ছে না। তবে অনন্যোপায় হয়েই……

মৃদু গলায় ললিতা বললেন, বলুন—

—মিঃ সিন্ধের হঠাৎ মৃত্যুতে আপনি যেমন শোকে অভিভূত, আমরাও তেমনি দিশেহারা। ব্যবসায় তাঁরই ছিল অর্ধেক অংশ। সেই অংশের তিনি কি ব্যবস্থা করে গেছেন তা আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানা দরকার।

—এইভাবে হঠাৎ চলে যাবেন তিনি তো নিজেও জানতেন না। কোন ব্যবস্থাই হয়তো করে যেতে পারেননি।

—স্বাভাবিক। বিলমোরিয়া বললেন, তবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর পক্ষে বহু আগেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে রাখাও আবার অস্বাভাবিক নয়। আমরা ব্যস্ত হচ্ছি কেন জানেন? যদি তিনি আমাদের কোন অপরিচিত লোককে ব্যবসার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে থাকেন তবে

কিছুটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে না কি ?

ললিতা বললেন, আমায় কি করতে বলেন ?

—আপনি কিছু জানেন ?

—আমায় তিনি কিছুই বলেননি।

চৌহান বললেন, এক কাজ করা যেতে পারে। সত্যি যদি তিনি কোন ব্যবস্থা করে থাকেন তবে তাঁর এ্যাটর্নীর সঙ্গে যোগাযোগ করাই বোধহয় সব দিক দিয়ে ঠিক হবে।

এতক্ষণ রাজনাথ চুপ করে ছিল। এবার বলল, এখুনি ফোন করছি।

এই সময় বাসব ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

বিলমোরিয়া বললেন, আসুন মিঃ ব্যানার্জী। কিছু হদিশ করতে পারলেন ?

—চেষ্টা করছি। মিসেস সিন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। মনের অবস্থা আপনার ভাল নয় জেনেও অনুরোধ করছি। যদি—

—বলুন ?

—না, না আপনারা উঠবেন না। এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়। মৃতব্যক্তি সম্পর্কে গুটি কয়েক প্রশ্ন করব মাত্র।

চৌহান ও বিলমোরিয়া উঠে দাড়িয়েছিলেন। আবার বসে পড়লেন।

—আপনার স্বামীর গত রাত্রের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলুন ?

ললিতা শান্ত গলায় বললেন, বলবার মত বিশেষ কিছুই নেই। খাওয়া-দাওয়ার পর আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি উপরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর নিজের ঘরে চলে যান। দুটো ঘর পাশাপাশি, মাঝের দরজাটা খোলাই থাকে। এর কিছুক্ষণ পরে ফোনে কার সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসেন আমার ঘরে। তখন তিনি বাইরে যাবার পোশাকে সজ্জিত ছিলেন।

—উনি যখন ফোন করছিলেন তখন কোন টুকরো কথা আপনার কানে আসেনি ?

না। রিং-এর আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিলাম ফোন এসেছে।

—তারপর কি হল ?

—এসে বললেন, এক্ষুনি বিশেষ প্রয়োজনে তিনি বেরুবেন। আমি ভীত ভাবে বললাম, এত রাত্রে বেরোন ঠিক হবে না। সদাশিব আবার ঝামেলা করতে পারে। তিনি বললেন, প্রয়োজন অত্যন্ত—গুরুতর যেতেই হবে। ভয়ের কিছু নেই। সঙ্গে লোক থাকবে। তারপরই তিনি বেরিয়ে যান।

—গাড়ি না নিয়েই বেরুচ্ছেন, এতে আপনি অবাক হননি ?

—গাড়ি না নিয়েই যে বেরুচ্ছেন আমি বুঝতে পারিনি। তিনি গাড়ি ছাড়া এক পা হাঁটতেন না।

—গেটের একটা চাবি তাঁর কাছে থাকতো আপনি জানতেন কি ?

—হ্যাঁ। সেই চাবিটা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

—কবে ?

একটু ভেবে ললিতা বললেন, কলকাতা যাবার কয়েকদিন আগে।

—কোথায় রাখতেন চাবিটা ?

নিজের কি-কেসে।

এবার চৌহান বললেন, বিচিত্র ব্যাপার। পুরো কি-কেসটা হারিয়ে গেলেও একটা কথা ছিল। কেস থেকে একটা চাবি হারিয়ে যাওয়া একটু কেমন কেমন লাগছে না!

বিলমোরিয়া বললেন, তাছাড়া মিঃ সিন্ধে অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন।

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।

এই সময় দুজন চাকর চা ইত্যাদির ট্রে বয়ে নিয়ে এল। বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। চা পর্ব আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে রাজনাথ প্রবেশ করল ঘরে। জানা গেল,নবাগত 'সাঠে অ্যাণ্ড নাম্বিয়ার' এ্যাটর্নী ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার রূপচাঁদ সাঠে। সিন্ধের আইনগত দিকটা এই ফার্মই দেখাশুনা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে রূপচাঁদ বললেন, আমাদের মক্কেলের এইরকম শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে আসতে হবে ভাবিনি। তিনি এইভাবে এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন ভাবতে পারিনি। মাত্র মাস ছ'য়েক আগে তিনি উইল করেছিলেন। আমাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল, তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই যেন সম্পত্তির কি বিলি ব্যবস্থা করেছেন তা সকলকে যেন নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।

রাজনাথ প্রশ্ন করল, আপনি কি উইল সঙ্গে করে এনেছেন ?

না আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী সোমবার দিন উইল নিয়ে আসবো এইরকম স্থির করা আছে। তবে তিনি কি ব্যবস্থা করে গেছেন তার মোটামুটি একটা আঁচ অবশ্য এখন আমি দিতে পারি।

বিলমোরিয়া বললেন, তবে তো ভালই হয়!

পান নয়, সুদৃশ্য শিশি থেকে এক চিমটি মিষ্টি জাতীয় জর্দা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে রূপচাঁদ বললেন, স্বর্গীয় মক্কেল নিজের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু নিজের ভাগনেকে দিয়ে গেছেন। তবে গুরুতর একটা শর্ত আছে। স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকবেন সমস্ত কিছু তাঁর দখলে থাকবে। অবশ্য কোন কিছু দান বা বিক্রি করার অধিকারী তিনি হবেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভাগনে হবেন ষোলআনা মালিক। তার আগে ফ্যাক্টরি থেকে যে অ্যালাউন্স তিনি

পাচ্ছিলেন তা তো পাবেনই, তাছাড়া পাবেন প্রতি মাসে চার হাজার টাকা।

এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। ভাবাবেগ কাটাবার জন্ত ললিতা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকেছেন। স্বাভাবিক কারণেই রাজনাথ কিছুটা উৎফুল্ল। বাসব বেরিয়ে এল ড্রইংরুম থেকে। বারান্দার একধারে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়েছিল বিনায়ক। কি ভেবে বাসব ওর দিকেই এগিয়ে গেল।

—একটা কাজ করতে পারবে ?

বিনায়ক বলল, বলুন ?

—রাজনাথবাবুর বান্ধবী মিস রেহানার বাড়ি আমায় নিয়ে যেতে পারো ? ঠিকানাটা আমার জানা নেই।

কথাবার্তা হিন্দীতেই হচ্ছিল।

একটু চুপ করে থেকে বিনায়ক বলল, ছোটসাহেব রাগ করবেন না তো ?

—তোমার কোন ভয় নেই। আমায় নিয়ে চলো।

—আসুন।

বাড়ির বাইরে এসে একটু অপেক্ষা করতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগল না। ছিমছাম বাড়িখানা ফুটপাতের ধার ঘেঁসেই। গৃহস্বামী দরিদ্র নন তা এক নজরেই বুঝতে পারা যায়। কলিং বেল টিপবার দরকার পড়ল না, রেহানা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের হকারের সঙ্গে কথা বলছিল। আগন্তুককে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

বাসব বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এবার যাও।

রেহানা ঝলমলিয়ে বলে উঠল আসুন—আসুন—কি সৌভাগ্য। আপনি যে আসবেন ভাবতেই পারিনি।

—কাজে এসেছি বলতে পারেন। সমস্ত কথা বোধহয় শুনেছেন ?

—হ্যাঁ। কি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। ভোরে রাজ এসে সব কথা বলে গেছে। একটি সুসজ্জিত ঘরে রেহানা অতিথিকে এনে বসাল।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার বাবা বাড়ি আছেন ?

—আছেন। এখুনি ডেকে দেব ?

—ভাল হয়। তিনি মিঃ রাজকে বালাজী সিংহের চরিত্র সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—কিন্তু যিনি মারা গেছেন, তাঁর চরিত্র ভাল ছিল কি খারাপ ছিল তা আর জেনে এখন কি লাভ ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, অপরাধ বিজ্ঞান কিন্তু অন্ত কথা বলে। ভিকটিমের অতীত জীবনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে অনেক সময় হত্যাকারীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া সহজ হয়।

—আমি বাবাকে ডেকে আনছি।

রেহানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দিন বাসব নানা চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিল। রেহানাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর সে অবশ্য চৌহান আর বিলমোরিয়ার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেছিল। কিন্তু কাজের কথা কিছু সংগ্রহ করতে পারেনি। চৌহান অন্ধকার বাগানে সিন্ধের সঙ্গে আলোচনার কথা অস্বীকার করেন।

বিকেল পাঁচটার সময় বাসব নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে এল। কারুর সাড়া শব্দ নেই। সে যার নিজের ঘরে বোধহয়। চাকর-বাকরদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের আলোতেও বাড়িটা যেন ঝিম মেরে রয়েছে। বাসব পাইপ ধরিয়ে লনে পায়চারি করতে করতে এক সময় লক্ষ্য করল, ইন্সপেক্টর পটবর্ধন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি সঙ্গে গম্ভীর মুখে গেট অতিক্রম করছেন।

—হ্যালো মিঃ ব্যানার্জী, বাড়ির সকলে আছেন তো ?

—আছেন বলেই তো মনে হয়। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি ?

—অফিসিয়ালি পাইনি। তবে রিপোর্টে কি থাকবে জানতে পেরেছি। এগারটা থেকে একটার মধ্যে উনি মারা গেছেন। বুলেট পিঠের দিক থেকে তেরছাভাবে গিয়ে লাংসে আটকেছে। অনুমান করা হচ্ছে মাত্র হাত কয়েক পিছনে ছিল।

—হুঁ। আপনি এই সময় সদলবলে, ব্যাপার কি ?

—এ বাড়ির ঘরগুলোর খানা-তল্লাস করবার ইচ্ছে আছে। দেখি, যদি এগুবার মত কোন অবলম্বন পাওয়া যায়।

পটবর্ধন নিজের সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বাসব লনেই রয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ঝিম মারা বাড়ি জেগে উঠল যেন। পুলিশ নিজের কাজ আরম্ভ করেছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। বাসব এবার লন পেরিয়ে বাড়ির ডান ধারে মোড় নিতেই লক্ষ্য করল, রাজনাথ আর বিনায়ক দ্রুত পায়ে ছোট গেটের দিকে যাচ্ছে। দুজনেরই কেমন সচকিত ভাব।

—দাঁড়ান—

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

রাজনাথ ইতস্ততঃ করে বলল, না···ইয়ে···একটু এধারে—

—হাতে ওটা কিসের প্যাকেট ? দেখি—

—দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না। মারাঠী ভাষায় লেখা পরে আপনাকে সমস্ত বলব। রাজনাথ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

—আমি বুঝতে না পারলেও পুলিশ বুঝতে পারবে। প্যাকেটের মধ্যেকার কাগজপত্র চোখের আড়াল করবার জন্যই আপনারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পরে নয়, এখনই আমায় বলুন। ভুলে যাবেন না আপনিই আমায় তদন্তে নিযুক্ত করেছেন।

একজন সাব-ইন্সপেক্টারকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ঝটিতে রাজনাথ প্যাকেটটা বাসবের হাতে চালান করে দিল। ড্রেসিংগাউনের পকেটের ফাঁক বড়, তার মধ্যে প্যাকেটা চালিয়ে দিতে বাসব এক সেকেণ্ড সময় নিল না।

—আপনারা এখানে ?

—এধার দিয়েই আমরা বাড়ির মধ্যে যাচ্ছিলাম খানা-তল্লাশ হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ। পটবর্ধন আপনাকে খুঁজছেন।

বাসব ইন্সপেক্টারের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। পটবর্ধন পার্লারেই বসেছিলেন। তাঁকে কিছুটা বিমর্ষই দেখাচ্ছিল। অর্থাৎ তল্লাসী চালিয়ে কাজে লাগে এমন কিছু পাননি।

—আপনি নিশ্চয় কিছুটা এগিয়েছেন। আমাদের তো পণ্ডশ্রমই সার হল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তো কিছু পাওয়া গেল না।

পটবর্ধনের কথা শুনে বাসব বলল, কেন্দ্রবিন্দু ছুঁতে চলেছি একথা বলব না, তবে কাজ অনেক এগিয়েছে। আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি, সিঙ্কে বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ঠিকই তবে গেট পেরুতে পারেননি। তার আগেই খুন হয়েছিলেন।

—আপনার এই ধারনার কারণ ?

—সিঙ্কে মোটর ছাড়া এক পা কোথাও যেতেন না। ড্রাইভার বাড়িতেই থাকে। তবু তিনি তাকে গাড়ি বার করতে বলেননি। তাঁকে যে ফোন করেছিল সে বোধহয় কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে আসতে বলে। গেটের সামনে গাড়ি নিয়ে তার অপেক্ষা করার কথা ছিল। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে সিঙ্কে প্রাণের আশঙ্কা করেছিলেন, তবুও যখন তিনি বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন বুঝতে হবে, ফোনে এমন কিছু বলা হয়েছিল যা শুনে তিনি চুপ করে থাকতে পারেননি এবং যে ফোন করেছিল সে তার বিশ্বাসভাজন। গেটের চাবি হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গেটে দারোয়ান আছে। কাজেই গেটের বাইরে পা দিতে অসুবিধা হবে না এই ধারনা নিয়েই তিনি বাগানে পা দিলেন। কিন্তু কায়দা করে আগে থেকেই দারোয়ানকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল! এতেই সুচিত হচ্ছে, সিঙ্কের বিরুদ্ধে কি গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

বাসব একটু দম নিয়ে আবার বলল, এবার মৃতদেহের পজিশনের কথা চিন্তা করুন। গেটের দিকে মুখ করে তিনি পড়েছিলেন। অর্থাৎ গেট পেরুবার আগেই পিছন দিক থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। এখন আমাদের দুটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। এক, সিঙ্কের কাছ থেকে কি গেটের চাবি সত্যি হারিয়েছিল, না তাঁর কি-কেস থেকে কেউ চুরি করেছিল ? দুই, সেই চাবি দিয়ে কি বাড়ির কোন লোক গেট খুলে রেখে হত্যাকারীকে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছিল ?

—সদাশিব কি এর মধ্যে আছে বলে মনে করেন ?

—নিশ্চিতভাবে এখন কিছু বলতে পারি না। হত্যাকারীকে ধরার জন্য একটা পরিকল্পনা আমি খাড়া করতে চলেছি। আপনার সহযোগিতা চাই।

—পাবেন।

—আজই কয়েক ঘণ্টা পরে বিস্তারিতভাবে আপনাকে সমস্ত কিছু বলব। এখন আমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাববার সময় দিন।

এরপর পটবর্ধন সদলে বিদায় নিলেন। বাসব নিজের ঘরে চলে গেল। রাজনাথের কাছ থেকে নেওয়া প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করে খুলে দেখল। এক তাড়া কাগজ। মারাঠী ভাষায় লেখা হলেও বুঝতে পারা যায় সমস্তই চিঠি। খান তিনেক মোহর-মারা খামও রয়েছে। ইংরাজীতে কাটনির কোন জায়গার ঠিকানা লেখা। খামের উপরকার নাম পড়ে বাসব অবাক হয়ে গেল। ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করল রাজনাথ।

—আপনি একা! সদাশিববাবু কোথায়?

না…ম'নে…

—যাকে আপনি বিনায়ক সাজিয়ে রেখেছেন, তাঁর কথাই বলছি।

—খামের উপরকার নামটা পড়েই আন্দাজ করেছি।এবার ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

একটু চুপ করে থেকে রাজনাথ বলল, চিঠিগুলো অনেক পুরনো। যে সময় মামার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সেই সময় তিনি সদাশিব মামার মাকে লিখেছিলেন। ঘটনাটা আপনাকে খুলেই বলি, আমেদাবাদের কাপড়ের কল থেকে চাকরি যাবার পর বেকার সদাশিব মামা বম্বে এলেন! কিন্তু দাদার কাছে যেতে সাহস পেলেন না। দেখা করলেন আমার সঙ্গে। এই চিঠিগুলি দেখিয়ে প্রমাণ করলেন, তিনিই প্রকৃত সদাশিব সিন্ধে। আমি তাঁকে কাজ দিলাম এবং স্থির করলাম, সময় বুঝে তাঁর পরিচয় মামার কাছে প্রকাশ করে দেব। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করল। আমি আর সদাশিব মামা হতবাক। অবশ্য পরে বুঝতে অসুবিধা হল না, কেউ একজন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সদাশিবের ভূমিকা নিয়ে মামাকে ভয় দেখাচ্ছে। লোকটা কে, আমরা তলায় তলায় খোঁজ নিতে লাগলাম। কলকাতায় মামা একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন জানার পর স্থির হল, যা হবার হবে, সদাশিব মামা তাঁর কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না—তিনি খুন হলেন।

—এই চিঠিগুলি থেকে সদাশিব সিন্ধের আসল পরিচয় প্রকাশ পেলে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে, এই ভেবেই বোধহয় এগুলি বাড়ির বাইরে চালান দেবার চেষ্টা করছিলেন?

—হ্যাঁ।

বাসব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বলল, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। মনে হয় এতেই কাজ হবে। আপনার সদাশিব মামাকে ডেকে আনুন।

ন'টা বাজার কয়েক মিনিট পরে রাজনাথ বাসবকে সঙ্গে নিয়ে ডায়নিং রুমে এল। এক গেলাস দুধ হাতে নিয়ে ললিতা বসেছিলেন ওখানে। সিন্ধে

যারা যাবার পর থেকে তিনি ভালভাবে খাওয়া-দাওয়াই করছেন না।

খাবার পরিবেশিত হল।

ললিতা নরম গলায় বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আপনার কাজ কিছু এগিয়েছে ?

বাসব খেতে খেতে বলল, ভালভাবেই এগুচ্ছে। মনে হয় সফল হব। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—

—বলুন ?

—কৌশলকে আপনার কেমন মনে হয় ?

—আমার স্বামী তো ওর প্রশংসা করতেন। তবে পর-চিত্ত তো সকলের কাছেই অন্ধকার।

—তা বটে। আপনার স্বামীর কি-কেসের নাগাল পাবার সম্ভাবনা কি কৌশলের ছিল ?

—উনি চাবির তোড়াটা ব্রিফকেসের মধ্যে রাখতেন। ব্রিফকেসটা কৌশলই বয়ে বেড়াতো। তার পক্ষে—

—বুঝতে পেরেছি। তার পক্ষে ব্রিফকেসের মধ্যে কিছু বের করে নেওয়াটা জলের মত সোজা ছিল।

ললিতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না। বেয়ারা এসে জানালো ছোটসাহেবের ফোন এসেছে। রাজনাথ বার কয়েক প্লেটের দিকে তাকিয়ে, ললিতার দিকে তাকাল।

ললিতা বললেন, আমি ফোনটা ধরছি। তুমি হাত ধুয়ে এসো।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পুরোপুরি সাহেবি কায়দায় হলেও রাজনাথ কাঁটা চামচের বদলে হাত দিয়েই খেয়ে থাকে। ললিতা বেরিয়ে যাবার পর ও বেসিনে হাত ধুতে গেল। বেয়ারা আবার এসে জানালো ফোনটা মেমসাহেবেরই। রাজনাথ আবার খেতে বসল।

—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে মিঃ ব্যানার্জী ?

সমস্ত। আমি ইন্সপেক্টার পটবর্ধনের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তিনি সময় মত উপস্থিত থাকবেন মনে হয়।

দুজনে খাওয়ার দিকে মন দিল।

রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত লিমাস্টারের দিকে বাসব তাকিয়ে নিল, একটা কুড়ি। থমথম করছে রাত্রি। কটন গ্রীন শুধু নয়, সমস্ত বম্বেই বোধহয় এখন ঘুমিয়ে আছে। দারোয়ানকে এখনও পুলিশ ছেড়ে দেয়নি। কাজেই আজও গেটে পাহারা নেই। তবে নতুন একটা তালা দিয়ে গেট বন্ধ করা আছে। গেটের হাত দশেক বাঁ ধারে যে মরনিং গ্লোরির কুঞ্জ আছে, তারই মধ্যে ঘণ্টা দুয়েকের উপর বাসব অপেক্ষা করছে।

ভরসার কথা মশা নেই। নইলে এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠত। আরো আধঘণ্টাটাক কেটে গেল। আজ আবার গেটের মাথার উপরকার আলোটা জ্বালা নেই। পাইপ ধরাতে না পারার অসুবিধাটুকু অবশ্য রয়েছে।

এই সময় কাছাকাছি মোটর থামার শব্দ হল। একটানা পোকার ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। কয়েক মিনিট পরে বাসব লক্ষ্য করল, গেটের ওপারে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপরই বাড়ির দিক থেকে একজনকে গেটের কাছে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। আবছা অন্ধকারে বুঝতে পারা যাচ্ছে না মানুষটি কে ?

গেটের তালা খোলার শব্দ হল।

এরপরই এক নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হল। গেটের একটা পাল্লা ফাঁক করে ভিতরের মানুষটি বাইরে গেল। দুজনের মধ্যে কয়েকটি কথা বিনিময় হল। এবং তারপর এক ঝলক আগুন ছুটে গেল। অস্ফুট শব্দ করে বাইরের লোকটি উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে। এবার তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। দুজনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটির দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। এবার দুজনে দেহটি ধরাধরি করে গাড়ির দিকে যাবার উপক্রম করার মুখেই তারা পায়ের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল।

বাসব গেটের কাছ বরাবর এসে পড়েছে।

—মিঃ বিলমোরিয়া, আমি আপনাদের সাহায্য করব কি ? না, না বাচালতা প্রকাশ করবেন না, আমি তৈরি হয়েই আছি। জনাপঞ্চাশ পুলিশ কর্মচারি কাছাকাছিই আছেন।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ইন্সপেক্টার পটবর্ধন এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি ফুটপাথের অপর পারের একটি বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। বাসব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন না এই রকমই কথা ছিল।

—শিল্পপতি বিলমোরিয়া সাহেবকে নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পাচ্ছেন ইন্সপেক্টার ? আপনার আসামী। তবে মূল আসামী ওধারে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনি সাহায্যকারী মাত্র।

বিলমোরিয়া ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাসব এবার দ্বিতীয়জনের দিকে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয়জন আরো জড়সড় হয়ে উঠল। পটবর্ধনের টর্চ ঝলসে উঠেছে ততক্ষণ।

—অবৈধ প্রেমের জন্য অনেক অঘটন ঘটেছে। বালাজী সিন্ধের হত্যাকাণ্ড হল তারই আধুনিকতম নিদর্শন। ইন্সপেক্টার, আপনি ললিতাদেবীকে হাতকাপ পরাতে পারেন। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারটা বোধহয় ওঁর কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

রাজনাথ কখন এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ লক্ষ্য করেনি।

সে এবার দ্রুত গলায় বলল, সদাশিব মামা কি মারা গেছেন ?

বাসব তার কাঁধে হাত রেখে বলল, না ওঁর জামার তলায় স্টিলের প্রটেক্সান দেওয়া ছিল। ভেদ করা সম্ভব নয়। তবে প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার দরুন তিনি

অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ওঁকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।

ইন্সপেক্টার করণীয় কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তৎপর হলেন।

আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে বাসব কলকাতা ফিরে যাবে। রাজনাথ এক-রকম জোর করে ওকে আজকের দিনটা আটকেছে। সদাশিব সিন্ধে এখনও হাসপাতালেই আছেন। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। বেলা তখন দশটা হবে। তিনজনে পার্লারে বসে আছে। বাসব একধারে, ওর মুখোমুখি রেহানা আর রাজনাথ।

—আসল কথা হল, হত্যার মোটিভ কি আমি মোটেই বুঝতে পাচ্ছিলাম না। মোটিভ বুঝতে না পারলে হত্যাকারীকে চিনে উঠতে বিশেষ অসুবিধা হয়। মিস্ রেহানার বাবা বিয়েতে যে শর্ত আরোপ করেছিলেন, বলতে গেলে তাতেই আমার অসুবিধা দূর হল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম, সিন্ধের চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার নিগূঢ় অর্থ কি? তিনি সহযোগিতার মনোভাব দেখালেন, বললেন আমায় সব কথা। যা বললেন তার সারমর্ম হল, সিন্ধেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জানতেন। এককালে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলা চলে। হাতে প্রচুর পয়সা আসার পর সিন্ধে নানা ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই সময় কিভাবে যেন ললিতা তাকে গ্রাস করে ফেলল। ললিতা বাঈজীর মেয়ে। দিল্লীতে নাচতো টাচতো। বম্বে এসেছিল ফিল্মের নায়িকা হতে। নায়িকা অবশ্য হতে পারেনি। ছোটখাট পার্ট পেত। সিন্ধে তাকে তুলে আনলেন নিজের বাড়িতে। পরিচিতদের কাছে তার পরিচয় দিলেন স্ত্রী হিসেবে। এ সমস্ত রাজনাথবাবুর এ বাড়িতে আসার বছর দুয়েক আগেকার ঘটনা।

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করল, ললিতা সম্পর্কে আমার মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তবে সেই কি রক্তে হাত রাঙিয়েছে? আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, সিন্ধে বাগানের গেট অতিক্রম করতে পারেন নি। বডির পজিসন সেই কথাই বলে দিচ্ছে। তার কি-কেস থেকে কৌশলের চেয়ে ললিতার পক্ষেই চাবি সরিয়ে নেওয়া বেশি সহজসাধ্য। সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। এবং এ সম্পর্কেও নিশ্চিত হলাম যে, একজন সহযোগী ললিতার আছে। সেই সিন্ধেকে ফোন করে বাইরে ডেকেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে সিন্ধেকে ফোনে এমন কি বলেছিল যাতে তিনি এত রাত্রে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন? আমার মনে হয় ললিতা সম্পর্কেই কোন কথা শোনবার জন্যই তাকে ডাকা হয়েছিল। ইদানীং প্রেয়সীর স্বভাবের কিছু বৈলক্ষণ বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি না গিয়ে থাকতে পারেননি।

ইতিমধ্যে সদাশিব সিন্ধের পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় আমার কাছে জলের মত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। ললিতা ও তার বন্ধু প্ল্যানটা ছকেছিল চমৎকার। কাল্পনিক সদাশিবকে নিয়ে নাটক বেশ জমিয়ে তোলা হয়েছিল। সিন্ধে খুন হলে সকলেই ভাববে একাজ সদাশিবের। কলকাতায় যখন ভাড়া করা

গুণ্ডা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এবং উনি যখন আমাকে নিয়ে এখানে এলেন তখন আর অপেক্ষা করা অর্থহীন বলে মনে হল ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে। এইভাবে প্ল্যান করার অর্থ ছিল বোধহয় ললিতার বন্ধু সিন্ধেকে খুন করবে, তারপর মৃতদেহ গাড়ি করে বয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র ফেলে দেবে। কোন অজানা কারণে নির্দিষ্ট সময় বন্ধুটি উপস্থিত না হওয়ায় ললিতাই হত্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল নইলে মৃতদেহ ওখানে কখনই পড়ে থাকত না।

রেহানা প্রশ্ন করল ললিতা আগে থেকেই রিভলবার সংগ্রহ করে রেখেছিল, বলুন?

—নিশ্চয়। পরিস্থিতি কখন কি রকম দাঁড়াবে বলা যায় না। টাকা খরচ করলে বাঁকা পথ দিয়ে রিভলবার সংগ্রহ করা কিছুই নয়। যা বলছিলাম, সমস্ত বুঝতে পারলেও হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। তাই টোপ ফেলার ব্যবস্থা করলাম। তখন অবশ্য জানি না ললিতা, সিন্ধেকে মন থেকে ঝেড়ে লীলাখেলা আরম্ভ করেছিল কার সঙ্গে—চৌহান না বিলমোরিয়া? সদাশিববাবুকে আচ্ছা করে তালিম দিলাম। তিনি যথাসময়ে ফোন করে ললিতাকে জানালেন, তিনিই হলেন আসল সদাশিব সিন্ধে। তার নামে দিনের পর দিন যে ধাপ্পা চালানো হয়েছে তা তিনি জানতে পেরেছেন এবং তাঁর দাদার হত্যাকারী কে তাও তাঁর অজানা নয়। ললিতা দাদার বিবাহিতা স্ত্রী না হওয়ায় সম্পত্তির মালিক যে হতে পারেন না একথা তাঁকে প্রকাশ করে দিতে হবে।

ললিতা প্রমাদ গুণলো। যে অর্থের জন্য এতকাণ্ড তাই শেষ পর্যন্ত বুঝি ফেঁসে যায় এই ভেবে সে সদাশিবের সঙ্গে একান্তে রাত্রে দেখা করতে চাইল এবং নিজেদের মধ্যে ভালমত একটা রফা করে নেওয়া যাবে এই রকম আশ্বাস দিল। এরপরই সদাশিব বেঁচে থাকার অধিকার হারালেন। ফোনেই বোধহয় ললিতা বন্ধুকে ব্যাপারটার আঁচ দিয়ে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকতে বলেছিল। আমিও সদাশিববাবুকে পাঠালাম যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করে। তবে মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলে তাঁকে আর বাঁচানো যেত না। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে তো উপায় ছিল না। তারপর কি ঘটেছে আপনারা তো জানেনই। চৌহানের চেয়ে বিলমোরিয়া লম্বা, আবছা অন্ধকারের মধ্যে ওই উচ্চতাই তাঁকে আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল। বিচিত্র মানুষের মন। সিন্ধের সঙ্গে ললিতার সুখে স্বাচ্ছন্দে বাকি জীবনটা কেটে যেতে পারতো। তা হল না। সে একজনের বিপুল অর্থ নিয়ে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সুখে দিন কাটাবার স্বপ্ন দেখল।

রাজনাথ বলল, প্রশংসা করে আপনাকে ছোট করতে চাই না মিঃ ব্যানার্জী, তবুও বলবো আপনার তুলনা নেই।

—আগে প্রশংসা করলে ভাল লাগতো। এখন ভাল লাগে মোটা অঙ্কের চেক পেতে। অবশ্য আপনাদের মত মহাশয়রা প্রায়ই আমাকে দিয়ে থাকেন।

রেহানা আর রাজনাথ মৃদু হাসলো।

এতক্ষণ পরে পাইপ ধরালো বাসব।